ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাম্প্রতিক প্রবণতা

এ. আর. দেশাই

কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

আমার পিতার স্মৃতির
উদ্দেশে

ভূমিকা

'Recent Trends in Indian Nationalism' যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে ভারতের জাতীয়তাবাদের সম্পর্কে আলোচনাকে বজায় রাখতে চেয়েছে ও এ গ্রন্থটি আমার পূর্বেকার 'Social Background of Indian Nationalism'-এরই সংক্ষিপ্ত বিস্তার।

যখন আমি 'Social Background of Indian Nationalism'-এর তৃতীয় সংস্করণে ব্যস্ত ছিলাম তখন প্রকাশকরা যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের উপর সংযোজনী রচনা করতে বলেন। আমি একটা ছোট সংযোজনী রচনায় যথেষ্ট পরিশ্রম করি। তবে উল্লিখিত সময়ে যে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বিরাটভাবে রূপান্তরিত করে সেগুলোকে চিত্রিত করার তাগিদে আমার সংযোজনী একটা ছোট পুস্তকের আকার নিয়ে বসে। 'Social Background of Indian Nationalism'-এর এই সংযোজনটিকে একটি পুস্তক হিসাবে প্রকাশ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলে বর্তমান গ্রন্থটি 'Social Background'-এর বিস্তৃত সংযোজনের প্রকৃতি পেয়েছে।

বেশ কয়েকবছর ধরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ব্যাপারটিকে নিয়ে তার সামাজিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আমি গবেষণা করছি। ভারতের নানা ঘটনার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিপুল পরিমাণ লেখালেখি চলছে এবং তাও আবার দ্রুত পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে। আমি বিকাশমান ঘটনাবলীকে আরও বিস্তৃতভাবে ও সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে বিষয়টিকে ধরতে চেয়েছি যার ফলশ্রুতি হল 'Social Background'-এর এই সংযোজন।

আমার গবেষণাকালে আমি বেদনামিশ্রিত বিস্ময় নিয়ে দেখেছি যে বিগত বিশ বছরে সংঘটিত নানা ঘটনার—যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে গোলমেলে ও পরস্পর বিরোধী—সুসংলগ্ন চিত্রায়ন হয়নি বললেই চলে।

সাহসিকতাপূর্ণ অনুমানের দ্বারা অনুপ্রাণিত সাহিত্যের একটা বেদনাদায়ক অভাব রয়েছে। পরন্তু, তা সাধারণভাবে প্রায়োগিক, অভিজ্ঞানমূলক ও প্রতীকমূলক বর্ণনার সীমানাও অতিক্রম করতে পারেনি। সামগ্রিক বিকাশের মূল্যায়নের কিছু কিছু প্রয়াসে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর দারিদ্র্যও প্রকট আর সেগুলোর প্রেক্ষা-

পটে রয়েছে হয় হিন্দুদের সৃজনশীল প্রতিভা কিংবা অতিমানব তত্ত্ব। বর্তমান সরকারের পক্ষে গোঁড়া যুক্তি রয়েছে বেশ কিছু লেখাতে। সেগুলো ভারতের সামাজিক বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোকেও এড়িয়ে গিয়েছে। সামাজিক মূল্যায়নের বিকাশটাকে কলের করাত দিয়ে টুকরো টুকরো করা ছবির মত দেখান হয়েছে।

আমার মনে হয়েছে স্বাধীনতার পরে আসল অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, রাজনৈতিক তত্ত্ব, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পরিবর্তে সুবিধাজনক কৈফিয়ৎ দর্শনের একটা প্রয়াস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ সত্যের জন্য যন্ত্রণাদায়ক অনুসন্ধানের পরিবর্তে সেগুলো শাসকগোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটাতেই যেন ব্যস্ত। খুবই যুক্তিসংগতভাবে যেমন একজন বিদগ্ধ বিজ্ঞানী বলেছেন, "সমাজ বিজ্ঞানের পক্ষে প্রয়োজন হল বিশদ টেক্‌নিকের পরিবর্তে মৌল সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে না গিয়ে সেগুলোর মোকাবিলা করা।"

ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্য মৌল সমস্যাগুলোর সম্মুখে আসেনি—বরং ভারতীয় সমাজের সম্মুখে মুখব্যাদানরত আসল যুগান্তকারী সমস্যাগুলোকে যেন এড়িয়ে যেতে চেয়েছে।

C. Wright Mills তাঁর সাম্প্রতিক চিন্তাগর্ভ প্রকাশনা "Sociological Imagination"-এ একালের সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণার নানা অসম্পূর্ণতাকে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

> "ঐতিহাসিকভাবে অন্তর্নিহিত কোন প্রবণতা যদি আমেরিকার সমাজ বিজ্ঞানগুলোতে থাকে তবে তা হল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গবেষণা, তথ্য-সংক্রান্ত পরীক্ষা, যুক্তির বহুত্ববাদী বিশৃংখলার একটা সংসর্গী গোঁড়া-মতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। সমাজ-বিদ্যার একটা বিশেষ ধরণ হিসাবে উদারনীতিক প্রয়োগীয়তার এগুলো প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য; কেননা যদি প্রতিটি জিনিষের পিছনে থাকে সংখ্যাহীন উপাদান তবে আমাদের হাতের বাস্তব কাজগুলোতে সবচেয়ে বেশি সতর্কতাই বাঞ্ছনীয়। আমাদের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ঘাঁটতে হবে আর তাই কোন ছোট বিষয়ের সংস্কার সাধন কিংবা তার পরিণতি জানাই প্রথমে দরকার— অন্য বিষয়টির সংস্কারের প্রশ্ন উঠতে পারে। আর অবশ্যই আমাদের

অন্ধ মত পোষণ না করা ও খুব বড় প্রকল্প হাতে না নেওয়াই উচিৎ। আমাদের অবশ্যই একটা সর্বব্যাপী মিথস্ক্রিয়ার প্রবাহে ঢুকতে হবে এবং তা করতে হবে বাস্তবে বহুবিধ কারণ সম্বন্ধে এ যাবৎ অজানা ও আগামীতেও অজানা থাকবে এমন সহনশীল সচেতনতা নিয়ে। সামাজিক পরিবেশের সমাজ বিজ্ঞানী হিসাবে আমাদের অসংখ্য ছোটোখাটো কারণ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। কার্যত. বুদ্ধির সংগে কাজ করতে হলে সামাজিক পরিবেশের ক্ষেত্রে টুকরো টুকরো সংস্কারের কথা অবশ্যই ভাবতে হবে।

সতর্কভাবে পা ফেল—জগৎটা এত সহজ নয়। সমাজকে ছোটোখাটো উপাদানে ভাগ করলে স্বভাবতই কোন কিছুর কারণ দর্শাবার জন্য তাদের কয়েকটির প্রয়োজন হতে পারে অথচ তাদের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আমরা একেবারে সুনিশ্চিত হতে পারবো না। একটা 'জৈবিক সমগ্রতার' ওপর গুরুত্ব 'আরোপ ও তার সংগে কারণগুলোর সঠিক বিবেচনায় ব্যর্থতা যেগুলো প্রায়শই কাঠামোগত আর তার সাথে সংযুক্ত একটা বিশেষ পরিস্থিতি পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা 'স্থিতাবস্থার কাঠামো' উপলব্ধিতে বেশ অসুবিধার সৃষ্টি করে।

উদারনীতিক ক্রিয়াপ্রবণতার জৈবিক অধিবিদ্যায় সমন্বয়ী ভারসাম্যের যে কোন প্রবণতাই গুরুত্ব পেয়ে থাকে। সব কিছুকে অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ারূপে দেখবার সময় আমরা হারিয়ে ফেলি ছন্দের আকস্মিক পরিবর্তন ও বৈপ্লবিক স্থানচ্যুতি যা আমাদের কালের বৈশিষ্ট্য; আর যদি বা তা নাও হারাই তাহলে সেগুলোকে শুধুমাত্র ব্যাধিগত ও অসংগতিব্যঞ্জক চিহ্ন বলে মেনে নিই। নিছক আনুষ্ঠানিকতা ও পরিগৃহীত ঐক্য আধুনিক সামাজিক কাঠামোর সমীক্ষার সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয়। (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৫-৮৬)'।

ভারতীয় পাণ্ডিত্য 'বিচ্ছিন্ন আবহের সমাজ বিজ্ঞানের' ব্যাধির দ্বারাও আক্রান্ত হয়েছে। 'উদারনীতিক ক্রিয়াপরতার জৈবিক অধিবিদ্যার' হাতেও তা বন্দী হয়ে পড়ছে। 'গতির আকস্মিক পরিবর্তন ও বৈপ্লবিক স্থানচ্যুতিগুলোকে' এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াসে আবরণ সৃষ্টি কিংবা সেগুলোকে ব্যাধিজনিত ঘটনা বলে গণ্য করাটাও তার বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐতিহাসিক সামাজিক কাঠামোগুলোর আসল সমস্যাগুলোকেও তা প্রধানতঃ এড়িয়ে যাচ্ছে।

Professor Mills সত্যই বলেছেন যে সামাজিক ঘটনাবলীর যে কোন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় নিম্নলিখিত মৌল প্রশ্নগুলোর উত্তর থাকবে ঃ

(১) সামগ্রিকভাবে একটি বিশেষ সমাজের কাঠামোটা কি? প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কি আর তারা কি ভাবে পরস্পর সম্পর্কিত? অন্যান্য সমাজ-ব্যবস্থা থেকে কি তার পার্থক্য? তাঁর অন্তর্নিহিত অবিচ্ছিন্নতা ও পরিবর্তনের জন্য কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অর্থ কি?

(২) মানব ইতিহাসে এরূপ সমাজের অবস্থান কিরূপ? কি কারণে তা পরিবর্তিত হচ্ছে? তার নিজের মধ্যে ও সামগ্রিকভাবে মানবজাতির জন্য কোথায় তার অবস্থান? কেমন ভাবে তার কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার সময়কার ঐতিহাসিক পর্যায়কে প্রভাবিত করছে কিংবা নিজেও প্রভাবিত হচ্ছে? আর এই পর্যায়ে তার বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? অন্যান্য পরিব্যাপ্তিকালের থেকে কি তার পার্থক্য? ইতিহাস রচনায় তার বৈশিষ্ট্যমূলক পথগুলোই বা কি কি?

বর্তমান গ্রন্থটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলোকে বুঝবার একটা প্রচেষ্টা। একটা সমন্বয়ী পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উত্তর সন্ধানেই এই প্রয়াস। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পদ্ধতির প্রয়োগে এ গ্রন্থ রচিত।

সমাজজীবনের মৌলি সমস্যাগুলোর আবিষ্কার অব্যাহত রাখতে অবিরত উৎসাহদানের জন্য আমি Dr. G. S. Ghurye-এর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

Dr Dhirendra Narain'কে ধন্যবাদ জানাই বইটি ছাপার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করার জন্য। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও তার সজ্জন সহকর্মীদের একইভাবে ধন্যবাদ জানাই। প্রকাশকদেরও ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। তাঁদের জিদ্ ছাড়া এ বই পৃথিবীর আলো দেখতো না।

লেখক বিশেষভাবে খুশি হবেন যদি তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'Social Background of Indian Nationalism'-এর মতই, এ বইটিও তার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে উপযুক্ত আলোচনার পথ প্রশস্ত করে।

সমাজতত্ত্ব বিভাগ
বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বে-১
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৬০

এ. আর. দেশাই

সূচীপত্র

প্রথম অংশ

যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর পর্যায়

ক

ইতিহাসের ঘূর্ণিবাত্যা

বিশ্ববিকাশের গতিশীলতা

যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর কালেব বছরগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। বহু দশকের ইতিহাস এই সময়ের বছরগুলোতে চাপাচাপি করে রাখা হয়েছে। কয়েকটি দেশের সমাজের আর্থিক ভিত্তি, রাজনৈতিক ও সামাজিক উপরিকাঠামোতে এসেছে গভীর পরিবর্তন আর কোন কোন ক্ষেত্রে, রূপান্তরও। মানুষের সামাজিক জগৎও বিভিন্ন জাতি শ্রেণী ও সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্গত বহু তীব্র বৈপরীত্য, বৈরীতা ও তাদেরই পরিণতিতে উদ্ভূত প্রচন্ড সংঘাতের রংগমঞ্চে রূপান্তরিত হয়েছে। এক বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ মানবজাতিকে শংকিত করছে তার পারমাণবিক বিপর্যয়, এমন কি সামগ্রিক মৃত্যুর আশংকায়। এরই পাশাপাশি অবশ্য ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল সামাজিক শক্তিগুলো বিজয় গৌরবে অগ্রসর হচ্ছে আর আত্মঘাতী বিপদ থেকে মানবজাতিকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।[১]

ইতিহাস দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই। ভারতীয় জনগণও এই ঐতিহাসিক প্রবাহের পরিক্রমণ পথে আকর্ষিত হয়েছে। এই সময়ে তারাও পেরিয়ে এসেছে বিরাট আর্থ-সামাজিক ওরাজনৈতিক পরিবর্তনের পথ।

যেহেতু আমাদের গ্রন্থের বিষয় হলো ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাম্প্রতিক প্রবণতা (ভারতের ইতিহাস নয়) সেহেতু আমরা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করবো তার গতিশীলতা আর যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে তার অভিজ্ঞতাপ্রসূত উত্থান-

১. য়ুনো ও ইউনেস্কোর অসংখ্য প্রকাশনা দ্রষ্টব্য।

পতনের কাহিনী। আমরা ভারতীয় জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণী ও আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীগত নানা সম্পর্ক, তাদের আপেক্ষিক শক্তি ও পারস্পরিক সংগ্রামের পরিবর্তনগুলোর নিরীক্ষায় প্রয়াসী। আমরা আরও দেখবো কতদূর বাস্তবায়িত হয়েছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য—যেমন, জাতীয় মুক্তি, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান, একটা স্বাধীন ও ভারসাম্যযুক্ত জাতীয় অর্থনীতির প্রবর্তন, সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী সম্পর্কের অবলুপ্তি, জাতীয় জনসমাজ ও সংখ্যা-লঘু গোষ্ঠীগুলোর সমস্যাদি, পৌর স্বাধীনতার সমস্যা প্রভৃতির সমাধান।

আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থ "Social Background of Indian Nationalism"-এ বর্ণিত ভারতের ইতিহাস ভারতীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর সংঘর্ষের ইতিহাস। এ সব শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া, প্রলেতারিয়েত, কৃষককুল (ভূমি-মালিক, প্রজা ও কৃষি বা ক্ষেতমজুর), নগর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্য-বিত্তরা, ধ্বংসপ্রাপ্ত হস্তশিল্পী ও কারিগরগণ, সামন্ত রাজগণ, আধা-সামন্ত ভূম্যধিকারী প্রভৃতি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংগে ভারতীয় জাতির মিথষ্ক্রিয়াও এ ইতিহাসে রয়েছে। ঐ সব সংগ্রাম ও মিথষ্ক্রিয়ার ঐতিহাসিক পরিণতি কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে ভারতীয় সমাজকে গতিশীলতা দান করে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিবর্তনের দৃষ্টিভংগী হতে যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয় সমাজের তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশের অবস্থান ও মূল্যনির্ণয়ের পূর্বে, ঐ একই সময়ে সংঘঠিত বিশ্বব্যাপী ঘটনাবলীর পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। এর কারণ হলো ভারতীয় সমাজ বিশ্বসমাজের এক সম্পূরক অংগ বা অন্যান্য সমাজের সংগে মিথষ্ক্রিয়ায় যুক্ত ও উভয়ই পারস্পরিক প্রভাবে প্রভাবিত। ভারতীয় সমাজের ঐতিহাসিক গতি শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ সামাজিক শক্তিগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিণতিমাত্র নয়—এর পেক্ষাপটে রয়েছে আন্তর্জাতিক জগতের শক্তিসমূহ ও এদেশের সমাজের উপর তাদের প্রভাব।

ভারতীয় সমাজের বিকাশের বৈজ্ঞানিক উপলব্ধিতে যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বিকাশের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে কেননা ভারতের বিকাশও জন্ম নিচ্ছে বিশ্ববিকাশের গর্ভে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল একদিকে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী বৈরিতা ও অন্যদিকে নাৎসি

জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতার মিশ্রিত ফল। এটা ছিল মিশ্রিত যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর দুটি সম্মিলনের মধ্যে হয়েছিল এ যুদ্ধ (ব্রিটেন, ফ্রান্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ বনাম তিন অক্ষশক্তি, যেমন জার্মানী, ইটালী ও জাপান); অন্যদিকে ছিল উক্ত যৌথ রাষ্ট্রমণ্ডলীর একটি বনাম সোভিয়েত ইউনিয়ন। বৈরী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর একটি গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল গণতন্ত্রবিরোধ ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো নিয়ে আর অন্যটির অন্তর্ভুক্ত ছিল গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর ফ্যাসিবাদী ও গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বৈরিতার মৌলিক কারণ ছিল ফ্যাসিবাদী দেশগুলোর একটা উদ্দেশ্য। এরা চেয়েছিল সম্প্রসারণ, চেয়েছিল উপনিবেশ যেখানে তাদের শিল্পজাত উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি পেতে পারে একচেটিয়া বা প্রায়-একচেটিয়া বাজার আর যে উপনিবেশগুলো তাদের শিল্পগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎস হতে পারে; আর তাছাড়াও তারা যাতে উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র হতে পারে যে পুঁজি নিজেদের দেশে লাভজনকভাবে বিনিয়োগ করা যাবে না। সেই সময় বিশ্বের অর্থনৈতিক ভূখণ্ডের একটা বড় অংশ প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর নিয়ন্ত্রণে কিংবা মালিকানায় ছিল এরা হলো ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি। এটাই ছিল বৈরিতার উদ্ভবগত কারণ যা উল্লিখিত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর দুটি বিরোধী জোটের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। কারণটা মৌলিক অর্থেই অর্থনৈতিক আর ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর আগ্রাসী আচরণের ব্যাখ্যা তাতেই মেলে।

এই যুদ্ধ দুই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর জোটের মধ্যে, তাই এটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, যার উদ্দেশ্য ছিল একটি জোটের কর্তৃত্বাধীন অর্থনৈতিক ভূখণ্ড ও উপনিবেশগুলো বলপূর্বক অধিকার করা, আর অন্যদিকে ভিন্ন জোটটির দ্বারা সেগুলো দখলে রাখা।

দুটি পরস্পর বিরোধী জোটের মধ্যে আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সেটি হলো এই যে জার্মানী, ইটালী ও জাপানের রাষ্ট্রিক কাঠামোটি ছিল গণতন্ত্রবিরোধী ও ফ্যাসিবাদী, আর ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য অনুষংগী দেশগুলো ছিল গণতান্ত্রিক।

তাই গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো ফ্যাসিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর আক্রমণ প্রতিরোধের প্রয়াসে, প্রসংগক্রমে তাদের নিজেদেরও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রিক কাঠামো এবং সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোকে রক্ষা করছিল ভাবী বিজেতা

পক্ষ, যেমন, ফ্যাসিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর হাত থেকে সে অধিকারগুলো যতই কম, পংগু, বিকৃত ও প্রতারণামূলক হোক না কেন—বিশেষ করে পুঁজিবাদী সম্পর্কের দরুণ)।

এই বাস্তব ব্যাপারটি ঐসব দেশকে তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধোঁকা দিতে সাহায্য করলো এই বলে যে তারা গণতন্ত্রকে রক্ষা করতেই আগ্রহী যদিও তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিলো ফ্যাসিবাদী আক্রমণকারীদের দিক থেকে বিপদগ্রস্ত উপনিবেশগুলোর উপর নিজেদের লুণ্ঠনকার্য বজায় রাখা।

যুদ্ধের চরিত্র

এই দুটি রাষ্ট্রজোটের মধ্যে যুদ্ধ ছিল বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যেকার সংঘাত—একদিকে সেই সব দেশ যারা অতীতে অসংখ্য ঔপনিবেশিক শাসনাধীন জনগণকে পদানত করে শোষণ করেছে আর অন্যদিকে সেই সব রাষ্ট্র যাদের হাতে উপনিবেশ ছিল না অথচ যারা তাদের দখলচ্যুত করতে চেয়েছিল।

গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর 'গণতন্ত্রের প্রতিরক্ষা'-র ঘোষিত লক্ষ্য ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের বলপূর্বক অধিকারের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক ভোগ-দখল রক্ষার মুখোশের নামান্তর ছিল (আর্থিক অথবা রাজনৈতিক অর্থে)। এর বাস্তব দৃষ্টান্ত হল এই যে যুদ্ধকালে এই সব রাষ্ট্র উপনিবেশগুলোর পরাধীন জনগণকে স্বেচ্ছায় গণতান্ত্রিক অধিকার অর্পণ করেনি, করেনি স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্যের অবসায়ন কিংবা অনগ্রসর জাতিগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণও করতে ছাড়েনি।

'গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদে অন্তর্নিহিতভাবে শান্তি সৃষ্টিকারী কিংবা যুদ্ধ-বিরোধী কিছু থাকে না। বাস্তবে গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো পৃথিবীর উপর কর্তৃত্বস্থাপনে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করেছে আর যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে দিয়েই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে।

এটা একটা দুর্ঘটনাই বটে যে যুদ্ধের সময়ে বৈরী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর এক পক্ষ হয়ে পড়ল গণতান্ত্রিক আর অন্য পক্ষ ফ্যাসিবাদী। বাইরের এই পার্থক্য-টাই এদের সংঘর্ষের একমাত্র কারণ নয়। সম্প্রসারণ, অধিকার ও অর্থনৈতিক ভূখণ্ডের বিরাট এলাকাকে বলপূর্বক দখল করে নেওয়ার প্রয়াসে জার্মান ধনতন্ত্র-বাদের আর্থিক ও অপ্রতিরোধনীয় লালসাই ছিল যুদ্ধের প্রধান কারণ। নাৎসিবাদী রাষ্ট্রের যুদ্ধবাসনা ও যুদ্ধকালীন কর্মসূচী জার্মান একচেটিয়া মূলধনের প্রয়ো-

জনীয় সম্প্রসারণের মনোগত প্রকাশ ছিল মাত্র। ইটালী ও জাপানের ধনতন্ত্রবাদের সম্পর্কে অনুরূপ উক্তিই খাটে।

অক্ষশক্তিগুলোর নেতৃত্ব নিয়ে নাৎসি জার্মানী তার সম্প্রসারণবাদী লুণ্ঠন কাজকে বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনা নিয়েছিল গনতান্ত্রিক শক্তিগুলো, এমন কি সোভিয়েত ইউনিয়নেরও স্বার্থহানি করে। যখন নাৎসি জার্মানী সোভিয়েত ইউ-নিয়নকে আক্রমণ করে তখন তা ছিল ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের যুদ্ধ। নাৎসি জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য রক্ষা কর-ছিল না কেননা তার এ ধরনের কিছু ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক থেকে ছিল সম্পূর্ণ আত্মরক্ষার যুদ্ধ আক্রান্ত হবার পূর্বে নাৎসি জার্মানীর সংগে তার চুক্তির সমর্থন অথবা বিরোধিতা যে ভাবেই করা হোক না কেন।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, ঔপনিবেশিক শাসনাধীন জাতিগুলোর যুদ্ধ ছিল সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই বিরুদ্ধে—তারা ফ্যাসিবাদীই হোক আর গণতান্ত্রিকই হোক। আর বিদেশী ফ্যাসিবাদীরা ইউরোপের দেশগুলোকে অধিকার ও দাসত্বে আবদ্ধ করলে তাদের জনগণও ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিল।

যুদ্ধের মূল্য

বিভিন্ন পর্যায়ে যুদ্ধের অগ্রগতির আলোচনায় আমাদের দরকার নেই। প্রারম্ভিক পর্যায়ে বিরাট জয়ের পর ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলোর নিদারুণ পরাজয় ঘটে। ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত পেঁছেও সাম্রাজ্যবাদী জাপানের সেনাবাহিনী শেষ মুহূর্তে পরাভূত হয় আর তারা হিরোসিমা ও নাগাসাকির পারমাণবিক বিনাসের পরমুহূর্তে শান্তির জন্য আবেদন করে। নাৎসি জার্মানীর সেনাবাহিনী স্ট্যালিনগ্রাড ও মস্কো পর্যন্ত এগিয়ে এসেও সেখানে থামতে বাধ্য হয় ও লাল ফৌজের চাপে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় ও আত্মসমর্পণ করে।

এইভাবেই অবলুপ্ত ঘটে তিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল ধ্বংসাত্মক ও বিনাশ-কারী। নির্ভরযোগ্য হিসাব অনুযায়ী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যেখানে মৃত ও অংগহানির শিকারের সংখ্যা ছিল ৩০ মিলিয়ন ও আর্থিক ব্যয় ৩৫ হাজার মিলিয়ন পাউণ্ড,

সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মৃতের পরিসংখ্যান হলো ৪১ মিলিয়ন (সামরিক ও অসামরিক মানুষ) আর আর্থিক ব্যয় ২২৩ মিলিয়ন পাউণ্ড।[২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুদূরপ্রসারী ফলাফল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। পৃথিবীর চেহারাটাই বিরাটভাবে রূপান্তরিত হয় এর ফলে। বিভিন্ন জাতি, শ্রেণী ও সমাজ সম্পর্কে ও আপেক্ষিক ক্ষমতায় গভীর পরিবর্তন আসে। ইতিহাসের বিস্মৃতিতে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী দেশ তলিয়ে যায় কিংবা তারা তাদের অতীতের দুর্দান্ত প্রতাপ হারিয়ে ফেলে। বেশ কয়েকটি দেশে বিভিন্ন মাত্রায় পুরাতন সম্পত্তি সম্পর্কের স্থান নেয় নতুন সম্পত্তির সম্পর্ক (পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলো, চীন)। পুরাতন বিভিন্ন ধরণের সম্পত্তি সঙ্গে বাঁধা শ্রেণীগুলো সেকালের সম্পত্তিগত বিন্যাসেব বিবর্তনের দরুন অন্তর্হিত হয়ে যায়। নয়া ধনতন্ত্রবিরোধী রাষ্ট্রগুলোর উন্মেষ ঘটে পূর্ব ইয়োরোপের পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাংগেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও পূর্ব জার্মানীতে। এদের উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা আর সেই লক্ষ্যসাধনে তারা বিভিন্ন মাত্রায় সম্পত্তির সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক কাঠামোর অবসান ঘটায় আর এই ভাবেই সেই ধরণের সম্পর্কে বিন্যস্ত শ্রেণীগুলোকে বিলুপ্ত করে। এই সব পরিবর্তনের ফলে বিশ্বধনতন্ত্রবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এলাকা আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে আর সুরু হয় সংকুচিত বিশ্ববিপণন ও কাঁচামালের উৎস সন্ধানে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে প্রবল সংঘাত। তাছাড়া, ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি অতিকায় ধনতান্ত্রিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে যা প্রায় সবকটা ধনতন্ত্রী দেশের উপর ক্রমবর্ধমান আর্থিক আর সেই কারণেই, রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করে যাচ্ছে—যে দেশগুলোর কয়েকটি বেশ পুরাতন ও বিশ্বজোড়া ঐতিহ্যের খ্যাতি সমন্বিত, যেমন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স।

বিশ্বচিত্রের রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি এখানেই থামে নি। বেশ কয়েকটি ঔপনিবেশিক দেশে প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যায়ের তুলনায় আরও বড় উদ্দেশ্য ও উগ্রতা নিয়ে মুক্তি-আন্দোলন সুরু হয়। এ সব আন্দোলনের পরিণতিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীরা তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয় (ভারত,

২. দ্রষ্টব্য : R. P. Dutt : The Crisis of Britain and BritishEmpire.

পাকিস্তান, সিংহল, বর্মা, ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, লাওস, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি)।

তাছাড়া, আফ্রিকা ও অন্যান্য মহাদেশের নতুন ও এ পর্যন্ত সুপ্ত জাতিগুলো জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কক্ষপথে সর্বপ্রথম এসে পড়ে।

আমাদের সামনে যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে স্বাধীনতা ও সাম্যের আকাংক্ষা এত বড় উচ্চতায় কখনও পৌঁছোয় নি।

খ

পরিবর্তিত সামাজিক পটভূমি

পৃথিবীর ছবিটি এই পর্যায়ে এত বিরাটভাবে বদলে গেছে যে সেই রূপান্তরটির পূর্ণ উপলব্ধিতে প্রয়োজন বড় রকমের মানসিক প্রয়াস। এর কারণ হল মানুষ বর্তমান যুগে এক বিশ্বব্যাপী সামাজিক পরিপার্শ্বে বাস করে আর সেই জন্য সে নিজেই পৃথিবীজোড়া ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত ও অশ্রুতপূর্ব উত্তেজনাভরা ঘটনাবলীর খরস্রোতে তথা আবর্তে অবশ্যম্ভাবীরূপে ধরা পড়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোর গুরুত্বপূর্ণ নানা ঘটনার নিয়তি নির্দিষ্ট তাৎপর্যের সম্পূর্ণ উপলব্ধিতে একজন ব্যক্তিকে সুকৌশলে মত পরিবর্তন করে সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আর তাকে দেখতে হবে তার সুগভীর জটিলতা, প্রচণ্ড গতিশীলতা আর ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্যে।

সংক্ষেপে, এই সময়কার পৃথিবীর পরিবর্তিত সমাজ চিত্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হল :

(১) বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের অবস্থানগত পরিবর্তন।

(২) পুরাতন ঔপনিবেশিক পরাধীন দেশগুলোর বেশ কয়েকটির স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হওয়া আর তাদের সমস্যাদি ও সংগ্রাম।

(৩) পূর্ব ইয়োরোপ ও চীনে কয়েকটি অ-ধনতান্ত্রিক দেশের আবির্ভাব ও তাদের নিজেদের, ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক।

(৪) এই সব বিভিন্ন শ্রেণীর দেশগুলোর গতিশীল আন্তঃসম্পর্ক যা আজকের সমাজ-জীবনের দীর্ঘ নাটকটির প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিপুল শক্তিরূপে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব

প্রথমে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সাম্রাজ্য-

বাদী জগতের পরিবর্তনগুলো, মুখ্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর অবস্থান ও ক্ষমতার পরিবর্তন আর তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপান্তর।

আগে যেমন বলেছি যুদ্ধে পরাজয়ের দরুণ তিনটি ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশ, জার্মানী, ইটালী ও জাপানকে স্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসেবে বিদায় নিতে হয়। এমন কি জার্মানী বিভক্তও হয়ে যায়। অন্যান্য কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ, অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া, যুদ্ধে বিজয়গৌরব সত্ত্বেও, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে বেশ কিছুটা দুর্বল হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের সাম্রাজ্যে আসে সংকট, তাদের আর্থিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা গুরুতররূপে হ্রাস পায় তাদের সামরিক শক্তিরও বিরাট ক্ষয় হয়।

যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রগুলোতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসেবে উদ্ভব ঘটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। আজকের ধনতান্ত্রিক জগতে তার অবস্থান প্রশ্নাতীত 'টাইটান' হিসেবে। "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবতীর্ণ হয় প্রধান যুদ্ধমান দেশগুলোর শেষ শক্তি হিসেবে - সবচেয়ে কম ঝঞ্ঝাটে সবচেয়ে বেশি সুবিধা আদায়ের প্রয়াসে। অন্য দেশগুলো হল দলিত মথিত, বিধ্বস্ত অথবা ঝটিকা আক্রমণের শিকার। অব্যাহতি পেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দরিদ্র ও দুর্বল হয়ে পড়লো অর্থনৈতিক ও আর্থিক দিক থেকে অন্য দেশগুলো। আমেরিকার একচেটিয়া পুঁজিবাদীরা বিশাল মুনাফা তুলে নিল, সরকারী হিসেবে, কর বাদ দিয়ে, মোট ৫২ মিলিয়ন ডলার অথবা ১৩,০০০ পাউণ্ড। তারা তাদের কারখানার উৎপাদিকা ক্ষমতা অর্ধেক বাড়িয়ে তুললো আর মূলধনী তহবিলের পুঞ্জিত পরিমাণ হল ৮৫ মিলিয়ন ডলার বা ২১ ২৫০ মিলিয়ন পাউণ্ড। পুঞ্জিত মূলধন ও উৎপাদিকা শক্তির এই বিরাট প্রসারণ যুদ্ধের পরই খুঁজতে চাইল এক নির্গমদ্বার আর তার ফলে প্রশস্ত হল আমেরিকার বিশ্বব্যাপী প্রসারণের পথ যা যুদ্ধোত্তর বছরগুলোর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে আছে।[১]

যুদ্ধশেষে, আমেরিকার ধনতন্ত্রবাদ যার প্রয়োজন হয়েছে উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধি ও সঞ্চিত মূলধনের দ্রুত প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, শুধুমাত্র এশিয়া, আফ্রিকা ও পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশগুলোতেই অনুপ্রবেশ করেনি— তা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতেও ঢুকে পড়েছে। আমেরিকার

১. পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১২১-২২

পুঁজিমূলধন উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ ও অর্ধোন্নত নতুন দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছে আর বাণিজ্যিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে সমগোত্রীয় সাম্রাজ্যবাদগুলোকে অপসারিত করে ফেলেছে।

বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের অভিভাবকত্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ

সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক বেশ কয়েকটি দেশে ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক সাহায্য দানের ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজবাদ তিনটি বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রথমতঃ, এর দরকার হয় উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও পুঁজির জন্য একটা নির্গম পথ। দ্বিতীয়তঃ বেশ কয়েকটি দেশের (ব্রিটেন ও ফ্রান্স যাদের অন্তর্গত) জাতীয় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি যুদ্ধের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার মত নিম্নগামী হয়ে পড়ে। এর পরিণতিতে উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলোতে বিরতি আসতে পারতো যার ফলে আবার দেখা দিতে পারতো এসব দেশে সমাজ বিপ্লব। পতনোন্মুখ ধনতন্ত্রবাদের যুগে এ সব সমাজ বিপ্লব হত হয় সমাজতান্ত্রিক কিংবা সাম্যবাদী। মার্কিন সাম্রাজবাদী ধনতন্ত্রবাদের পক্ষ থেকে ক্বচিৎ এ ধরণের পরিপ্রেক্ষিত ও চরম সম্ভাবনাকে স্বাগত জানাবার প্রত্যাশা মোটেই করা যেত না। সমসাময়িক যুগের একমাত্র শক্তিশালী ও সচ্ছল ধনতান্ত্রিক দেশ হিসেবে সে বিশ্বের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভিভাবকের ভূমিকা নিতে শুরু করলো। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের দেউলিয়া ধনতন্ত্রবাদকে উদ্ধারের জন্য সে এগিয়ে এল আর মার্শাল পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে নিশ্চিত অনুদান দিয়ে যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে তাদের ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাল।

খ্যাতিমান লেখক John Gunther মন্তব্য করেছেন, "সততার সঙ্গে আমি বিশ্বাস করি যে গ্রীস থেকে আমেরিকার সাহায্য প্রত্যাহৃত হলে গ্রীক সরকার দশ দিনের বেশি টিঁকত না। ফ্রান্স ও ইটালীর সরকারও কয়েক সপ্তাহ বা মাসের বেশি এ অবস্থায় ক্ষমতাসীন থাকতো না।"[২]

তৃতীয়তঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বেশ কয়েকটি দেশে কৌশলগত কারণেও অর্থনৈতিক ও অনুরূপ সাহায্য দেয়। এর উদ্দেশ্য হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রবাহ থেকে ধনতন্ত্রবাদকে রক্ষা, প্রায়শঃ ঘটমান জাতীয় ও ঔপনিবেশিক বিপ্লবগুলোর বিস্তৃতিকে বাধা দেওয়া আর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে ঘিরে কৌশল-আশ্রয়ী কম্যুনিস্ট বিরোধী বেশ কিছু ঘাঁটি স্থাপন যাতে ভবিষ্যতের যুদ্ধে সেগুলোকে ব্যবহার করা

২. দ্রষ্টব্য: New York Herald Tribune, February 3, 1949.

যায়। তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে যুদ্ধের জন্য সে বিরাট প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিশাল আর্থিক সম্পদের সাহায্যে সে তৈরী করছে শক্তিশালী সামরিক যন্ত্র। যুদ্ধের পূর্বেকার তুলনায় সে এখন ব্যয় করছে অস্ত্রসজ্জায় একশ ভাগ বেশি অর্থ। তারা পৃথিবীতে বিশ্বের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভিভাবক হিসেবে অসংখ্য সামরিক, নৌ ও বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করে চলেছে। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান মঞ্জুরকালে সে এ ধরণের সর্ত আরোপ করে (প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে)। কয়েকটি দেশকে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী করার জন্য সে প্রত্যক্ষভাবে অস্ত্র সরবরাহ করে। এসব দেশের ধনতান্ত্রিক সরকারগুলো কিছুটা নিজেদের দেশের মাটিতে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী বিপ্লবের আশংকায় আর কিছুটা তাদের উপর মার্কিনী চাপে, নিজেদের অস্ত্রশস্ত্রই শুধু বাড়াচ্ছে না, উপরন্তু নিজেদের দেশে ঘাঁটি নির্মাণে মার্কিন প্রস্তবে সম্মতিও দিচ্ছে। ধনতান্ত্রিক জগৎ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সামাজতান্ত্রিক দুনিয়ার মধ্যে এক নয়া বিশ্বযুদ্ধের বাড়তি ভয় এ ধরণের মার্কিন প্রস্তাবে সাড়া দিতে বাধ্য করেছে। এই প্রবণতার সাক্ষ্য দিচ্ছে ন্যাটো, সিয়েটো ও বাগদাদ চুক্তি প্রভৃতি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশের নির্ভরশীলতার একটা তাৎপর্যময় ফল হল মার্কিন দেশের শক্তিবৃদ্ধি। অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল দেশগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করে সে তার নীতিগুলোর প্রতি তাদের সমর্থন আদায় করে। সাহায্যদান বন্ধের ভয় দেখিয়ে সে রাষ্ট্রসংঘে তাদের রাজনৈতিক ভোট আদায় করে। যদিও বৃটেনের মত আপেক্ষিকভাবে শক্তিশালী দেশগুলো মাঝে মাঝে এই ধরণের চাপ প্রতিরোধ করে; তথাপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর তাদের অর্থনৈতিক ও রণকৌশলগত নির্ভরতার বাস্তবতা তাদের মনে রাখতেই হয়।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অবনয়ন

যুদ্ধের জয়লাভ করলেও ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি অনেক হ্রাস পায়। প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী আমেরিকার উপর নিজেদের বিধ্বস্ত অর্থনীতি চাংগা করতে তারা অর্থনৈতিকভাবে তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে—ফলে তার প্রতি তাদের রাজনৈতিক অধীনতাও স্বীকার করতে হয়।

অবশ্য একথার অর্থ এই নয় যে অন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বগুলো দূরীভূত হয়েছে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতিযোগিতামূলক চরিত্রের মূলে থাকে বলে এ সব

দ্বন্দ্ব তাদের কাজ ঠিকই করে যায় ; তবে সব সাম্রাজ্যবাদী দেশের মৌলিক ঐক্যের কাঠামোর মধ্যে এগুলোর প্রয়োজন হয় বেশি, কারণ, প্রসারণশীল ও নিগূঢ়তর ঔপনিবেশিক বিপ্লব মেট্রোপলিটন দেশগুলোতে তীব্রতর সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম আর সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বর্ধিত শক্তি যা পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ দখল করেছে।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে সংঘাতের প্রকৃতি

অবশ্য আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী সংঘাত একটি সাধারণ বিপদের মুখোমুখি হয়ে তাদের নিজেদের ঐক্যবদ্ধতার সীমানার মধ্যেই ঘোরাফেরা করে থাকে।

এই আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী সংঘাত রাজনৈতিক, আর্থিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন-ভাবে আত্মপ্রকাশিত হয়েছে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এর প্রকাশ ঘটেছে। এখানে সাম্রাজ্য-বাদী প্রতিদ্বন্দ্বীরা বাজার, কাঁচা মালের উৎস ও পুঁজি বিনিয়োগের এলাকা নিয়ে সংগ্রামরত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমেরিকার পুঁজি ভারতসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশ, কানাডা, লাতিন আমেরিকা, ইয়োরোপ ও আফ্রিকার দেশগুলোতেএমনকি ব্রিটেনেও ব্রিটিশ পুঁজি তাড়াতে ব্যস্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকতর আর্থিক ক্ষমতার দরুন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমেরিকান পুঁজির বর্ধিত বিনিয়োগের সাধারণ প্রবণতাই লক্ষ্যণীয়। তাদের বিভিন্ন ও সংঘাতময় আর্থিক স্বার্থ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোকে চীনের মত সমাজতান্ত্রিক দেশ ও অন্য কয়েকটি রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী মনোভাব ও নীতিগ্রহণে উৎসাহ দিচ্ছে। তাই রাষ্ট্রসংঘে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে স্বীকৃতি ও আসনদানের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপোষহীন বিরোধী-তার দৃষ্টিকোণের লক্ষ্যণীয় বৈপরীত্যে ব্রিটেন চীনকে স্বীকার করে নিয়েছে ও বিশ্বসভায় তার অন্তর্ভুক্তি দাবী করেছে। আন্তর্জাতিক জগতে সৃষ্ট সমস্যাদি নিয়ে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিভিন্ন স্বার্থের জন্য তাদের পৃথক পৃথক নীতি নির্ধারণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, সুয়েজ প্রশ্ন নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংগ-ফরাসী-শক্তি-দ্বয়কে মিশরের বিরুদ্ধে তাদের আগ্রাসন তুলে নিতে বাধ্য করে। মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে পরস্পর বিরোধী নীতিগ্রহণে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী সংঘাতের প্রতিফলন দেখা যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যে সব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সমাজতান্ত্রিক শক্তি ধন-তন্ত্রকে ভয় দেখাচ্ছে তাদের প্রতিরোধে গৃহীত পদ্ধতিগুলোর সমস্যা নিয়েও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে দেখা গিয়েছে, মতামত ও নীতি নিয়ে বিভ্রান্তি। এসব

ব্যাপারে তাদের পৃথক নীতি তাদের নিজ নিজ ভিন্নমুখী দৃষ্টিভংগীগুলো থেকেই জন্মায় - যে দৃষ্টিভংগীগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের শ্রেণীগত ধনতান্ত্রিক স্বার্থ দ্বারা। তাই দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র. ব্রিটেন ও ফ্রান্সের রয়েছে সমাজতান্ত্রিক জোট অথবা ঔপনিবেশিক দেশগুলোর বিপ্লবকে রুখবার প্রশ্নে নিজ নিজ ধারণা।

প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কোন দেশের উপর তার জোটের যে কোন শক্তিকে স্থানচ্যুত করে সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ. মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই ধরণের সংঘাতের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার নবজাগ্রত আরব জগৎ যখন তাদের কয়েকটি দেশের উপর হতে ব্রিটিশদের মুষ্টি শিথিল করতে গিয়ে ক্ষমতার দিক থেকে একটা শূন্যতার সৃষ্টি করলো তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই সেই শূন্যস্থান পূরণে প্রয়াসী হলো।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কৌশল

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সাধারণকৌশল হলো যেসব দেশে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাজনৈতিক আধিপত্যের মাটি সরে যাচ্ছে সে সব দেশে তাদের রাজনৈতিক কবজা ঢিলে করার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আপোষে পৌঁছানো যদিও আর্থিক স্বার্থ-সংরক্ষণে তাদের আগ্রহ ঠিকই থাকে যেমন, ভারতে বৃটেন ও অন্যান্য দেশের বৈদেশিক মূলধন, ইরাক প্রভৃতি দেশে ব্রিটিশ মালিকানাধীন তৈল সম্পদ সুরক্ষিত রাখা)। এ ধরণের আপোষ অসংখ্য রাজনৈতিক-আর্থিক রূপ নিয়ে থাকে।

ঔপনিবেশিক জাতিগুলোর প্রতি শাসকগোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মনোভাব দুটি প্রান্তীয় পাল্লায় নিবদ্ধ। একদিকে আলজেরিয়ার ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আলজেরীয় জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন নির্দয়ভাবে দমন করেছে, অন্যদিকে ভারতবর্ষকে স্বাধিকার দিয়েও বৃটেন এক চুক্তি সম্পাদন করে এদেশে তার বিনিয়োগ করা পুঁজিকে হাতে রেখেছে।

সাধারণতঃ, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের শাসনাধীন ঔপনিবেশিক দেশগুলোর উপর থেকে তাদের রাজনৈতিক মুষ্টি শিথিল করলেও তাদের উপর যথারীতি তাদের আর্থিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণকে স্থায়ী করতে চাইছে। এসব দেশে তাদের উপর নির্ভরশীল সামন্ত ও ধনতান্ত্রিক শ্রেণীগুলোকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ও বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ক্ষমতাও হস্তান্তর করে চলেছে।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ঔপনিবেশিক দুনিয়া

এখন আমরা দেখবো যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অনুন্নত ও অর্ধোন্নত দেশগুলো নিয়ে গঠিত ঔপনিবেশিক দুনিয়ার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য।

শ্রেণী বিন্যাস

ঔপনিবেশিক দেশগুলোকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো রাজনৈতিক স্বাধিকার প্রাপ্ত আর অন্য শ্রেণীটির অন্তর্গত দেশগুলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেনি কিন্তু জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে সাধারণভাবে সংগ্রামরত। তাছাড়া রয়েছে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও অন্যান্য মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত বহুদেশের সদ্যজাগ্রত জাতিগুলো যারা বৃহত্তর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঔপনিবেশিক বিপ্লবের কক্ষপথে সর্বপ্রথম এসেছে।

তাছাড়া, যেসব দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাদের কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে উন্নয়নের পথ ধরে চলেছে (চীন উত্তর ভিয়েতনাম প্রভৃতি) আর অন্য কয়েকটি দেশ ধনতান্ত্রিক অথবা রাষ্ট্রীয় ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ ধরে চলেছে।

কয়েকটি দেশ (ভারত, সিংহল, বার্মা মিশর, পাকিস্তান প্রভৃতি) ক্ষমতাসীন সাম্রাজ্যবাদের এক নয়া কৌশলের পরিণতিতে স্বাধীন হয়েছে। এসব দেশে সাম্রাজ্যবাদ তার রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীগুলোকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে অথচ চুক্তির ভিত্তিতে সে সব দেশে তার বিনিয়োগ করা পুঁজিকে সংরক্ষিতও করেছে।

কিন্তু চীনের মত দেশগুলোতে পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব ও দেশজ পুতুল সরকারকে সাম্যবাদী দলের নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অপসারিত হতে হয়েছে।

নতুন স্বাধীন দেশগুলোর শাসকশ্রেণীর সমস্যাদি

নতুন স্বাধীন দেশগুলোর ক্ষমতাসীন ধনতান্ত্রিক শ্রেণীগুলো নিজেদের দেশে সমৃদ্ধিশালী ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেছে যেহেতু সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবন্ধকতার দরুন এই সব অর্থনীতির স্বাধীন বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অনগ্রসর হয়ে পড়েছে, আর যেহেতু তাদের অবস্থান এখন বিশ্বপুঁজিবাদের অবনয়নের পর্যায়ে, যেহেতু ক্ষমতাসীন পুঁজিবাদী শ্রেণীগুলোর সামনে এসেছে বিরাট অসুবিধা। তাদের নির্ভর করতে হচ্ছে মূলধন, মূলধনী দ্রব্য ও প্রয়োগবিদদের

জন্য মোটারকমের বিদেশী আর্থিক সাহায্যের উপর। এদের আর্থিক নীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা, আংশিক জাতীয়করণ, ব্যক্তিগত পুঁজির স্বল্পতার দরুন নতুন রাষ্ট্রিক উদ্যোগ গ্রহণ, সাধারণ মানুষের উপর উচ্চহারে কর আরোপ ঘাটতি ব্যয় প্রভৃতির মাধ্যমে ভারী আর্থিক বোঝা চাপানো। এক ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে অন্তর্নিহিত ও অনতিক্রম্য নানা সুবিধার জন্য এ সব দেশের জাতীয় ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিগুলো বিকাশ লাভ করছে পর্যাবৃত্ত ভাঁটা ও ভারসাম্যহীনতার নিয়ম মেনে আর সর্বোপরি জনগণের জীবনযাত্রার মানের ক্রমাবনতির ভিত্তিতে। এর ফল হয়েছে দেশের বিপণন ব্যবস্থার সংকোচন। এমনিতেই সীমিত বিদেশী বাজার এসব দেশের প্রতিযোগীদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুন আরও সংকুচিত হয়ে আসছে।

বুর্জোয়া সরকারগুলোর দ্বারা গৃহীত কিছু কিছু সংস্কার সত্ত্বেও এসব দেশের কৃষি অর্থনীতি চোখে ধরা পড়ার মত প্রগতি দেখাতে পারছে না। বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা এর জন্য দায়ী, যেমন, মান্ধাতা আমলের প্রযুক্তি, জমির খণ্ডীকরণ, চাষীদের বিরাট ঋণের বোঝা, কৃষির উপর অত্যধিক চাপ, সামন্তযুগীয় কিছু কিছু প্রথা, ধ্বংসপ্রাপ্ত কারিগরদের বিকল্প পেশার অভাব কৃষিজীবীদের অধিকারচ্যুতি, অলাভজনক জোত প্রভৃতি। শ্রেণীগত মেরুভবনও এসব দেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রমাণ মেলে সমাজের নিম্নতর ও মধ্যবিত্ত স্তরগুলোতে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও তারই পরিণতিতে তীব্রতর শ্রেণীগত ও অন্যান্য সামাজিক সংঘাতগুলোর মধ্যে। এসব দেশের শাসক গোষ্ঠীকে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী বিপ্লবের আতংকও অনুসরণ করছে।

এসব দেশের কোনটিতেই জাতীয় অর্থনীতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও জনচেতনাতে সামন্ততন্ত্রের চিহ্নগুলোর একেবারে অবসান ঘটেনি। স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিশিষ্টতা, জাতপাত ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন যেগুলো সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক শাসনের ফল—একটা প্রাগ্রসর জাতীয়তাবাদী প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করছে।

এসব দেশের ক্ষমতাসীন জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীগুলো একটা স্বাধীন ও সমৃদ্ধিশালী শিল্প ও কৃষির মাধ্যমে একটা প্রগতিশালী জাতীয় অর্থনীতি ভারী শিল্প বিকাশের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু পূর্ববর্তী পুস্তকটির অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখিয়েছি যে বিশ্বধনতন্ত্রবাদের অবনতির যুগে পুঁজিবাদের ভিত্তিতে কোন উন্নতিশীল জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলা যায় না। এসব দেশের শিল্প ও কৃষির উৎপাদনশীল শক্তিগুলো একমাত্র সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে

স্বাধীনভাবে ও সমন্বয়পূর্ণ হয়েই বিকাশিত হতে পারে (নিয়ন্ত্রিত অথবা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সংগে এর পার্থক্য এখানে বুঝতে হবে) এরূপ অর্থনীতির ভিত্তি হবে উৎপাদনের সামাজিক মালিকানা ও জাতীয় পর্যায়ে কাঠামোগত পরিকল্পনা। এর অবশ্য পূরণীয় রাজনৈতিক শর্ত হল কায়েমী স্বার্থের হাত থেকে শ্রমজীবী মানুষের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর।

অর্ধোন্নত স্বাধীন দেশগুলোতে বিকাশের প্রবণতা

উল্লিখিত জাতিগুলো স্বাধীনতা পাওয়ার আগে বিদেশী কর্তৃত্বের অবসানের প্রচেষ্টায় দেখা গিয়েছিল বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর একটা জাতীয় সংঘবন্ধ জোট। এমন কি এই জাতীয় সংঘবন্ধ জোটের কাঠামোর মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামও ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার পর বিদ্যমান সমাজের শ্রেণীকাঠামো থেকে অপরিহার্যভাবে উদ্ভূত শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হলো। সময়ের সাথে যে বিদেশী প্রভুত্ব বিভিন্ন শ্রেণীকে একটা সাধারণ মোর্চায় তারই বিরুদ্ধে ঐক্যবন্ধ করেছিল তারও অবসান হলো। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অনুন্নত চরিত্রের দরুন জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর কোন অর্থনৈতিক ক্ষমতাও ছিল না জনগণের অসন্তোষকে চাপা দেওয়ার। অনগ্রসর স্বাধীন দেশগুলো একটা অসম্পূর্ণভাবে উন্নত ধনতন্ত্রবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক উদ্‌বর্তনের দোষগুলোতেও ভুগছে। ফলে, এই দেশগুলো তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য ছেদবাদী সংগ্রাম এই শ্রেণীসংগ্রামের শক্তিবৃদ্ধি করেছে।[৩]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক জগতে দুটি শক্তিজোটের সৃষ্টি হয় যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক জোট আর সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক জোট, যদিও অবশ্য সমাজতান্ত্রিক যুগোশ্লাভিয়া এই জোটের বাহিরে রয়েছে। যুদ্ধোত্তর কালে নতুন স্বাধীন দেশগুলো এই দুটি জোটের মাঝখানে থেকে উভয়ের কাছ থেকেই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সাহায্য সংগ্রহের কৌশল নিয়েছে। সে যাই হোক, যেহেতু ধনতান্ত্রিক শ্রেণী ক্ষমতায় আসীন বলে এ সব দেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে তার হাতে রয়েছে, যেহেতু তারা জনগণের অভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক সংঘটনকে ভয় করে। তারা চায় জনগণকে আরও শোষণ

৩. দ্রষ্টব্য: সামাজিক উত্তেজনা বিষয়ে য়ুনো ও ইউনেস্কোর বিবিধ প্রকাশনা ও অধ্যাপক ডব্লু. এম. বল, রুপার্ট ইমারসন, কাহিন প্রমুখদের রচনা।

করতে। অধিকন্তু সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক জোটের উপর সাহায্যের ব্যাপারে তাদের চূড়ান্ত অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার দরুণ তারা মৌলিক অর্থেই উল্লিখিত জোটের দিকেই ঝোঁকে। Professor D. R. Gadgil যেমন বলেছেন, 'সাম্প্রতিককালে অধিকাংশ অর্ধোন্নত অঞ্চল অতিউন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে রয়েছে। এদের মধ্যে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে না।"[৪]

নতুন স্বাধীন দেশগুলোর আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এ সব দেশে একটা স্থায়ী রাজনৈতিক ভারসাম্যহীনতা বিভিন্নমাত্রায় বিরাজ করছে। এর জন্য বেশ কয়েকটি কারণও খুঁজে পাওয়া যায়; যেমন, অনগ্রসর অর্থনীতি, জনগণের তুলনাহীন দারিদ্র্য আর এরই পরিণতিতে প্রায় দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক ও শ্রেণীসংঘাত। অন্যান্য কারণ হলো বিরাট প্রশাসনিক দুর্নীতি ও অদক্ষতা। অধিকন্তু রয়েছে বিভিন্ন স্তরে ব্যক্তিগত বা বেসরকারী মূলধন ও রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত দুর্নীতি যা পুরো নৈতিক আবহাওয়াটাকেই বিষাক্ত করে তুলেছে। এ সব দেশের পুঁজিবাদী শ্রেণীগুলো, তাদের শ্রেণীগত দুর্বলতার যুক্তিতেই নানা বিবেকবর্জিত পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকে উৎপাদন ক্ষেত্রে, ব্যবস্থাপনায়, লাইসেন্স সংগ্রহে, বাণিজ্যিক কার্যকলাপে, বাজেট প্রস্তুতিতে ও কর ফাঁকিতে আর এরা কালোবাজারী ও প্রতারণামূলক হিসাবরক্ষণ একটা জটিল কাঠামো বিশদভাবে তৈরী করে নেয়। এ সব অনগ্রসর দেশের বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী ও বিকশিত করতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিপুণভাবে সচেষ্ট থেকে ধনতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থার দুরভিসন্ধিপূর্ণ ও অপরিহার্য প্রক্রিয়াগুলোকে মার্জনা, ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্রাহ্য, এমন কি পরোক্ষভাবে অনুমোদন করে। শুধু তাই নয়। একদিকে ঐ শ্রেণী ও তার প্রতিযোগী অংশগুলোর মধ্যে আর অন্যদিকে প্রশাসনের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে (মন্ত্রি পরিষদের বিভিন্ন গোষ্ঠীও এর অন্তর্গত) একটা অদ্ভুত সংযোগ দেখা যায় যা এ সব দেশের সমগ্র রাষ্ট্রীয় সংগঠনটাকেই বিনষ্ট ও বিষাক্ত করে। তাছাড়া, যেহেতু ঐ পুঁজিবাদী শ্রেণী ও তারই পরিচালিত রাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক নীতি, রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও জনগণের সামাজিক, বৌদ্ধিক ও নান্দনিক সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ ও রূপদান করে, সেহেতু সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রই এর ফলে দূষিত হয়ে যায়।

৪. দ্রষ্টব্য: D. R. Gadgil, Economic Policy and Development, pp. 172-73.

যখন এই সব অবস্থার চাপে রাজনৈতিক ভারসাম্যহীনতা অতিমাত্রায় বেড়ে উঠে বিদ্যমান সমাজটাকেই খণ্ড খণ্ড করে ফেলার ভয় দেখায়, কিংবা তার বৈপ্লবিক উৎপাটনের আহ্বান জানায় তখন শাসক গোষ্ঠী তার গণতান্ত্রিক মুখোসটা খুলে ফেলে, শ্রেণীশাসনের গণতান্ত্রিক রীতি পরিবর্জন করে আর প্রতিষ্ঠা করে নগ্ন সামরিক শ্রেণী স্বৈরতন্ত্র। বুর্জোয়া শ্রেণী শাসিত অধিকাংশ দেশের ঐতিহাসিক ঝোঁকটাই উল্লিখিত রূপান্তরের দিকেই রয়েছে (পাকিস্থান, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি)।[৫]

সমাজতান্ত্রিক জোটের উদ্ভব

যুদ্ধোত্তর কালে বিদ্যমান ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ধনতান্ত্রিক রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা যুগোশ্লাভিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো ও চীন হতেও অপসৃত হয়েছে। যুগোশ্লাভিয়া ও চীন ছাড়া ১৯১৮ সালের রাশিয়ার মত অভ্যন্তরীণ প্রলেতারীয় বিপ্লবের দ্বারা এ রূপান্তর সংঘটিত হয় নি। এ রূপান্তর ঘটেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা, বিশেষভাবে তার লাল ফৌজের দ্বারা যে লাল ফৌজ নাৎসি জার্মানীর বিরুদ্ধে বিজয় সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে এসব দেশ অধিকার করে নিয়েছিল। এ সব দেশে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজ নিজ জাতীয় কম্যুনিষ্ট দলকে নেতৃত্বে রেখে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে। এরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক ও রাজনৈতিক সমর্থন নিয়ে দেশে ধনতন্ত্রবাদ ও জমিদারতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে বিভিন্ন প্রকার সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি প্রথার প্রচলন করে।

এইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সামরিক আমলাতান্ত্রিক উপায়ে উল্লিখিত দেশগুলোর সমাজব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক রূপান্তরসাধন করে ও জাতীয় কম্যুনিষ্ট দলগুলোর নেতৃত্বে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর জন্ম দেয়।

এইভাবে উদ্ভূত হওয়ার দরুণ এই সব কম্যুনিষ্ট শাসন ব্যবস্থা অপরিহার্যভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবে এসে পড়ে আর তাদের অর্থনীতি ও পররাষ্ট্রনীতিগুলোও অনেকখানি সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির সম্পূরক হয়ে পড়ে। সংক্ষেপে, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুগামী হয়ে পড়ে।

উল্লিখিত ঘটনার তুলনায় যুগোশ্লাভিয়া ও চীনে ধনতান্ত্রিক শাসনের উৎখাত

৫. বল, কাহিন প্রমুখদের রচনা দ্রষ্টব্য।

ও নয়া সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিব্যবস্থার সৃষ্টি হয় ঐ দুটি দেশের নিজ নিজ কম্যুনিষ্ট দলগুলোর নেতৃত্বে অভ্যন্তরীণ গণ-বিপ্লবের মাধ্যমে। ফলে, এ সব নয়া কম্যুনিষ্ট শাসনব্যবস্থা মস্কোর কর্তৃত্বমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি অনুসরণে রত।

এর তাৎপর্য

এ সব দেশে ধনতন্ত্রবাদের উচ্ছেদের পরিণতিতে যুদ্ধোত্তর কালে বিশ্ব ধনতন্ত্রবাদ সমাজতন্ত্রের কাছে নতুন নতুন অঞ্চল হারিয়ে বসে। নয়া সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি ব্যবস্থার দরুণ এদের জাতীয় অর্থনীতি দ্রুত উন্নতিলাভ করতে পেরেছে, যার প্রতিফলন ঘটেছে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির বিস্ময়কর বৃদ্ধিতে।

Prof. Gadgil যেমন বলেছেন, "কম্যুনিষ্ট জোটের দেশগুলোর অন্তর্গত অর্ধোন্নত অঞ্চলগুলোতেই সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে বেশি বিকাশ ঘটেছে।"[৬]

ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার মধ্যেকার শক্তির ভারসাম্য দ্বিতীয়টির অনুকূলেই অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে আর তার ফলে ক্ষীয়মান পুঁজিবাদ আর প্রাগ্রসর সমাজতন্ত্রের মধ্যে তীব্রতর সংঘাতের সূচনা হচ্ছে। এটা মানবজাতির তৃতীয় মহাযুদ্ধের আতংককেই প্রকাশ করছে।

আমলাতান্ত্রিক বিকৃতি

অবশ্য একটা আমলাতান্ত্রিক বিকৃতিতে ভুগছে এ সব সমাজতান্ত্রিক দেশ। এরা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় যা গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী দেশগুলোতে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের তুলনায় উচ্চতর বলে মনে করা হত। ক্রুশ্চভ, মিকোয়ান প্রমুখ খ্যাতিমান নেতাদের স্বীকৃতিতেই প্রকাশ পেয়েছে যে স্টালিন যুগে বহু দশক ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলোতে আমলাতান্ত্রিক সন্ত্রাস ছিল অবাধ যার জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা নিদয়ভাবে দমিত হত[৭] আর জনগণের বিরাট অংশ গুলিবিদ্ধ ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হত।

অধিকন্তু, সমাজতান্ত্রিক জোটের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সদস্য সোভিয়েত ইউ-

৬. Prof. D. R. Gadgil-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৭৩।

৭. C.P.S Unionএর Congress-এ প্রদত্ত ভাষণ দ্রষ্টব্য।

নিয়ন অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর উপর প্রভুত্ব করে যাচ্ছে এবং স্বাধীন কম্যুনিষ্ট যুগোশ্লাভিয়াকে তার নিজের কর্তৃত্বে আনার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছে।

যুগোশ্লাভিয়া ও চীন সহ বিশেষ বিশেষ কম্যুনিষ্ট দেশগুলোর শাসন-ব্যবস্থাগুলো সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—তারা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক অধিকারের অস্বীকৃতির উপর। Djilas-এর মত সুবিখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতার মত-পার্থক্যের দরুন কারারুদ্ধ হওয়া বেশ বড় করেই দেখিয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র যুগোশ্লাভিয়াতেও অনুপস্থিত। চীনে "শত পুষ্পের' ভাগ্য এরই বাস্তবতাকে প্রকাশ করে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে প্রধান প্রধান উত্তেজনা

তাই এমন কি সমাজতান্ত্রিক জোটও একটা সমন্বয়পূর্ণ সত্তা নয়; বরং এ জোটও ভুগছে গভীর বৈপরীত্য ও সংঘাত থেকে। প্রধান প্রধান সংঘাতগুলো নিম্নরূপ :

(১) প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশের জনগণ ও আমলাতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও তার থেকে উদ্ভূত সংঘাত গণঅসন্তোষের রূপ নিয়েছে যার ফলে জনগণের উপর আমলাতান্ত্রিক নিপীড়নের ক্ষেত্রে সোভিয়েত নেতৃত্ব কিছুটা নমনীয়তা দেখাতে বাধ্য হয়েছে। আবার এই অসন্তোষই ফেটে পড়েছে পোল্যাণ্ডের Poznan বিদ্রোহে, পূর্ব জার্মানীর শ্রমিক বিদ্রোহে আর বীরত্বপূর্ণ হাংগেরীয় বিপ্লবে।

(২) দ্বিতীয়টি হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার প্রভাবিত অনুগামী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও তারই পরিণতিতে সংঘাত। সদ্য উল্লিখিত পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলোর সব কটা বিদ্রোহই শুধু অভ্যন্তরীণ আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাগুলোর বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয় নি, হয়েছে সোভিয়েতইউনিয়নেরও বিরুদ্ধে, যে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের শাসনযন্ত্রগুলোকে লালনপালন করতো আর জনগণ তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতো। সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে ঐ সব দেশের জনগণ জাতীয় নিপীড়নের চাপ অনুভব করছে।

(৩) তৃতীয়তঃ, সোভিয়েত জোটবদ্ধ দেশগুলো ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও তার ফলে উদ্ভূত সংঘাত প্রকাশ পেয়েছে প্রায় অব্যাহত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমন কি সামরিক (সীমান্তবর্তী নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে) চাপের মাধ্যমে। যুগোশ্লাভিয়ার উপর এ চাপ এসেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে উল্লিখিত অনুগামী দেশগুলোর দিক থেকে। এ চাপের উদ্দেশ্য হলো স্বাধীন কম্যুনিষ্ট যুগো-

শ্লাভিয়াকে সোভিয়েত জোটে যোগদানে বাধ্য করা আর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া।

চীনের অনুপম বৈশিষ্ট্য

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতে চীন এক অদ্বিতীয় স্থান নিয়ে আছে। চীনের কম্যুনিষ্ট দল সোভিয়েত ইউনিয়নের লাল ফৌজের সাহায্য ছাড়াই চীনা জনগণের বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। তাই চীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীন নয় (যদিও তার সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত) আর নিজের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিসমূহ স্বাধীনভাবে অনুসরণ করে। চীন এত বড় ও শক্তিশালী দেশ যে যুগোশ্লাভিয়ার প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের পীড়নমূলক পদ্ধতি চীনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে পারে নি, পারে নি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে চীনের স্বাধীন উদ্দেশ্য গ্রহণের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে।

চীনের কম্যুনিষ্ট শাসনতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যারা কম্যুনিষ্ট তাদের মতামতকে চেপে যাওয়ার আমলাতান্ত্রিক নিয়মে সে দেশে কাজ হচ্ছে। এই কম্যুনিষ্টরাই চীনে কম্যুনিষ্ট সমাজ গঠন অথবা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও নীতির সুপারিশ করে। সব কম্যুনিষ্ট দেশেই আমলাতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী দাবী করেছে যে তারাই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শের অভ্রান্ত ব্যাখ্যাকর্তা। সোভিয়েত ইউনিয়নে স্টালিনের মৃত্যুর পরও চলেছে বিরোধীদের বিশোধন। বেরিয়া, ম্যালেনকভ, বুলগানিন, কাগানোভিচ, প্রমুখদের ভাগ্য সে কথাই বলে।

তবে সমাজতান্ত্রিক জোটের দেশগুলোতে এই সব আমলাতান্ত্রিক বিকৃতি ও তার ফলে উদ্ভূত সংঘাত সত্ত্বেও তারা বিরাটভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করেছে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর তুলনায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর (যতই বিকৃতভাবে তারা কার্যকরী হোক না কেন উৎকর্ষই তা বিশেষভাবে প্রমাণ করেছে। কয়েক দশকের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিস্ময়কর ভাবে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করেছে,—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তার বিরাট ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও।

সোভিয়েত জোটে ভবিষ্যৎ প্রবণতা

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেজ বিপুআর্থ -সামাজিক প্রগতি, পরাধীন জাতিগুলোর

জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের আরও অগ্রগতি ও চীনে ঐতিহাসিক বিপ্লবের সাফল্যের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের জনগণ তাদের আমলাতান্ত্রিক শাসনের হাত থেকে মুক্তির জন্য এক অদম্য আগ্রহ দেখাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিক বিকৃতির শৃংখলমুক্ত উৎপাদী শক্তিগুলোর আরও স্বাভাবিক বিকাশের জন্য এ সব দেশের জাতিগুলোর বৃহত্তর সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বাইরে কম্যুনিষ্ট দলগুলোর কাজ

একথা অবশ্যই বলতে হবে যে অকম্যুনিষ্ট দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর কম্যুনিষ্ট দলগুলো রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত নেতৃত্বের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট দলের (এখন মাঝে মাঝে চীনের কম্যুনিষ্ট দলেরও) দিকে তাকিয়ে আছে। সাধারণভাবে সোভিয়েত সরকারেরর চলতি বৈদেশিক নীতির জরুরী প্রয়োজনের সংগে সংগতি রেখেই তারা তাদের নীতি নির্ধারণ করে। যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতির অংগীভূত রাজনৈতিক কৌশল তার পক্ষাবলম্বী বিশেষ দেশের বুর্জোয়াদের প্রভাবিত করতে চায় তখন ঐ সব কম্যুনিষ্ট দেশের দলগুলোও শ্রেণী-সহযোগী গতিপথ অনুসরণ করতে চায়। তারা তাদের নীতি ও কার্যক্রম তাদের দেশে বিদ্যমান বস্তুনিষ্ঠ অবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা থেকে তৈরী করে না।

সাধারণভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশ নীতি সে দেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কম্যুনিষ্ট দলের ধারণামত দেশের প্রতিরক্ষার স্বার্থে আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংগ্রামের অধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

সমকালীন বিশ্বচিত্র

সমকালীন বিশ্বসমাজের আন্দোলন বেশ কয়েকটি বৈপরীত্য ও তার অনুবর্তী সংঘাতের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিণতি। সংঘাতগুলো হলো ধনতান্ত্রিক জগৎ ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার মধ্যে; ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে পুঁজিবাদী শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীগুলোর মধ্যে; সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও ঔপনিবেশিক জনগণের মধ্যে; আমলাতান্ত্রিক শাসন ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত বিভিন্ন সমাজ-তান্ত্রিক দেশের জনগণের মধ্যে। সংঘাত আরও রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর

নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে পরস্পরকে বিতাড়িত করার ; রয়েছে অগ্রসর দেশগুলোতে খেটে খাওয়া মানুষ, সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী ও পুঁজিবাদী শ্রেণীর মধ্যে, আর রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো এবং যুগোশ্লাভিয়া ও অন্যান্য দেশের মধ্যে।

আজকের দুনিয়ার বৈশিষ্ট্য হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পুঁজিবাদী জগৎ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বৈরিতা। ঐ বৈরিতা গুণগতভাবে পৃথক দুটি সমাজব্যবস্থার পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক—মধ্যেকার সংঘাতের প্রতিচ্ছবি। দুটি জোটে আজকের বিশ্বসমাজ বিভক্ত।

পুঁজিবাদী বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে দুর্বল ও অনগ্রসর বিভিন্ন জাতি। প্রতিটি জোটই তাই সচেষ্ট এ সব দায়বন্ধহীন জাতিগুলোকে নিজের দিকে টেনে আনতে।

বিশ্বপুঁজিবাদ ঐতিহাসিকভাবে সেকেলে আর ক্রমবর্ধমান সংকটে আবদ্ধ। এর টিঁকে থাকার প্রধান শর্ত, যেমন, লাভজনক বাজার ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর বিশাল এলাকা সমাজতন্ত্রের জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধোত্তরকালে তা হারিয়েছে। পুঁজিবাদের মধ্যে রয়েছে অবিচ্ছিন্ন প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা ক্রমবর্ধমান উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য বাজার, বিকাশশীল শিল্পগুলোর স্বার্থে বিশাল পরিমাণ কাঁচামাল ও উদ্বৃত্ত পুঁজির বিনিয়োগের জন্য বিস্তৃততর অঞ্চল)। এমন কি সবচেয়ে শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধোত্তরকালে কয়েকটি কৌশলের আশ্রয়ে নিজের স্থায়িত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। এগুলো হলো রণসজ্জায় তার উৎপাদন ক্ষমতার একটা বিরাট অংশকে সরিয়ে আনা, অন্যান্য দেশগুলোতে বিশাল পরিমাণ আর্থিক ও সামরিক সাহায্য (তার উদ্বৃত্ত পুঁজির নির্গমণের স্বার্থে), কৃষিজ উৎপাদন হ্রাস প্রভৃতি। উন্নত দেশগুলোতে পুঁজিবাদ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে তার উৎপাদী শক্তিগুলোর বিস্ময়কর বিকাশের দরুন। বিশ্বপুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ভূখন্ড আরও সংকুচিত হয়ে আসছে।

যতই বিশ্বপুঁজিবাদের ভরাডুবি হচ্ছে ততই সমাজতান্ত্রিক জগতের দেশগুলো তাদের রাজনৈতিক উপরিকাঠামোতে নানা আমলাতান্ত্রিক দোষ সত্ত্বেও প্রভূত অর্থনৈতিক বিকাশ করছে। মৌলিক অর্থে এটা এর নয়া অর্থনৈতিক ভিত্তির জন্য; যেটা হলো উৎপাদনের সামাজিক মালিকানা—প্রগতি বিকৃতকারী আমলাতান্ত্রিক শাসন নয়। উৎপাদনের সামাজিক মালিকানাই সর্বজননী ও কাঠামোগত পরিকল্পনাকে সম্ভব করে তোলে।

গ

রাষ্ট্রসংঘ (য়ুনো) ঃ তার ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিশ্বসমাজব্যবস্থার বৈরিতাকে অতিক্রম কিংবা নমনীয় করতে বৃহৎ প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের ধারণা ও সৃষ্টিই হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে, হয়েছিল আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সব সংঘাতের অবসান ঘটাতে। সংঘাত দূরীকরণে বিরোধের মধ্যস্থতা ও রাষ্ট্রসংঘের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য ও অন্যান্যদের সিদ্ধান্তপ্রসূত নৈতিক চাপসৃষ্টির কথাও ভাবা হয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক জগতের সব দ্বন্দ্বের মীমাংসায় শান্তিপূর্ণ উপায় ও একটা বিশ্বসংস্থার সংগঠিত নৈতিক 'কর্তৃত্বের পদ্ধতি চায়। তথাপি, আজকের দুনিয়ায় বৈরিতা রয়েছেই, বরং তার প্রকোপ বাড়ছে। আজও প্রায়শ চলছে স্থানীয় যুদ্ধ ও অন্যান্য ধরণের সংঘাত।

সমালোচকরা বিশ্বসভার গঠনতন্ত্র ও কার্যধারায় বেশ কয়েকটি ফাঁকের কথা বলছেন। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে বৃহৎ শক্তিবর্গ ভেটোর মত অগণতান্ত্রিক ক্ষমতার দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তগুলোকে নষ্ট করে যখনই তাদের আসল স্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়ে। সমালোচকরা বলেছেন যদি না রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্তগুলোর পিছনে থাকে শারীরিক বলবৎকরণ, তাহলে যে জাতির বিরুদ্ধে প্রতিকূল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার তা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কোন নিশ্চয়তা থাকে না। এ মতের সমর্থনে কয়েকটি দৃষ্টান্তও তাঁরা দিয়েছেন।

বাস্তবে, রাষ্ট্রসংঘ আজ পর্যন্ত পরস্পর বিরোধী সামাজিক শক্তিবর্গের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে যেগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো মৌলিক সংঘাতময় স্বার্থ, যেমন পুঁজিবাদী দেশ ও কম্যুনিস্ট দেশ শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ ও দুর্বল পুঁজিবাদী

দেশ, একটা অনগ্রসর দেশ ও আর একটা অনগ্রসর দেশ যথা, ভারত বনাম পাকিস্থান, মিশর বনাম ইস্রায়েল প্রভৃতি)।

সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রগুলোকে তাদের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়েও রাষ্ট্রসংঘকে অতি-জাতীয় সার্বভৌম সংস্থা হিসেবে স্বীকার করতে রাজী করানো একটা অবাস্তব স্বপ্নের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। গৌণ প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে তারা নীতিগত রাজনৈতিক চাপে রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্তে নতিস্বীকার করলেও গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের বেলায় বিশ্বসংস্থাটির সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়নে তারা ক্বচিৎ এগিয়ে আসে।

অধিকন্তু, বিমূর্ত নৈতিক অথবা গণতান্ত্রিক মান নয় বরং স্বার্থই রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত সদস্যরাষ্ট্রদের আচরণকে সাধারণত নিয়ন্ত্রিত করে। বাস্তবে, রাষ্ট্রসংঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক জগৎ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন কম্যুনিস্ট দেশগুলোর মধ্যে প্রধানতঃ একটা মল্লভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া পৃথিবীর অসংখ্য ছোটখাটো দেশ যে কোন একটি জোটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে।

ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ও ঔপনিবেশিক জনগণ আর সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে মৌলিক অর্থেই সংঘাত রয়েছে। এই বাস্তব ব্যাপারটাই আজ পর্যন্ত সংঘাত পরিহার ও শান্তিস্থাপনের যথোপযুক্ত প্রচেষ্টাগুলোকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শনকারী বিস্ফোরক বস্তুগুলো স্থান পরিবর্তন করছে মাত্র ঃ গতকালের কোরিয়া, ভিয়েতনাম অথবা সুয়েজের স্থান নিয়েছে বার্লিন, ইরাক কিংবা লাডাক। কোন বিশেষ মুহূর্তে বেশ কিছু দেশ অশান্তির বজ্রমুষ্ঠিতে আবদ্ধ।

আর ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক জগৎ উভয়েরই রয়েছে নিজ নিজ উত্তেজনা ও সংগ্রামের বৈচিত্র্য।

ন্যাটো, সিয়াটো ও অন্যান্য শক্তি সম্মিলন

রাষ্ট্রসংঘ ছাড়াও, যার অন্ততঃ একটা বিশ্বসংস্থার চরিত্র রয়েছে, বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক ও সামরিক রাষ্ট্র-সম্মিলনের উৎপত্তি ঘটেছে। এরা হলো ন্যাটো, ওয়ারস চুক্তি, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ, বাগদাদ চুক্তি, বান্দুং সম্মেলন, আফ্রো-এশিয়া জোট

প্রভৃতি। এরা সম্মিলনকারী রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থরক্ষা করছে। এসব সম্মিলনের একটা বৈশিষ্ট্য হলো কখনও কখনও সাম্রাজ্যবাদী জোটের সদস্য হয়েও হয়ত কোন রাষ্ট্র একই সাথে ভিন্ন আর এক সম্মিলনেরও সঙ্গে সংযোগ রেখেছে—যে সম্মিলনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভুত্বাধীন পরাধীন কোন জাতি রয়ে গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য যে কমনওয়েলথে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন অথচ একই সময়ে ভারত আফ্রো-এশিয় জোটের বান্দুং সম্মেলনেরও সদস্য। এর কারণ হলো এই যে জাতিগুলোর স্বার্থ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রণনীতি-বিষয়ক প্রভৃতি) সমরূপ নয়, বরং ভিন্নধর্মী আর সেগুলো যেমন তাৎক্ষণিক তেমনি মৌলিক। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর উপর দুর্বল দেশগুলোর আর্থিক আর কখনও কখনও সামরিক নির্ভরশীলতার দরুন অংশতঃ এই বৈপরীত্যমূলক ঘটনার ব্যাখ্যা মেলে। ধনতান্ত্রিক জগতে রয়েছে তার অর্থনীতির প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রকৃতির কারণেই অন্তর্দ্বন্দ্ব, আর সেই জন্যই তাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের সাধারণ বিপদের বিরুদ্ধে তাদের সংঘবদ্ধতার প্রবণতা সর্বদা দেখা যাবেই। আবার, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের মধ্যে নিরন্তর সংঘাত থাকবে। ধন-তন্ত্রবাদের জৈবসত্তার আংশিক নিয়মই হলো আত্মবিস্তার। তাই দেখা মেলে নানা সংযুক্তিকরণ ও বিন্যাসের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর বিভিন্ন সম্মিলন।

এসব সম্মিলনের কয়েকটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সাম্রাজ্যবাদের দিক থেকে ন্যাটো, সিয়াটো ও বাগদাদ চুক্তি আর সোভিয়েত ইউ-নিয়নের দিক থেকে ওয়ারস চুক্তি ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে সম্ভাব্য সংঘর্ষের প্রতিরোধে আগাম প্রস্তুতি হিসেবেই রচিত হয়েছে।

সমকালীন পৃথিবীর সমাজব্যবস্থাকে বিদীর্ণকারী নানা সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানে আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাস্তবে সংঘাতের প্রকোপই বেড়েছে মাত্র। পর্যায়-ক্রমে আঞ্চলিক ভিত্তিতে (মধ্যপ্রাচ্য, চীনের মূল ভূখন্ড ও ফরমোজা, লাতিন, আমেরিকার দেশগলো, আফ্রিকার কিছু অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, এমন কি ইয়ো-রোপেও) অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে—বিশ্বব্যাপী সর্বনাশা পারমাণবিক ফুগ্ধরণবিস্ফোরণের আশংকা যেন ধূমায়িত হয় তাতে।

ভবিষ্যৎ পরিপ্রেক্ষিত

বিশ্বের ধনতান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবেই অচল হয়ে পড়েছে।

এটা প্রকাশ পেয়েছে বেশ কয়েকটি দেশের সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের সামাজিক উদ্দেশ্য ঘোষণার মধ্য দিয়ে। এটা বড় কথা নয় যে সমাজতন্ত্র বিষয়ে ঐ দেশগুলোর রয়েছে একটা বিভ্রান্তিকর ধারণা কিংবা রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রবাদকেই তারা সমাজতন্ত্র বলে মনে করে। ক্রমবর্ধমানহারে বেশ কিছু দেশের সরকারের ধনতান্ত্রিক আত্মপরিচয়ে অস্বীকৃতির বাস্তব ঘটনাটাই সবচেয়েবড় স্বীকৃতি যে একটা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে ধনতন্ত্রবাদ ঐতিহাসিকভাবেই সেকেলে হয়ে গিয়েছে।

উৎপাদনের সামাজিক মালিকানার অর্থনৈতিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজগুলোর আমলাতান্ত্রিক বিকৃতি সমাজতন্ত্রের কাছে বেমানান। আমলাতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে এসব দেশের জনগণের সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী আর তা সুরু হয়েও গেছে। অবশ্য, ঐ দেশগুলোতে কিছুটা বিকৃতি নিয়েই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় উচ্চতর এক নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্ভবও হয়েছে।

যেহেতু আধুনিক মানব সমাজের বিরাট উৎপাদী শক্তিগুলো ধনতান্ত্রিক আর্থিক সম্পর্কের সঙ্গে সংঘর্ষের পরিণতিতে এসেছে আর তাদের রয়েছে একটা বিশ্বচরিত্র আর সেই কারণেই জাতীয় সীমানার মধ্যেও রয়েছে সংঘাত, সেহেতু সমাজতান্ত্রিক সমাজ সমগ্র মানবজাতিকে নিয়ে পৃথিবীব্যাপী গঠিত হতে পারে ও তা হবেও। এই চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের পথটাকে খুব বিশদভাবে দৃষ্টিগোচরে রাখা কঠিন।

এই রকমই হলো বিশ্বপরিস্থিতির ছবিটা আর তার বিকাশের নির্দেশও রয়েছে নানা সর্পিল ও অদৃষ্টপূর্ব আবর্তের মধ্যে।

দ্বিতীয় অংশ

যুদ্ধকালীন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ

ক

আমাদের পূর্বাভাষ

আমরা এখন যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে ভারতীয়দের হাতে ব্রিটিশদের দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত এ দেশে জাতীয়তাবাদের বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এ পর্যায়ে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য কেননা এ সময়টা পূর্ণ নানা ঘটনায় যেগুলো শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দের স্বাধীনতা অর্জনে রূপান্তরিত হয়। এটা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল নানা ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জটিল কূটনৈতিক দরকষাকষির পরিণতি।

"Social Background of Indian Nationalism"-এর ("ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি") উপসংহারে আমরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এই পর্যায় সম্পর্কে আভাস দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এ আভাসের ভিত্তি ছিল প্রধান প্রধান কতকগুলো মৌলিক নীতি যেগুলো আলোচ্য বিষয়ের বিশ্লেষণকে নির্দেশিত করেছে। আমাদের বক্তব্য ছিল—

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তি খুবই বেড়েছে। এই পর্যায়ের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক গোষ্ঠীর রয়েছে গভীর অভিজ্ঞতা ও যথেষ্ট উৎকর্ষসম্পন্ন রাজনৈতিক ও কৌশলগত দক্ষতা। পক্ষান্তরে ভারতীয় সমাজের সদ্যজাগ্রত নিম্নবর্তী স্তরগুলো সাংস্কৃতিকভাবে পশ্চাদ্‌পদ, সাংগঠনিকভাবে দুর্বল ও রাজনৈতিক দিক থেকে বুর্জোয়াশ্রেণীর তুলনায় কম চেতনাবিশিষ্ট। তাছাড়া, এদের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতা কম। এটাই খুব স্বাভাবিক যে পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পুঁজিপতিশ্রেণীরই আধিপত্য থাকবে আর তা এই শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল হবে।

"পুঁজিপতিশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন এবং তারই স্বার্থে পরিচালিত ভারতীয় ইতিহাসের ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ের ঘটনাবলী কোন্ দিকে যাবে তা মোটামুটি আন্দাজ করা যায়।

"এই হিসাবে এর একটা লক্ষণ হলো যে পরিবর্তিত ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একদিকে সুবিধা প্রদান ও অন্যদিকে উচ্চচাপের নীতি ব্যাপকতরভাবে প্রয়োগ করবে। এর সমর্থনে সে কায়েমী স্বার্থপরায়ণদের বর্ধিত অংশগুলোকে দলে টানবার চেষ্টা করবে আর নিজের সুবিধার্থে তাদের মধ্যে আরও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ প্রশস্ত করবে। এর পরিণতিতে এইসব গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্রতর অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম দেখা দেবে আর বৃদ্ধি পাবে সাম্প্রদায়িকতা ও আন্তঃপ্রাদেশিক বৈরিতা।

"দ্বিতীয়তঃ, কায়েমী স্বার্থপরায়ণ গোষ্ঠীগুলোর নেতারা সমাজের নিম্নতর পর্যায়ে সংগঠিত গণ আন্দোলনগুলোর বিরোধিতা করবে অথবা সেগুলোকে বিকৃত করবে; আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অথবা নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী অংশগুলোর কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায়ে সেগুলোকে পরিচালিত করবে।

"মনে হয় ভারতের ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে নিয়মতান্ত্রিকতা, তীব্রতর সাম্প্রদায়িকতা, ক্রমবর্ধমান আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও কায়েমী স্বার্থপরায়ণ গোষ্ঠীভুক্ত নেতৃবৃন্দ কর্তৃক গণ আন্দোলনগুলোর বিরোধিতা কিংবা বিকৃতি।"

পরবর্তীকালের নানা ঘটনা মূলতঃ আমাদের উল্লিখিত ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণীকে সন্তোষজনকভাবে সমর্থন করেছে। এটা আমাদের এই মতটাকে আরও সমর্থন করে যে সামাজিক ঘটনাবলীর যথার্থ বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও আভাসপ্রদানে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতি সবচেয়ে ফলপ্রদ দৃষ্টিভংগী।

এখন আমরা সংক্ষেপে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিকাশ সম্পর্কে বলবো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইতিহাসের বেগমাত্রা নজিরবিহীনভাবে বৃদ্ধি পায়। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম আরও নানাভাবে চরম আকার নেয় ও উৎকর্ষ লাভ করে।

নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অক্ষশক্তিবর্গের সাথে এক মারাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, পুরাতন সমভাবনীতি, সুবিধা ও নিগ্রহের এক নয়া রূপের উপর প্রতিষ্ঠিত এক নতুন রাজনৈতিক কৌশলের বিবর্তন ঘটায়। উদ্দেশ্য ছিল সেই একই ভারতের উপর তার প্রভুত্বকে চিরস্থায়ী করা।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান রূপকার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে, স্বভাবতই ব্রিটেনের চরম সংকটকালীন অবস্থায় সবচেয়ে বড় সুবিধা আদায়ে সিদ্ধান্ত নেয়। আলাপ-আলোচনা ও দর কষাকষির প্রধান কৌশলটাকে সে আরও দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়িত করলো যার পিছনে থাকবে গণআন্দোলনের চাপ অথবা তার ভীতি। এটাই বরাবর হয়েছে তার উৎকৃষ্ট কৌশল যা সেই বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণও হয়েছে। এ কৌশলের নীতি ছিল দেশের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী অসন্তোষকে একটা গণআন্দোলনের আকারে রূপান্তর ঘটানো যা অবশ্য বৈপ্লবিক স্তরে যাবে না অথচ তবু বেশ বড় দরের সুবিধা আদায় ও ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করার ব্যাপারে চাপ বজায় রাখতে পারবে। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী পুরোপুরি বুঝেছিল যে একটা বৈপ্লবিক গণ আন্দোলন শধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসানই ঘটাবে না, ভারতীয় ভূ-সম্পত্তির অধিকারী শ্রেণীগুলোরও বিলুপ্তির সূচনা করবে। •

মুসলিম সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক শ্রেণীগুলোর দল মুসলীম লীগ স্বাধীন পাকিস্থান রাষ্ট্রের সৃষ্টিকে (ভারতের মুসলীম অধ্যুষিত অংশগুলোকে নিয়ে) তার একমাত্র লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে। এ ব্যাপারে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কথা এই দল জানতো বলে কংগ্রেসের সংগে দরকষাকষি ও দেশে সাম্প্রদায়িক গোলমালের ভয় এমন কি তাতে অংশ নিয়েও চাপ সৃষ্টি করেছিল। এ পদ্ধতিটাকে তারা আরও জোরদার করলো ব্রিটেনের নিজের উদ্দেশ্যে আবিষ্কৃত সমভারনীতির সুবিধাটির সদ্ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে যখন গণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে যুদ্ধ চলছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনও ছিল বাইরে, তখন ভারতের সাম্যবাদী দল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-আন্দোলন ও সংগ্রামকে বিকশিত ও নেতৃত্বদানের নীতি অনুসরণ করছিল। কিন্তু নাৎসী জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করলে আর ব্রিটেন ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হলে ভারতের সাম্যবাসী দল (কম্যুনিস্ট পার্টি) আকস্মিক মত পালটে ঐ যুদ্ধকে জনগণের যুদ্ধ বলে গৌরবান্বিত করলো ও ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সকলপ্রকার সংগ্রামের বিরোধিতা করলো। জাতীয়তাবাদী গণ অভ্যুত্থান থেকে বিরত থেকে, এমন কি তার বিরুদ্ধাচরণ করে

কম্যুনিস্ট দল জাতীয়তাবাদী মুক্তি সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলো আর আন্দোলনের নেতৃত্ব ছেড়ে দিল আপোষকারী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক মুসলীম লীগের হাতে।

কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল কংগ্রেসের কৌশলকে আরও আমূল সংস্কারবাদী দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে আর ১৯৪২ সালের পর এই কৌশলটাকে গণ আন্দোলনের বিকাশ ঘটিয়ে বাস্তবায়িত করতে চায়। তবে এদের কার্যাবলী খুব বীরোচিত হলেও গভীর রাজনৈতিক দৃষ্টির দ্বারা সেগুলো প্রবুদ্ধ হয় নি কিংবা গণ আন্দোলনের সঠিক কৌশলের দ্বারা পরিচালিত হয় নি।

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে এসেছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম মুদ্রাস্ফীতি, বিশৃংখলা আর দুর্ভিক্ষ।" যখন ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ভোগ্যদ্রব্যাদির চরম দুষ্প্রাপ্যতা ও যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য বর্ধিত চাহিদার সুযোগ নিয়ে বিরাট লাভ করতে থাকে আর তা করতে থাকে অমানবিক আপৎকালীন মুনাফা অর্জন ও কালোবাজারীর মাধ্যমে, তখন ভারতের সাধারণ মানুষ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অসহনীয় দুর্দশা ভোগ করতে থাকে। ফলে বাড়তে থাকে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষের প্রকোপ আর শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের শ্রেণীসংগ্রাম যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়গুলোতে ও যুদ্ধের ঠিক পরেই সেই সময়কার নিয়মিত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। পুলিশ, সশস্ত্রবাহিনী ও অন্যান্য কৃত্যকে 'অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে একটা বিস্ফোরক বৈপ্লবিক অবস্থা সৃষ্টি করে। সংগ্রাম ও আলাপ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হোক না কেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস,, মুসলীম লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি সুবিধা আদায়ে নিজ নিজ পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

খ

অর্থনৈতিক বিকাশ

ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বুবর্ণ স্বুযোগ

যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর ভারতের সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়ে আমরা এবার ইংগিত রাখবো যা ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান ও নিজ নিজ আন্দোলনে নানা পরিবর্তন নিয়ে আসে।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে ভারতের জাতীয় অর্থনীতি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদী অর্থনীতির অধীন ঔপনিবেশিক অংশ। ব্রিটেন তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতির দ্বারা ভারতের স্বাধীন ও দ্রুত শিল্পায়নে বাধা দিয়েছিল। বিশেষ করে সে ভারতের ভারী শিল্পবিকাশে অনুমোদন দিত না যা কোন্ দেশের দ্রুত শিল্পায়ন ও একটা স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতির প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ব্রিটেন ও অন্যান্য উন্নত শিল্পপ্রধান দেশগুলোর জাতীয় অর্থনীতি যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে সম্পূর্ণ নিয়োজিত হয়। এটা ভারতের শিল্পপতিদের ভারতের বাজার দখল ও শিল্পবিস্তারে বিরাট সুযোগ এনে দেয়।

"নিম্নবর্ণিত সারণী সূচক সংখ্যানুসারে যুদ্ধকালে বিভিন্ন শিল্পের বিকাশকে নির্দেশ করে—"[১]

১৯৩৭ = ১০০

	সুতীবস্ত্র	পাট	ইস্পাত	রাসায়নিক	শর্করা	সিমেণ্ট	কাগজ	সাধারণ দ্রব্য
১৯৩৮	১০৯.০	৯৮.৩	১০৮০	৮৪.৪	৪৪.৭	১২৪.৮	১২১.৬	১০৫ ৪

১. দ্রষ্টব্য: Prof. P. A Wadia & Prof. K. T. Merchant: Our Economic Problems (5th ed.), পৃ: ৪৩৩

	সুতিকল	পাট	ইস্পাত	রাসায়নিক দ্রব্য	শর্করা	সিমেন্ট	কাগজ	সাধারণ
১৯৩৯	১০৪.৩	৯২.৪	১২৫.০	১০৩.৯	৬২.৫	১৫২.৯	১৩৫.১	১০২.৭
১৯৪০	১০৩ ৬	৯৬.১	১২৫.৫	১৩৩ ৩	১০৬.০	১৫২.১	১৬৯ ৭	১০৯ ৯
১৯৪১	১১৪ ৮	৯২.৪	১৩১.১	১৫৩.২	১০৮.২	১৮৫ ৮	১৯১.৪	১১৭.৮
১৯৪২	১০২.০	৯৯.৫	১৩৬.৭	১৩৮.৭	৭৪.৪	১৯৪.৫	১৮০ ৯	১১১.২
১৯৪৩	১১৭ ০	৮৪ ৪	১৪১.৫	১৩৮.৬	৯১ ৩	১৮৮ ৪	১৭৯.২	১১৭.০
১৯৪৪	১২২ ৯	৮৬ ৭	১৩৯.৬	১২৬ ৩	৯৭.১	১৮২.১	১৯২ ৭	১১৭ ০
১৯৪৫	১২০ ০	৮৪ ৪	১৪২ ৯	১৩৪.১	৮৫.৫	১৯৬ ৫	১৯৬.৫	১২০ ০

"যুদ্ধের দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতি ভারতীয় শিল্পগুলোয় বিদ্যমান ক্ষমতার সর্বাধিক সদ্ব্যবহার ঘটায় যদিও বৃহৎ আকারে নতুন শিল্পবিকাশের পক্ষে তা খুব অনুকূল ছিল না। অবশ্য কয়েকটি শিল্প, যেমন লোহ সংকর ও নন্-ফেরাস ধাতু যেমন অ্যালুমিনিয়াম ও রসাঞ্জন, ডিজেল ইঞ্জিন, পাম্প, বাইসাইকেল ও সেলাই কল বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য যেমন, সোডা অ্যাস, কস্টিক সোডা, ক্লোরিন ও সুপার ফসফেট ও কয়েক প্রকার মেশিন টুল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্থাপিত হয়। তবে বড় রকমের উদ্দীপক আসে মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে—যেমন, ছুরিকাঁচি তৈরী, ঔষধাদি ও ভেষজ দ্রব্য উৎপাদন প্রভৃতি। মুদ্রাস্ফীতিজনিত অবস্থা ও বিক্রেতাবাজারে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলোর উৎপাদন বড় রকমের উদ্দীপক জোগায়। এরা বিভিন্ন শিফ্‌টে উৎপাদন চালুও রাখে যদিও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানীর নানা অসুবিধা বিরাট ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়।"[২]

ব্রিটেনের অর্থনৈতিক নীতি

অবশ্য ব্রিটিশ সরকার, লঘু ও ভারী ভারতীয় শিল্পগুলোর সম্প্রসারণে নিয়ন্ত্রণ-বিহীন স্বাধীনতা দেয় নি। Eastern Economist-এ লেখা হয়েছিল:

'আমরা সব কিছুই তৈরী করতে পারতাম, কিন্তু কিছুই আসলে পারিনি।' আমরা যে কোন জিনিসের যোগান দিতাম। পৃথিবীর যে কোন জিনিসের সংশোধন ও সারানোর কাজ করছি কিন্তু তৈরী করিনি কিছুই। আমাদের ছিল না কোন ব্যবস্থা, কোন পরিকল্পনা। বরং ছিল একটাই নিখুঁত পরিকল্পনা—সেটা হলো যুদ্ধোত্তর

২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

পর্যায়ে এ দেশের শিল্পায়নকে বাধা দেওয়া।"[৩]

যুদ্ধের সময় ব্রিটেন ভারতের শিল্পগুলোর মুক্ত বিকাশ অনুমোদন করেনি কেননা তার ভয় ছিল যে একটা শিল্পোন্নত ভারত, তার শক্তিশালী ভারী শিল্প ব্যবস্থা নিয়ে তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে।

জাহাজী পরিবহনের অভাবের অজুহাতে ও মূলধন প্রবহনের পথ রুদ্ধ করে ইংরেজ সরকার যুদ্ধের সময় ভারতকে বিদেশ থেকে স্বাধীনভাবে বেশ মূলধনী দ্রব্য আমদানী করতে দিত না। সেই কারণে ভারতীয় শিল্পপতিরা নতুন শিল্প-উদ্যোগ নিতে পারত না ত বটেই, উপরন্তু বিদ্যমান কলকারখানাগুলোতে বাজারের বাড়তি চাহিদা মেটাতে অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য হত। উল্লেখ্য যে, বিদেশী দ্রব্যের আমদানী একেবারে বন্ধ হওয়ায় ও যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য সরকারী আদেশের ফলে বাজারে চাহিদার চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। আসলে, যুদ্ধের সময় উৎপাদনের প্রসারের কারণ ছিল "বিদ্যমান কলকারখানা ও যন্ত্রপাতির বাড়তি কাজ ও শ্রমিকদের অতিরিক্ত শিফ্‌ট।"[৪]

এমন কি যুদ্ধের পণ্য সরবরাহের আদেশের ক্ষেত্রে, Eastern Group Supply Council—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে পণ্য সরবরাহের আদেশ দানের ক্ষেত্রে মূল সংস্থা - ভারতের বিরুদ্ধে বিরাটভাবে বৈষম্যের নীতি অনুসরণ করত। এ বিষয়ে M. Visvesvaraya লিখেছেন:

"মনে হয় Roger Mission ও Eastern Group Supply Conference-এর পরামর্শেই বর্তমান যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের আদেশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বৈরী দেশগুলোর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থানুযায়ী কয়েকটি দ্রব্য সরবরাহের আদেশ, কোন কারিগরি নৈপুণ্য কিংবা অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না এমন, ভারতীয় শিল্পোদ্যোগ ও কলকারখানায় দেওয়া হয়েছিল। যে সব দ্রব্য ভারী শিল্পে অথবা উন্নততর কারিগরি দক্ষতায় তৈরী হয় সেগুলো সরবরাহের আদেশ গিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার ডোমিনিয়নগুলোতে।"[৫]

উক্ত Council-এর দিক থেকে ভারী শিল্পজাত দ্রব্যাদির জন্য বড় রকমের অর্ডারের অভাব ছিল যুদ্ধকালীন পর্যায়ে ভারতীয় ভারী শিল্পগুলোর সম্প্রসারিত

৩. Eastern Economist, August 31st, 1945
৪. পূর্বোক্ত জার্নাল দ্রষ্টব্য, মার্চ ১৫, ১৯৫৬
৫. Sir M. Visvesvaraya, Prosperity through Industry, p. 15

না হতে পারার একটি বড় কারণ।

যুদ্ধের সময়ে ব্রিটেনের পক্ষে ভারতবর্ষকে যে ব্যয়ভার বহন করতে হয় তার জন্য ভারতের অনুকূলে স্টার্লিং মুদ্রা পুঞ্জিত হয়েছিল। এই জমা অর্থের উপর ছিল ব্রিটেনের দৃঢ়মুষ্টি। যুদ্ধকালে ও যুদ্ধোত্তর সময়ে মৌল জাতীয় প্রয়োজনে ভোগ্যদ্রব্য অথবা মূলধনী দ্রব্য আমদানীর জন্য এই জমা মুদ্রা ব্যবহার করতে ব্রিটেন অনুমতি দেয় নি।

বেপরোয়া মুনাফা অর্জন

যুদ্ধের সময় প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতিজনিত অবস্থা সাধারণ মানুষের জীবনে নিয়ে আসে ক্রমবর্ধমান দুর্দশা। সারা জীবনের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চরম ঘাটতির জন্য কষ্ট পেতে থাকে।

যদিও ভারতের সাধারণ জনগণ যুদ্ধের সময় জীবনের ন্যূন্যতম দ্রব্যাদির মূল্য-বৃদ্ধির দরুন দরিদ্র হয়ে পড়ে, তথাপি শিল্পপতিরা, ধনিক ও বণিক শ্রেণীগুলো বিরাট পরিমাণ মুনাফা লোটে। যেমন অনেক অর্থনীতিবিদ্ বলেছেন, যুদ্ধের পূর্বেও অন্য দেশের তুলনায় (বিশেষভাবে উন্নত দেশগুলোর) ভারতে মুনাফার হার ছিল অনেক বেশি। যুদ্ধ এ মুনাফার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় বিরাট আকারে। দেশপ্রেমী পুঁজিবাদীরা, যারা জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছে বলে এতকাল দাবী করে আসছে, তারাও যুদ্ধের পরিস্থিতি ও জনগণের তীব্রতর দুর্দশার সুযোগ নিয়ে বিরাট মুনাফা করে। নীচের সারণি থেকে এটা প্রমাণ করা যাবে :

১৯৪৩ সালে বিভিন্ন শিল্পের গড় নীট মুনাফার সূচক সংখ্যা[৬]

১৯৩৯ = ১০০

পাট	৯২৬	কয়লা	১২৪
কার্পাস	৬৪৫	ইঞ্জিনিয়ারিং	২২৫
চা	৩৯২	বিবিধ	৪০১
চিনি	২১৮	অন্যান্য	৩২৭

১৯৪৫ সালে কোন শিল্পেই দুর্মূল্য ভাতা বৃদ্ধির দাবী মানা হয় নি। "ভারত সরকার যুদ্ধকালীন পর্যায়ে মজুরীর অংশবিশেষ সংকুচিত করতে শুরু করল। জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি বিধানের প্রয়াসে ক্রমবর্ধমান দ্রব্য-

৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ : Prof. Wadia & K. T. Merchant, পৃ: ৫৭১

মূল্য ও অপ্রচুর দুর্মূল্য ভাতার প্রভাব দেখা যায় এর থেকে যে যেখানে ১৯৪৩ সালে ধর্মঘটের দরুন ১,২৯১,০০ কাজের দিন নষ্ট হয়েছিল সেখানে ১৯৪৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তার সংখ্যা ছিল, ৩,৭৭৯ ০০০ দিন।"[৭] যেমন Prof. Wadia ও Prof. Merchant খুব তীক্ষ্ণভাবে মন্তব্য করেছেন, "যুদ্ধের সময় উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক বিকাশ অথবা শিল্পোন্নতির উপর ভিত্তি করে মূলধনের সঞ্চয়ন ঘটেনি। ভারতীয় পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্ফীত সম্পদ ও ভারতের আর্থিক বিকাশের নিম্নগতির বৈপরীত্য ছিল চোখ ধাঁধানো।"[৮]

ব্রিটিশ ও ভারতীয় পুঁজিবাদীদের পরিবর্তনশীল অবস্থান

অবশ্য যুদ্ধশেষে ব্রিটিশ মূলধনের শক্তির তুলনায় ভারতের মূলধনের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে।

"যুদ্ধকালীন চুক্তিসম্মত মুদ্রাস্ফীতিজনিত অবস্থা ও মুনাফার জন্য ধনী ও শক্তিশালী হয়ে ভারতীয়রা ব্রিটিশ স্বার্থ সম্পর্কিত সম্পদ ক্রয় করতে চাচ্ছে।"[৯]

যুদ্ধের পর ভারতের বর্ধিত মূলধনের দ্বারা ব্রিটিশ উদ্যোগগুলো কিনে নেবার অন্য কারণ হলো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বিদেশ থেকে শিল্পের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে না পারা। "যুদ্ধের সময় যন্ত্রপাতি আমদানীতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ও নতুন শিল্পে বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ করতে না পারার দরুন এই বিরাট পরিমাণ সঞ্চিত মূলধন এ দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী মালিকানাধীন শিল্পগুলোতে অপরিহার্যভাবেই আকর্ষিত হয়। যুদ্ধের সময় ও তার পরপরই ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে ক্রয় করার একটা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় আর সাধারণভাবে ভারত ও এশিয়ার অনিশ্চিত রাজনৈতিক আবহাওয়ার জন্য এ ঘটনা ব্রিটেনের শিল্পপতিদের কাছে অনভিপ্রেত হয় নি।"[১০]

ভারতীয় ও বিদেশী মূলধনের একীভবনের নব যুগ

পরবর্তীকালে ভারতীয় ও বিদেশী মূলধনের একীভবনের প্রবণতা বিকশিত হয়।

৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ : পৃ: ৫৭১
৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য
৯. Daily Express, 1949
১০. Supplement to Capital, Dec. 22, 1949

যদিও যুদ্ধের পূর্বে কিছু যৌথ উদ্যোগে বিদেশী ও ভারতীয় মূলধনের সংযুক্তিকরণ ঘটেছিল তবু সামগ্রিকভাবে একীভবন ছিল কম। যুদ্ধের পর দেখা দিল নতুন এক আর্থিক বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধের পর ব্রিটিশ পুঁজিবাদ দুর্বল হয়ে পড়লে ভারতে তার স্বার্থরক্ষার্থে সে এক নতুন কৌশল উদ্ভাবন করলো—যেটি হলো ভারতে যৌথ অ্যাংলো-ভারতীয় উদ্যোগ।

মূলধনী সম্পদে ভারতের দুর্বলতাই একে সহজতর করে তুলল। নতুন ও পুরাতন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ও ব্রিটিশ স্বার্থের একীভবনের যুগ ক্রমবর্ধমানভাবে উন্মুক্ত হলো।

৭৮টি কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণকারী Andrew Yule & Co., ৭০টির নিয়ন্ত্রণকারী Gillanders Arbuthnot, ৫৭টির নিয়ন্ত্রণকারী Octavius Steel & Co., ৩৯টি কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ Mcleod ও Jardine Henderson & Co-র পরিচালকমন্ডলীতে এখন ভারতীয় ডিরেক্টর হয়েছে আর এগুলোই ব্রিটিশ ও ভারতীয় মূলধনের একীভবনের ঘটনার দ্রুত-বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত। বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বার্থের একীভবনের বিকাশ এদেশে বিদেশী মূলধনের নয়া বিনিয়োগের একটা দিকের পূর্বাভাস ছিল।"[১১]

১৯৪৬ সাল থেকে ভারতীয় মালিকদের সংগে মৈত্রী স্থাপন করে আমেরিকান মূলধন মালিকরাও এদেশে যৌথ আর্থিক উদ্যোগ নিচ্ছে। "এরই পাশাপাশি ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিকরাও আমেরিকার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সংগে কারবার স্থাপন করে যাচ্ছে। ইন্দো-আমেরিকান ব্যবসায়ী সম্পর্ক ভারতে প্রায় সর্বত্র নতুন বিকাশশীল শিল্পগুলোর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে—যেমন, মোটরগাড়ী তৈরী, বেতার নির্মাণ, প্লাস্টিক, কৃষি-যন্ত্রপাতি, রসায়ন শিল্পের কয়েকটি ক্ষেত্র, কৃত্রিম শিল্প ও শিল্পে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন।"[১২]

আমরা পরবর্তী অংশে এই সব যুদ্ধোত্তর ঘটনাগুলোর তাৎপর্য আলোচনার প্রস্তাব রাখছি।

১১. পূর্বোক্ত সাময়িকীপত্র দ্রষ্টব্য।

১২, ঐ

গ

রাজনৈতিক ঘটনাবলী

আমরা এখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করবো যা শেষ পর্যন্ত এদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটায়।

যুদ্ধে ভারতকে খামখেয়ালীভাবে অংশগ্রাহী করা হয়

যুদ্ধের সময় ব্রিটেনের পক্ষে ভারতের জনগণের প্রতিনিধিদের কোন সম্মতি না নিয়েই ভারতকে অংশগ্রাহী হতে হয়। ১৯৩৯ সালে জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণার পরই, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সংগে পরামর্শ না করেই বড়লাট ভারতকে বৈরী ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, ভারত সরকার (সংশোধনী) আইন পাশ করে সংবিধানের কার্যকারিতা অতিক্রম করবার ক্ষমতা বড়লাটকে অর্পণ করে। ১৯৩৯ সালের Defence of India Ordinance-এর দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার ডিক্রী উদ্‌ঘোষণার মাধ্যমে শাসন করার ক্ষমতা নেয়।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিভূ বড়লাট কর্তৃক যুদ্ধে খামখেয়ালীভাবে ভারতকে জড়িয়ে ফেলা ও নিজের হাতে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা নেওয়া ভারতীয় জনগণের মধ্যে প্রচন্ড অসন্তোষ সৃষ্টি করে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও বিটিশ সরকার

এই অবস্থায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে অভিহিত করে, তার সংগে নিজেকে যুক্ত করতে অস্বীকার করে। এক বিবৃতিতে ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করে, "কমিটি যে

যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে মনে করে, আর যার লক্ষ্য ভারতসহ অন্যত্র সাম্রাজ্য-বাদকে সুদৃঢ় করা বলে ভাবে তার সাথে যুক্ত হতে কিংবা কোন সহযোগিতা দিতে পারে না।" কমিটি আরও ঘোষণা করে, "সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটিশ সরকারকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ও বিশেষভাবে বিবেচিত নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে তার উদ্দেশ্য এবং কেমন ভাবে এ সব লক্ষ্য ভারতে প্রযোজ্য ও বাস্তবায়িত হবে তা ঘোষণা করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। তারা কি ভারতবর্ষকে একটা স্বাধীন জাতি বলে মনে করে যার নীতি তার জনগণের ইচ্ছানুসারে পরি-চালিত হবে?" (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)

কংগ্রেসের দাবী মানতে ব্রিটিশ সরকার গররাজি হলো। সে আবার উচ্চারণ করলো ভবিষ্যতে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়নের মর্যাদাদানের প্রতিশ্রুতি।

১৯৪০ সালে আবার কংগ্রেস যুদ্ধে সহযোগিতার ইচ্ছা ব্যক্ত করলো এই শর্তে যে ব্রিটেন ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার দাবী মেনে নেবে ও কেন্দ্রে একটা সাময়িক বা অন্তবর্তীকালীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করবে যা একটা পরিবর্তিকালীন ব্যবস্থা হলেও কেন্দ্রীয় সংসদে সকল নির্বাচিত সদস্যের আস্থাভাজন হবে.. যদি এসব ব্যবস্থা গৃহীত হয়, তবে সে দেশের প্রতিরক্ষায় একটা কার্যকরী সাংগঠনিক প্রয়াসে সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করবে" (জুলাই, ১৯৪০ ।

কংগ্রেসের প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকার এই অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করে যে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম লীগ ও দেশীয় নৃপতিরা তাতে সম্মতি দেবে না। বড়লাট একটা প্রতি-পরিকল্পনা রাখেন যার মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ অবসানে নতুন সাংবিধানিক কাঠামো তৈরীর জন্য ভারতের জাতীয় জীবনের প্রধান প্রধান গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সংস্থা গঠন. "মনোনীত ভারতীয়দের সংযোজনে বড়লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদের কলেবর বৃদ্ধি ও "ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলো ও অন্যান্য-দের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা 'যুদ্ধ উপদেষ্টা পরিষদ' নিয়োগ।"

এককভাবে আইন অমান্য

আলাপ, আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা আদায়ে বারংবার ব্যর্থতার অভিজ্ঞ-তার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস পরিশেষে ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে এককভাবে আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করে। সংগ্রামের এই সীমিত পরিকল্পনা এই কথাই বলে যে কংগ্রেসী নেতৃত্বের যুদ্ধে ব্রিটেনকে গুরুতরভাবে বাধা দেওয়ার মানসিকতা ছিল না।

যুদ্ধে নতুন পরিস্থিতি

১৯৪১ সালের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর দ্বারা ও পার্ল হারবার জাপানের দ্বারা আক্রান্ত হলে, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের মৈত্রী সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনসহ সম্মিলিত জাতিগোষ্ঠীতে প্রসারিত হয়।

ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে আটলান্টিক সনদ (Atlantic Charter) যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বঞ্চিত বিভিন্ন জাতির 'সার্বভৌম অধিকার ও আত্ম-শাসনের' পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে। কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে সনদ আশাবাদ জাগ্রত করে।

জার্মানী ও জাপান যথাক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফিলিপাইন আক্রমণ করলে ও তার ফলে ভারত সহ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলো সম্পৃক্ত হয়ে পড়লে কংগ্রেস যুদ্ধটিকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যদানের পূর্ববর্তী ঘোষণা বর্জন করে। এখন সে এই যুদ্ধকে ফ্যাসিবাদী যুদ্ধ বলে বর্ণনা করে। ১৯৪২ সালে সে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অক্ষশক্তিগুলোকে আগ্রাসনকারী বলে আখ্যাত করে আর তাদের দ্বারা আক্রান্ত জাতিগুলোর প্রতি সহানুভূতি জানায়। সে আরও বলে যে "একমাত্র একটি স্বাধীন ভারতবর্ষই জাতীয় ভিত্তিতে দেশের প্রতিরক্ষার ভার নিতে সক্ষম।"

ভারতে ক্রিপ্‌স্ মিশন

এশিয়ার ভূখণ্ডে জাপানী সেনাবাহিনীর বিজয়ী অগ্রগতি যার চরম পর্যায়ে রেংগুন অধিকৃত হলো, ব্রিটেনকে ভারতের মন পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সজাগ করে তুললো। ব্রিটেন বুঝল যে ভারতীয় জনগণের সমর্থনের উদ্‌যোজন ছাড়া জাপানের ভারত আক্রমণ প্রতিরোধ করা কঠিন হবে। তাই ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিপরিষদ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সংগে রাজনৈতিক বোঝাপড়ার জন্য আলোচনা করতে এদেশে ক্রিপ্‌স্ মিশন পাঠাল। এ প্রচেষ্টা অবশ্য হলো কেননা ব্রিটেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাদের পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত যুদ্ধকালীন জাতীয় সরকারের দাবী মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালো। যদিও জাতীয়তাবাদী নেতারা যুদ্ধশেষে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট হতে ব্যগ্র ছিল, এমন কি যুদ্ধকালীন জাতীয় সরকারের প্রধান হিসাবে বড়লাটকে মেনে নিতেও রাজী ছিল, তবু তারা জেদ্ ধরে থাকলো যে যুদ্ধকালীন জাতীয় সরকারকে পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে। অবশ্য ব্রিটিশ সরকার এ দাবী মেনে নিতে অস্বীকৃত হলে আলাপ আলোচনা ভেংগে পড়ল।

যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ অক্ষশক্তিগুলোকে আগ্রাসক বলে অভিহিত করে একটা ফ্যাসিবিরোধী ভূমিকা নিয়েছিল, এমন কি যুদ্ধশেষে ব্রিটেন কর্তৃক জাতীয় স্বাধীনতা অর্পণের প্রস্তাব গ্রহণ ও পূর্ণক্ষমতাভূষিত এক জাতীয় সরকারের মাধ্যমে ভারতের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গঠনে রাজী ছিল, তখনদেশে ভিন্ন দুটি জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী ভিন্ন মত পোষণ করত। এরা যুদ্ধকালীন সংকটে বিজড়িত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে আলাপ আলোচনা মারফৎ জাতীয় স্বাধীনতা পাওয়ার আশাকে অবাস্তব বলে আখ্যা দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র উপায় হিসেবে দেশব্যাপী জংগী আন্দোলনের পক্ষে রায় দেন। অবশ্য, জাপান সম্পর্কে কি মনোভাব হবে তা নিয়ে এদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। একটি গোষ্ঠী জাপানকে জাতিগুলোর শত্রু বলে চিহ্নিত করে স্বাধীনতা অর্জনে সাময়িকভাবেও কৌশলগত কারণে তার সংগে সংযুক্ত হয়ে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর চিন্তা বর্জন করে। অন্য গোষ্ঠী সুভাষ বোসের নেতৃত্বে এই মত পোষণ করে যে ভারতীয়রা জাপানের সাহায্যে ভারতের উপর ব্রিটিশ আধিপত্য অপনয়নে ও স্বাধীনতা অর্জনে প্রয়াসী হতে পারে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটা প্রধান দুর্বলতা ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ও সম্মিলিতভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে জাতীয় দাবী উপস্থাপনে ব্যর্থতা। "স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলনের বিকাশে ভারতের মূল দুটি বড় রাজনৈতিক দলের মধ্যে ফাটলটি বড়ই হতে থাকে। এই দুটি দলের একটি ছিল কংগ্রেস যা জাতীয় ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল; আর অন্যটি হলো মুসলিম লীগ যা সংগঠিত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মুসলমানদের মতামতের কর্তৃত্ব সম্পন্ন হয়ে। এটা স্পষ্টতর হয়েছে যে যখন কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ ভারতের ভিত্তিতে স্বাধীনতা দাবী করেছে, তখন মুসলিম লীগ ভারতবর্ষকে পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান এই দুটি ভাগে খণ্ডিত করে স্বাধীনতার দাবী পূরণ করতে চেয়েছে।"[১]

ব্রিটিশ রাজনীতিকরা দেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী দুটি রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে এই ফাটলটিকে নিপুণভাবে কাজে লাগায় তাদের জাতীয় দাবীর পিছনে ঐক্যবদ্ধ চাপটাকে বাধা দিতে। এইভাবেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা গুরুতরভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

১. **B. N. Vekatratnam: National Movements and Constitutional Developments.**

দুটি বিপরীত অনুভূতির মধ্যে কংগ্রেস নেতাদের মন আন্দোলিত হচ্ছিল। এক-দিকে তারা ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সম্মিলিত জাতিগুলোর সংগে সহযোগিতায় আকাংক্ষিত ছিল। অন্যদিকে, তাদের ইচ্ছা ছিল সম্মিলিত জাতি-সমূহের সাথে ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধে স্বাধীন জাতি হিসেবে সহযোগিতা করা। যখন ব্রিটিশ সরকার তাদের আপোষমূলক দাবীও মেটাতে চাইল না, যেমন, যুদ্ধ-শেষ না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় স্বাধীনতার দাবী মুলতুবি রাখা কিন্তু পূর্ণক্ষমতা-সম্পন্ন জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা, তখন তাদের জাতীয় দাবীকে বাস্তবায়িত করার সংগ্রাম সুরু করা ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ খোলা রইল না।

১৯৪২ সালের বিখ্যাত অগাস্ট প্রস্তাব

১৯৪২ সালে কংগ্রেস এক প্রস্তাব পাশ করে ঘোষণা করল যে "ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আশু অবসান ভারত ও সম্মিলিত জাতিসমূহের সাফল্যে অত্যন্ত প্রয়ো-জনীয়।" কংগ্রেস আরও প্রস্তাব করল "ব্যাপকতম মাত্রায় গণসংগ্রামের .সম্মতি দিতে যাতে দেশ শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিগত ২২ বছরে যে অহিংস শক্তি সঞ্চয় করেছে তাকে সদ্ব্যবহার করা যায়।'

পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী পরিষ্কার করে বলেছিলেন যে সংগ্রামের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল আলাপ-আলোচনা সুরু করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি, অবিলম্ব আন্দোলন সুরু নয়। এর সমর্থন মেলে প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত এ কথাগুলোর দ্বারা, "কমিটি কোন ক্রমেই চীন অথবা রাশিয়ার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিব্রত না করতে আগ্রহী কেননা যেমন করেই হোক দেখতে হবে যেন এ দুটি দেশের মূল্যবান স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে; কমিটি এটাও দেখবে যেন সম্মি-লিত জাতিগুলোর আত্মরক্ষামূলক ক্ষমতা বিপদগ্রস্ত না হয়।"

চমৎকার কৌশল

১৯৪২ সালের প্রস্তাবের চমৎকার কৌশলগত তাৎপর্যের উপর অধ্যাপক **D. P. Kosambi**-র সুন্দর অবেক্ষণ রয়েছে। এ বিষয়ে **"Discovery of India"**-তে পণ্ডিত নেহরুর ব্যাখ্যার মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন:

"যখন বোম্বাইয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি মিলিত হলো তখন অধিকাংশ সদস্য গ্রেপ্তার আসন্ন জেনে নিজেদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আর্থিক কাজ কারবার

বছর খানেক কিংবা তার বেশি সময়ের সম্ভাব্য অনিশ্চয়তার মোকাবিলায় বেশ জড়িয়ে রাখল। এই লেখকের মনে যা বেশ উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে তা হলো এই ঃ এই সব যোগ্য প্রতিনিধিদের একজনও প্রতিপক্ষ ব্রিটিশরা আঘাত আনবে জেনেও কংগ্রেস এবং সামষ্টিকভাবে জাতির জন্য কোন কাজের পরিকল্পনার কথা ভাবে নি। সাধারণ ধারণা ছিল এটাই যে 'মহাত্মা আমাদের একটা পরিকল্পনা দেবেন অথচ গ্রেপ্তারের ঠিক পূর্বে মহাত্মার ভাষণের কোন প্রভাবই অনুভূত হলো না। এক প্রত্যাশিত গণ-বিস্ফোরণের প্রাক্-মুহূর্তে সমবেত প্রতিনিধিদের সামনে সেই ভাষণটি চরিত্রগতভাবে বৈপ্লবিক ছিল না, কিংবা কোন কর্মসূচীর উল্লেখও তাতে রইল না; বরং ডিনার-শেষে প্রদত্ত হাল্কা মেজাজের ভাষণের মত বলে মনে হলো। এটা কেমন কথা যে জনগণের অসন্তোষ সম্পর্কে জ্ঞান সত্যকারের এক কাজের পরিকল্পনার অভাবের সমতুল্য হয়ে রইল! এর অর্থ কি এটাই যে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্রগত চিন্তাভাবনা কংগ্রেসী নেতৃত্বকে প্রভাবিত করেছিল? একথা বলা যেতে পাবেযে শ্রেণীভিত্তিক দৃষ্টিকোণ হতে উক্ত আন্দোলন ছিল খুবই ভাল, জাতীয় বৈপ্লবিক দিক থেকে তা যতই অর্থহীন হোক না কেন! আসন্ন বছরটির ঘটনাবলীর দায়িত্ব থেকে কংগ্রেসকে মুক্ত করল ব্রিটিশ সরকারের আতংক ও নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার; একই সময়ে জেল ও বন্দীশিবিরের চাকচাক্য ক্ষমতাসীন কংগ্রেস মন্ত্রীদের মন্দ কাজের রেকর্ডকে ধুয়ে মুছে দিল যার দ্বারা জনগণের মধ্যে কংগ্রেস সংগঠনের "কাজের পূর্ণ জনপ্রিয়তার পুনরুদ্ধার সম্ভব হলো। যদি ব্রিটিশরা যুদ্ধ জেতে তবে এটা পরিষ্কার যে কংগ্রেস জাপানকে সাহায্য করে নি; আর যদি জাপানীরা ভারত অধিকারে সফল হয় (আর তাদের সত্বর সর্বশক্তি দিয়ে তথাকথিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে আক্রমণ সুরু করাটাই বাকী ছিল) তারা নিশ্চয়ই ব্রিটিশদের সাহায্য করেছে বলে কংগ্রেসকে অভিযুক্ত করবে না। অবশেষে, জনগণের উপর নিপীড়নের জন্য ঘৃণা বুদ্ধিহীন আমলাদের ঘাড়েই পড়বে, চরম অসন্তোষ ও তার দমন ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর নিশ্চয়ই কোন ক্ষতি করবে না। ...বৃথাই তোমাকে খুঁজতে হবে নেহরুর পুস্তকে এই অনস্বীকার্য ঘটনার স্বীকৃতিটিকে যে ১৯৪২ সালে, যখন শ্রমজীবী মানুষকে চরম দুঃখ ও সম্মানহানি ভোগ করতে হচ্ছিল, তখন ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সমৃদ্ধি বাড়ছিল যা পূর্বে কোনদিন দেখা যায় নি। যুদ্ধকালীন নানা চুক্তি, উচ্চ মূল্য, কালোবাজারীর বিরাট সুযোগ পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের আকাংক্ষাই পূরণ করছিল।

এই ঘটনার স্বীকৃতি ও আরও একটা সত্য ও বাস্তব ঘটনা যে ব্রিটিশরা দেশে বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান মুনাফালাভের জন্য বরাবর সুযোগ করে দিয়েছে আমাদের এই কথাই বলতে সুযোগ দেয় যে দেশে বিপ্লবের পথে জনগণের চাপ থাকা সত্ত্বেও ১৯৪২ সালে পরিকল্পনার অভাব একের পর এক অচলাবস্থার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"[২]

রাজনৈতিক অচলাবস্থা

বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করে ও কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করে সরকার যে কোন আন্দোলন সুরু করার প্রয়াস পণ্ড করে দিল। সারা দেশে এর ফলে সুরু হলো স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন যার মোকাবিলা নেতৃত্ব ও সংগ্রামী পরিকল্পনার অভাবের দরুন সরকার নির্দয় নিপীড়নব্যবস্থার মাধ্যমে সাফল্যের সংগে করে ফেলে। আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের দ্বারা সারা দেশে সন্ত্রাসবাদ ও নাশকতামূলক কাজ ছড়িয়ে পড়লেও সরকার সেগুলোকেও দমন করতে সক্ষম হয়। এই সব বীরোচিত সংগ্রামের নায়ক হয়ে উঠলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। সুভাষ বোসের নেতৃত্বে বার্মাতে সংগঠিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে ভারতকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো।

যুদ্ধ শেষে তাই দেখা গেল এদেশে একটা রাজনৈতিক অচলাবস্থা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় জনগণের জাতীয় চেতনা বেশ গভীর হয়েছিল আর জাতীয় স্বাধিকারের আগ্রহ স্পষ্টতর ও তীব্রতর হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগ বিরাট সংখ্যক মুসলিম জনগণকে পিছনে নিয়ে ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার জনসমর্থন নিয়ে জাতীয় স্বাধিকারের দাবী আরও জোরদার করে জানাল। এ দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যেকার সংঘাত অবশ্য তীব্রতর হয়ে উঠল আর স্বাধীনতার জন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাবী জানাতে ব্যর্থ হলো। পশ্চিমী ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর প্রারম্ভিক সামরিক পরাজয় ভারত সহ এশিয়ার জনগণের কাছে তাদের নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক মর্যাদা কমিয়ে দিল। ঘটনাটি তাদের জাতীয় স্বাধিকারের আকাংক্ষায় গতি সঞ্চার করল আর অধিকতর আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করল। সুভাষ বোসের নেতৃত্বে গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে গান্ধীর অহিংসা নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসল—যে নীতি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দো-

২. D. D. Kosambi: Exasperating Essays, pp. 16-17.

লনের চরিত্রকে দুর্বল করে দিয়েছিল। উক্ত ফৌজের অভিযান দমিত হলেও ভারতে যুদ্ধ পরবর্তীকালে সামরিক ও নৌবাহিনীর লোকদের মধ্যে বিদ্রোহের সূচনা করল যা ভারতীয় জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার দাবীর প্রতি ব্রিটেনের মনোভাবকে অনেকখানি পরিবর্তিত করতে সাহায্য করে।

যুদ্ধশেষে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষ

যুদ্ধের শেষে ভারতে গণ-অসন্তোষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফেনিয়ে উঠল। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে উদ্ভূত জনগণের অর্থনৈতিক দুর্দশা তাদের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব জাগিয়ে তুলল আর তুলল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রবল আকাংক্ষা। ভারতবর্ষ প্রবল গণ সংগ্রামের রঙ্গমঞ্চে পরিণত হবে বলে আশংকা হলো। সংকটের গভীরতা উপলব্ধি করে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা সুরু করতে এক ক্যাবিনেট মিশন পাঠাতে মনস্থ করল। দূরদর্শী ব্রিটিশেরা এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির আঁচ পেল। Indian Central Legislative Assambly-র ইয়োরপীয় গোষ্ঠী J. P. Griffith ১৯৪৬ সালে এক ভাষণে কবুল করলেন—

"ভারতে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন আসার আগে অনেকের মতে ভারত ছিল এক বিপ্লবের মুখে। এ বিপদটিকে পরিহার করতে না পারলেও অন্ততঃ স্থগিত রাখতে পারল ক্যাবিনেট মিশন।"

R.I.N. বিদ্রোহ

যুদ্ধশেষে ভারতের সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেই শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছিল না, সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের মধ্যেও তা দ্রুত অনুপ্রবেশ করছিল। বেশ কয়েকটি বিমান ও নৌবাহিনী কেন্দ্রে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ধর্মঘট ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সামরিক ভিতটাকে নাড়িয়ে দিতে উদ্যত হলো। এ ঘটনা ছিল ব্রিটেনের কাছে বিপদের ইংগিত। তাছাড়া বোম্বাই, মাদ্রাজ ও করাচীতে নৌ-বিদ্রোহ জনগণের মধ্যে বিরাট সহানুভূতি ও সমর্থনের সঞ্চার করল। বোম্বাইয়ে মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবি মানুষদের সহানুভূতিসূচক বিক্ষোভ, দোকানপাট বন্ধ ও ধর্মঘটের মাধ্যমে নৌবিদ্রোহের প্রতি সমর্থন দেখা গেল। শুধুমাত্র ব্রিটিশ সৈন্যদের দিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে তার মোকাবিলা করতে হলো। একমাত্র বল্লভভাই প্যাটেলের

হস্তক্ষেপ ও নৌ-বাহিনীর লোকদেরপ্রতি উপদেশের পরিপ্রেক্ষিতেই সংগ্রাম পরিত্যক্ত হলো।

দেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য বড় বড় বিক্ষোভ প্রদর্শন, কখনও কখনও পুলিশ ও মিলিটারীর সঙ্গে সংঘর্ষ লেগেই থাকল।

সাম্রাজ্যবাদের নয়া কৌশল ও স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্

ব্রিটিশ রাজনীতিকরা পরিস্থিতির বিস্ফোরক চরিত্র অনুধাবন করতে পেরেছিলেন আর সেই কারণে তার সমাধানে এক নতুন রাজনৈতিক কৌশলের উদ্ভাবন করলেন। ১৯৪৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এল; এর আগের দিন বোম্বাইয়ে নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহ হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে পার্লামেন্টের সামনে ভারত সম্পর্কে ব্রিটেনের নয়া রাজনৈতিক চিন্তাভাবনারব্যাখ্যা দিয়েছিলেন স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ এইভাবে, অবশ্যই অতীতের দিকে দৃষ্টি রেখেঃ

"মৌলিক অর্থে দুটি বিকল্প সমাধান ছিল সেদিন সরকারের সামনে। ভারতে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করতে তারা পারতেন সেক্রেটারী অফ্ স্টেটের দপ্তরের লোকসংখ্যা বাড়িয়ে অথবা যতদিন না ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যমত হচ্ছে ততদিনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রসাশনিক দায়িত্ব গ্রহণে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রসার ঘটিয়ে। দ্বিতীয় বিকল্পটি ছিল প্রথম ব্যবস্থাটির অসম্ভাব্যতার স্বীকৃতির নামান্তর। তবে একটা জিনিস ছিল স্পষ্টতই অসম্ভব। সেটা হলো অনন্তকালের জন্য আমাদের দায়িত্ব আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পালন করে যাওয়া, এমন কি সেই সময় পর্যন্ত যখন আমাদের দায়িত্ব পালনে ক্ষমতাই থাকবে না।"

ভারতে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির কয়েকটি বিচিত্র দিক

যুদ্ধোত্তর ভারতে একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে যখন ভারতের সব সম্প্রদায়ের লোকজন উত্তোরত্তর সংঘবদ্ধ হয়ে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য নিজ নিজ পথে সংগ্রাম করছিল, তখন দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পরস্পর নিকটে এসে একটি সর্বসম্মত ভিত্তিতে স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ দাবী তুলতে পারল না।

এই সময়কার আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ

উভয়েরই নেতৃত্ব স্বাধীনতার আকাংক্ষায় জনগণের সংগ্রামী পদ্ধতিগুলোকে নিন্দা করেছে। কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি সমকালীন ঘটনাগুলোর উপর এইভাবে মন্তব্য করেছিলেন ঃ

"ধর্মঘট, হরতাল ও সাময়িক কর্তৃত্বকে মেনে না চলার নীতির কোন স্থান নেই। তত্ত্বাবধায়ক বিদেশী শাসকদের সঙ্গে বিতর্কে যোগ দেওয়ার কোন আশু কারণ ঘটে নি।"

মহাত্মা গান্ধী জ্বালাময়ী ভাষায় জনগণের ক্রমবর্ধমান সংগ্রামকে এইভাবে নিন্দা করেন ঃ

"যদি তারা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত মিলতে পারতো তবে আমি তা বুঝতে পারতাম। অবশ্য তার অর্থ হত ইতর জনগণের হাতে ভারতবর্ষকে তুলে দেওয়া। এর পরিণতি দেখবার জন্য আমি ১২৫ বছর বাঁচতে রাজী নই ; বরং আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়াও তার থেকে ভাল।"

(হরিজন, ৭ই এপ্রিল, ১৯৪৬)

নৌ-বিদ্রোহ সম্পর্কে বলা যায় যে বল্লভভাই প্যাটেল তার নিন্দাই করেছিলেন, আর সমর্থন করেছিলেন "নৌবাহিনীতে নৌবাহিনীপ্রধানের শৃংখলার প্রয়োজনীয়তা" সম্পর্কে মন্তব্য।

কংগ্রেস নেতারা ব্রিটেনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীনতা আদায় করতে পারবেন বলে আশা করছিলেন। তাঁরা গণ আন্দোলনগুলোকে সমর্থন করেন নি বিশেষভাবে যখন সেগুলো হিংসাত্মক ও বৈপ্লবিক চরিত্র নিচ্ছিল।

ক্যাবিনেট মিশন

এই বিস্ফোরক অবস্থায় ভারতে এল ক্যাবিনেট মিশন। মিশন ভারতে উপস্থাপিত করল ভারতের ভাবী সংবিধানের জন্য নানা সুপারিশ, সংবিধান প্রণয়নের প্রস্তাব ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পরিকল্পনা। নিম্নবর্ণিত AICC-র (সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি) সংবাদ বুলেটিনে কংগ্রেসের তীক্ষ্ন সমালোচনা পাওয়া যায়ঃ

"আমাদের নিকট দেওয়া স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি এত বাধা-বিপত্তির ঝোপ-ঝাড়ে ভরা যে তাকে ঐ নামে ডাকাটাই ভুল। তথাকথিত গণপরিষদের বাস্তবে সার্বভৌম সংস্থার কিছুই থাকবে না।

"কেন্দ্রীয় সরকার, যার থাকবে না মুদ্রাব্যবস্থা, ব্যাঙ্কিং, শুল্কবিভাগ ও পরিকল্পনার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ, আধুনিক শিল্পযুগে অর্থনৈতিক প্রগতির নির্দেশ দানের ব্যাপারে দুর্বল হয়ে পড়বে।

''জাতীয় স্বার্থকে শুধু সাম্প্রদায়িক নয়, সামান্ততান্ত্রিক অবস্থার কাছে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়নের সাথে দেশীয় রাজ্যগুলোর ভাবী সম্পর্কও ঠিক করবে দেশীয় রাজন্যবর্গ ও তাদের লোকেরা।

''সাম্প্রদায়িক ও সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থই ভারতে সাম্রাজ্যবাদী খেলার প্রধান স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এগুলোকে তথাকথিত স্বাধীন ভারতের স্থায়ী ও কার্যকরী বৈশিষ্ট্য হিসেবে বজায় রাখার প্রচেষ্টা আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সংগত এই সন্দেহ মনে জাগায় যে ব্রিটিশ সরকার তাদের পূর্বসূরীদের সাবেকী নীতি হতে সরে আসতে অসমর্থ।

মুসলিম লীগ ঘোষণা করল যে যদিও ''ভারতের মুসলিম জনগণের অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বাধীন পাকিস্থান, গঠন,'' তবু ঐ মিশনের পরিকল্পনাটি সে গ্রহণ করেছে কেননা ''পাকিস্থানের ভিত্তি ও প্রতিষ্ঠার কথা তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।''

গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ হতে পরিকল্পনাটির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা এইভাবে করা চলে:

পরিকল্পনা সার্বভৌম গণপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করেনি কেননা পরিকল্পিত সংবিধানটিকে ব্রিটেন কর্তৃক সমর্থিত হতে হবে। গণপরিষদকে গণতান্ত্রিক বলা চলে না কারণ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তার নির্বাচন হয় নি। অধিকন্তু, স্বৈরতন্ত্রী দেশীয় রাজারাই, রাজ্যের জনগণ নয়, রাজ্যের পক্ষে পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারী; আর সাম্প্রদায়িক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব দিয়ে গণপরিষদে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চল ও রাজন্যবর্গের এলাকা এই দুটির চিহ্নিতকরণ বলে যে মিশনের পরিকল্পনা সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে ভাগ করেছে। তাছাড়া তা একটা দুর্বল কেন্দ্র গঠনের আহ্বান জানিয়েছে যার দরুণ জাতীয় পরিকল্পনার রচনা হবে কঠিন।

দেশের চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলো পত্রপাঠ ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশগুলো বর্জনের জন্য পরামর্শ দিল। তারা মনে করল যে প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি পরোক্ষভাবে ভারতের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য একটা সূক্ষ্ম কৌশল— দেশকে ছদ্ম-স্বাধীনতা দেওয়া ছাড়া তা আর কিছু নয়। একটা বামপন্থী সমালোচনা ছিল এ রকম:

''১৯৪৬ সালের সাংবিধানিক পরিকল্পনা ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন

উপাদানের মধ্যে জটিল ভারসাম্য তথা বিপরীত অবস্থানে সমভার রক্ষার পুরাতন পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে। বিশেষকরে সাম্প্রদায়িক বৈরিতার উপর ভিত্তি করে প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্রীয় শক্তিজোটসহ কংগ্রেসকে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এমনভাবে দাঁড় করে রেখেছিল যাতে ভারতের স্বাধীনতাদানের প্রস্তাবটাকে অকার্যকর করে দেওয়া যায় আর নিজেদের হাতে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব বজায় রাখা যায়...ব্রিটিশ সরকার তখনও পর্যন্ত ভারতীয় জনগণকে ক্ষমতা সমর্পণ করেনি। বরং তা বহুকালের অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাবলে একটা জটিল, দুর্বহ ও অনিশ্চিত প্রশাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল যা ভারতীয় 'স্বাধীনতা'র বাইরের আনুষ্ঠানিক দিকটার অন্তরালে তার পক্ষে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও রাজনীতি বিষয়ক প্রভুত্ব সুকৌশলে বজায় রাখতে সমর্থ হয়।"

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবিত পরিকল্পটি সামগ্রিক ভাবেই' থাকবে, এই ঘোষণার সাথে সাথে ব্রিটেন ও ভারতের রাজনৈতিক বোঝাপড়াও অন্তর্হিত হলো।

এদিকে যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিস্থিতির দ্রুত ক্রমাবনতি হতে থাকল। শিল্পকেন্দ্রগুলোতে শ্রমিকদের ধর্মঘট আন্দোলন গুরুতররূপে বাড়ছিল। রাজ্যগুলোর জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোতে গতি সঞ্চার হচ্ছিল ও সেগুলো ছড়িয়ে পড়ছিল। ত্রিভাংকুর, হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীরে গণসংগ্রাম গভীরতা পাচ্ছিল ও তীব্রতর হচ্ছিল।

জনগণের সংগ্রামী অংশ জাতীয় নেতাদের আপোষমূলক নীতি ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে ক্রমশই সমালোচনামুখর হয়ে উঠছিল।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ফাটল

সেই সময়কার আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দ্রুত অবনতি। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় ঘটনা, অন্তবর্তীকালীন সরকারের গঠন প্রভৃতি বিষয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যকার সংঘাত সাম্প্রদায়িক সংবেদনকে তিক্ত করেও বাড়িয়ে তুলছিল। অভূতপূর্ব হিংস্র সাম্প্রদায়িক দাংগা বাংলা বিহার ও অন্যান্য প্রদেশে বেধে গেল যার পরিণতিতে হাজার হাজার লোকের প্রাণ নষ্ট হলো। তীব্রতর সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু মহাসভা হিন্দুদের মধ্যে ক্রমবর্ধ-

মান হারে প্রভাব বিস্তার করছিল।

অবস্থার গুরুত্ব ব্রিটিশ সরকারও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। "গভীরতর সংকটের মুখোমুখি হয়ে যার সংকেত ছিল শ্রমজীবী মানুষ ও কৃষকদের সংগ্রামী অগ্রগতিতে, রাজাদের শাসনের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান আর রাজনৈতিক বিভাজন ও প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও নৈরাজ্যে—নয়া এক রাজনৈতিক বোঝাপড়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদ তার সময়সূচী ত্বরান্বিত করতে চাইল।" তাৎক্ষনিক সংকটের মোকাবিলায় কেন্দ্রে গঠিত হলো কংগ্রেস, লীগ ও শিখ প্রতিনিধিদের নিয়ে এক কোয়া-লিশন বা মোর্চা সরকার। তবে প্রতিনিধিদের মধ্যে চরম পার্থক্যের দরুণ ঠিকমত কাজ করতে কোয়ালিশন সরকার পারল না।

মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা ও ভারত বিভাগ

দ্রুত বাড়ছিল কংগ্রেস ও লীগের মধ্যেকার ফাটলটা। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে নিজেদের পার্থক্য মিটিয়ে নিয়ে একটা চুক্তিতে পেঁছাতে তারা ব্যর্থ হলো। রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতির সম্মুখীন হয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতের বড়লাট হিসেবে লর্ড ওয়াভেলকে অপসারিত করে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে বসালেন। এক নতুন পরিকল্পের জন্ম হলো যা মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা নামে পরিচিত। ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান ও মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনার মধ্যে মৌল পার্থক্য ছিল, এটাই যে প্রথমোক্ত পরিকল্পনাটি চেয়েছিল একটা ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় রাষ্ট্র কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাটির সর্তাদি ভারতের রাজনৈতিক খণ্ডীকরণের পথ প্রশস্ত করল।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ প্রথমে মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিল কেননা ওতে ছিল ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা। পরবর্তীকালে অবশ্য অনেক সন্দেহ নিয়ে তাঁরা তাকে গ্রহণ করলেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাকে মেনে নেওয়ার সময় পণ্ডিত নেহরু মন্তব্য করলেন, "মনে কোন আনন্দ নিয়ে আমি এ প্রস্তাবগুলোর প্রশংসা করছি না"। মহাত্মা গান্ধি প্রথমে প্রস্তাবগুলোর চরম বিরোধিতা করেও শেষ পর্যন্ত তাদের মেনে নেন।

দেশের বামপন্থী জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলো পরিকল্পনাটিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দেশব্যাপী জাতীয় স্বাধীনতার জন্য গণ-সংগ্রাম শুরু করার ডাক দেয়। তারা পরিকল্পনাটির ব্যাখ্যা করে এইভাবে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে যুদ্ধোত্তর কালের দুর্বল ব্রিটেনের এটি একটি রাজনৈতিক

স্ট্র্যাটেজি ও চাতুর্যভরা একটা কৌশল। উদ্দেশ্য হলো পরিকল্পনাটির মাধ্যমে ভারতকে দুটি খণ্ডে ভাগ করে পরোক্ষভাবে তার উপর নিজের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক কব্জা বজায় রাখা যাতে ভারতের এ দুটি অংশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে ব্রিটেনের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া, তারা বলল যে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ সাম্প্রদায়িকতাকে দূর করতে পারবে না বরং তা আন্তঃরাজ্য সংঘাতের উধর্ব সীমায় তুলে নিয়ে যাবে।

রক্ষণশীল ব্রিটিশরা, যারা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমর্থক, পরিকল্পনাটির মৌলিকত্বের জন্য তাকে সমর্থন করল। ব্রিটিশ পুঁজির মুখপত্র Economist ১৯৪৭ সালের ৭ই জুন এক সংখ্যায় এইভাবে লিখল, "ডোমিয়নের মর্যাদা অস্বীকৃত না হলে আনুষ্ঠানিক বন্ধনের কিছুটা থাকতে পারে ; আর যে ভাবেই হোক ব্রিটেন ও ভারতের প্রয়োজনীয় স্ট্র্যাটেজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন বিভিন্ন রাজনৈতিক আকারেও থাকবে।"

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক পরিকল্পনাটি গৃহীত হবার কারণ

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দ্বারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করার পিছনে তিনটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, মুসলিম লীগের সাথে স্বাধীন ভারতে এক-কেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য এক ঐক্যবদ্ধ দাবীর প্রশ্নে চুক্তিবদ্ধ হবার আশা কংগ্রেস নেতারা ছেড়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ফাটলটা ভারতবর্ষকে ভয়ংকর ও নির্দয় সাম্প্রদায়িক আবেগ ও দাংগা-হাঙ্গামার রণক্ষেত্রে পরিণত করছিল। তৃতীয়তঃ, R.I.N. ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমবর্ধমান গণ আন্দোলন-গুলোতে তাঁরা আশংকিত হচ্ছিলেন কেননা সেগুলো ক্রমেই হিংসাত্মক বৈপ্লবিক রূপ পরিগ্রহ করছিল।

ঘ

দেশ বিভাজনের তাৎপর্য

পাকিস্থান ও ভারত ইউনিয়ন এই দুই রাষ্ট্রে ভারত বিভাজন ভারতের জনগণের রাজনৈতিক ঐক্যকে বিনষ্ট করে দিল। তাছাড়া নতুন সমস্যারও সৃষ্টি হলো এর পরিণতিতে।

যেহেতু ভারত বিভাজন হয়েছিল জাতীয়তাবোধ কিংবা ভাষাগত ভিত্তিতে নয় বরং ধর্মীয় ভিত্তিতে তাই উভয় রাষ্ট্রেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা স্থায়ী রূপ নিল। বিভাজনের পরিণতিতে প্রধানতঃ প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর উস্কানিতে তীব্র সাম্প্রদায়িক সংঘাতের সূত্রপাত হতে থাকলো। এর ফলে বিরাট ভাবে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের বাস্তুভূমি থেকে উৎপাটিত হলো আর দেখা দিল শরনার্থীদের পুনর্বাসন; স্থানত্যাগী ব্যক্তিদের সম্পত্তি বিষয়ক ও অন্যান্য সমস্যা।

তাছাড়া, দেশ বিভাজনের ফলে ভারতীয় অর্থনীতির বিভাজন হলো যা উভয় রাষ্ট্রেরই পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াল। যেহেতু পাকিস্থান ছিল মূলতঃ কৃষিভিত্তিক, আর ভারতীয় ইউনিয়নের ভূখণ্ডগত সীমানার মধ্যে ছিল কার্যত সব শিল্প সেহেতু উভয় দেশেরই নিজ নিজ অর্থনীতির সুষম বিকাশ খুবই অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। "দেশ বিভাগ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংযুক্তিরেখা ভেদ করে ফেলল, পারস্পরিকভাবে আন্তঃনির্ভরশীল কৃষি ও শিল্পাঞ্চলগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল, বাছবিচারহীন ভাবে রেলওয়ে ও জলসেচ ব্যবস্থাগুলোকে ভেদ করল এবং সর্বভারতীয় আর্থিক বিকাশ ও ভারতের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। অধিকন্তু, দুই দেশের মধ্যে তীব্র বাণিজ্যিক ও মুদ্রাসংক্রান্ত যুদ্ধের সূচনা করলো।

দুই দেশের দুর্বল অর্থনীতির উপর শরনার্থীদের পুনর্বাসন সমস্যা প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করলো।

দুই দেশের মধ্যেকার অসুখকর সম্পর্ক উভয়েরই মধ্যে রাজনৈতিক সন্দেহ ও ভয়ের সঞ্চার করলো আর উভয় দেশকেই বিরাট সামরিক যন্ত্র বজায় রাখতে হলো। বর্তমানে ভারত ইউনিয়ন প্রতিরক্ষায় ব্যয় করছে তার বাৎসরিক আয়ের শতকরা প্রায় ৫৪ভাগ। সামরিক খাতে পাকিস্থানকেও বিরাট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। ফলে উভয় দেশের অর্থনীতির উপর বিরাট চাপ পড়ছে আর সে কারণে উভয় দেশকেই সমাজসেবামূলক কাজ ছাঁটতে হচ্ছে; অসুবিধা হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির পরিকল্পগুলোর বাস্তবায়নে।

দেশ বিভাগ কাশ্মীরের মত বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার জন্ম দিয়েছে। সেগুলোর সমাধান এখনো হয় নি। বস্তুত, দুটি দেশকেই কিছুকালের জন্য কাশ্মীরে বড় রকমের সামরিক তৎপরতাচালাতে হয়েছে। কাশ্মীর নিয়ে সমস্যা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রসংঘে প্রেরিত হলেও তা এখনও সমাধানের অপেক্ষায়। বিভাজনের ফলে সীমান্তে নানা ঘটনা ও অন্যান্য সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে।

তৃতীয় অংশ

স্বাধীনতার পর জাতীয়তাবাদ

ক

অপাত-স্ববিরোধ

ঐক্যবাদী দলের ভারত বিভাজন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ইতিহাস যা আমরা পূর্বে পর্যবেক্ষণ করেছি মানব জাতির জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর বৃহৎ এক অঞ্চল থেকে অপসারিত হয়েছে তিনটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশ (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড) বেশ কয়েকটি ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরিণতিতে। তাছাড়া, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শৃঙ্খলমুক্ত নয় এমন কয়েকটি দেশে (আলজেরিয়া, মালয়, আফ্রিকার কয়েকটি দেশ ও অন্যত্র) শক্তিশালী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম চলছে। এ সব ঘটনার রয়েছে বিরাট ঐতিহাসিক তাৎপর্য। যে সব দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে তাদের সম্মুখে এসেছে নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দরুণ অনেক নতুন ও জটিল সমস্যা—সমাধান হয় নি এমন কিছু পুরাতন সমস্যা ত ছিলই। উল্লিখিত সমস্যাগুলোর অনেকগুলো সব দেশে মামুলি হলেও কয়েকটি দেশের বৈশিষ্ট্যই হলো বিশেষ কয়েকটি সমস্যা। তাছাড়া, কয়েকটি বিষয়ে সাধারণ সমস্যাগুলোর সাদৃশ্য থাকলেও অন্যান্য বিষয়ে বৈসাদৃশ্যগুলো প্রতিটি দেশের পৃথক ও অতীতের অদ্বিতীয় বিকাশ আর যে বিশেষ উপায়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে চলে গেছে তাদেরই ফলশ্রুতি। শুধু তাই নয়। স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে ঐ সব দেশে ছিল বিভিন্ন জাতীয় পরিবেশ যা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর সমাজ গঠনকারী বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর বিভিন্ন অবস্থানের দ্বারা। এই বিপথগমন ঐ সব দেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে অবস্থিত রাজনৈতিক দলগুলোর মতাদর্শগত বিভিন্নতার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ও জনগণকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারতের মাটি ছেড়ে চলে যাওয়ার ঐতিহাসিক মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা ভারতের জাতীয়তাবাদের বিকাশ বর্ণনা করেছি। আমরা এও দেখেছি কি ভাবে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে ভারত বিভাগের ভিত্তিতে এ দেশে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল। আমরা আরও উল্লেখ করেছি কেমন করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস – যে দল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল—ভারতের ঐক্যকে বিসর্জন দিয়ে আর ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্থান এই দুটি রাষ্ট্রকে মেনে নিয়েছিল এ দেশ থেকে ব্রিটিশদের চলে যাওয়ার মূল্য হিসেবে।

রাজনৈতিক হেঁয়ালী

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এই কাজ, ভারতবর্ষ ও ভারতীয় জাতির অংগ ব্যবচ্ছেদে তার সম্মতি একটা বিস্ময়কর আপাতবিরোধী অথচ বাস্তব ঘটনার দৃষ্টান্ত কেননা বহু দশক ধরে সে নিজেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আপোষহীন সমর্থক ও প্রতিনিধি বলে জাহির করেছিল, ভারতের ঐক্যের স্বার্থে অটল ছিল, দাবী করেছিল একথা বলে যে ভারতীয় জাতি জৈবিক সত্তাবিশিষ্ট আর ভারতবর্ষকে মাতৃদেবী জ্ঞানে জাতীয় সঙ্গীত "বন্দে মাতরমে" তাকে গৌরবান্বিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্ষণকালেই সে এই মৌল ধারণাটিকে বর্জন করে এ দেশ থেকে ইংরেজদের চলে যাওয়ার, বিনিময়ে 'ভারত বিভাজনে রাজী হয়। যে দল ছিল ঐক্যবদ্ধ ও এক জাতির আদর্শের সবচেয়ে বড় সমর্থক সেই পরিশেষে এই প্রতিক্রিয়াশীল বিভাজনের বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো।

তাই প্রয়োজন আছে এই আপাতবিরোধী অথচ বাস্তব ঘটনাটির অনুসন্ধানের। জানা দরকার কোন্ কোন্ কারণে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার এতদিনের সযত্নে পোষিত মৌল প্রত্যয়ের বিপরীতধর্মী কাজ করেছিল। একটা ধ্রুপদী জাতীয় দলের এই বিস্ময়কর আচরণ ঐতিহাসিকদের সামনে একটা যথার্থ রাজনৈতিক হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো যে সব শ্রেণীস্বার্থের রক্ষক তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী গভীরতম উদ্দেশ্যগুলোর অবশ্যই এটা তুলে ধরেছে।

ঐতিহাসিকদের সামনে কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন

প্রথমেই আমরা ঐ আপাতবিরোধী অথচ বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি জটিল প্রশ্ন সূত্রবদ্ধ করতে চাই।

(১) কোন্ কোন্ উদ্দেশ্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে তার মৌলিক আপাত-দৃষ্টিতে পরিবর্তনাতীত অবস্থানের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করেছিল ?

(২) বিপরীত ধর্মী এই কাজে কোন্ কোন্ অবস্থা তাকে বাধ্য করেছে ?

(৩) কোন্ কোন্ শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠী এই ধরণের খণ্ডিত স্বাধীনতা পেতে বাস্তবিকই আগ্রহী ছিল ?

(৪) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস শর্তাধীনে যুদ্ধে অংশ নিতে প্রস্তুত ছিল আর যুদ্ধের অংগ হিংসার প্রতি তার কোন নীতিগত আপত্তি ছিল না। অথচ সেই কংগ্রেসই এ দেশে বিকাশমান গণসংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণে বিরত থাকলো। এ সব সংগ্রামের দৃষ্টান্ত হলো শ্রমিকদের ধর্মঘট, কৃষকদের সংগ্রাম, উগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন আন্দোলন, R.I.N -এর বিদ্রোহের মত সাম্রাজ্যবাদী সশস্ত্র বাহিনীতে ঘটা বিভিন্ন বিদ্রোহ। কেন এ ধরণের সংগ্রামগুলোকে এক সূত্রে বেঁধে কংগ্রেস দেশব্যাপী বিরাট এক বৈপ্লবিক সংগ্রামে রূপান্তরিত করে ব্রিটিশদের হটিয়ে দিয়ে স্বাধীনতা আদায় করে নি ? তাছাড়া, এত বড় বড় আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে সে কেন একদিকে মুসলিম লীগের চাপ ও অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চরম শর্তের মোকাবিলা করতে পারে নি ?

৫) এটাই বা কেমন যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার নিজের অনেকগুলো সংগ্রামী কৌশল যেমন অনশন, ব্যক্তিগত ও গণ সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য, অসহযোগ প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে মুসলিম লীগকে ঐক্যবদ্ধ ভারতের লক্ষ্যে প্রভাবান্বিত করতে ও দেশবিভাজনের প্রস্তাবে গ্রহণ না করে তার বিরোধিতা করাতে পারল না ? এটাই বা কেমন যে এই সব কৌশলকে গুরুত্বসহকারে ব্যবহার করাই হলো না মুস-লিম লীগের উপর চাপ সৃষ্টি করতে ও পাকিস্থান সৃষ্টির সিদ্ধান্ত থেকে তাকে সরিয়ে নিতে ? সাম্প্রদায়িক বিপদের মোকাবিলায় কেন তাকে একবারও ব্যবহার করা হলো না ? এটা কি এই জন্য যে এসব পদ্ধতির দুর্বলতা ছিল ? এটা কি এই কারণে যে এই তথাকথিত টেক্‌নিকটা শুধুমাত্র গণচাপ সৃষ্টির এক কৌশলেরই নামান্তর ছিল যাতে সুবিধা আদায়ের জন্য চুক্তিকারী নেতৃত্বের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য প্রতিপক্ষকে বাধ্য করা যায় ? এটা কি মূলত ছিল আপোষ রক্ষার একটা টেক্‌নিক মাত্র ? তাই, বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আর বিশেষ ধরণের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই কি সাফল্যের সঙ্গে এটাকে ব্যবহার করা চলে ?

(৬) স্বাধীনতা কি এদেশের জাতীয় নেতৃত্বের কাছে ছিল একটা অস্বাভাবিক

দান যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধশেষে একটা নড়বড়ে ও অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়ে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল অথবা এটা কি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (গান্ধীজীর চাপ সৃষ্টির কৌশলের) পরিণতি ?

(৭) ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের সিদ্ধান্তে সম্মত হওয়া কি যুক্তিসঙ্গত হয়েছিল ? যে উদ্দেশ্যে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা কি সত্যই সার্থক হয়েছিল ?

৮) বিরাট সংখ্যক ভারতীয় জনগণ তাদের প্রধান প্রধান সমস্যার সমাধানের প্রত্যাশায় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিল। ভারতও একটি ঐক্যবদ্ধ জাতির বিভাজন ও খণ্ডীকরণ সত্যই কি পেরেছিল সে সব সমস্যার সমাধান করতে ?

প্রচণ্ড বিতর্ক

ক্ষমতা হস্তান্তর ও তার পরবর্তী পর্যায়গুলোতে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিকাশের সঠিক উপলব্ধির স্বার্থে উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর সম্পূর্ণ উত্তর খুবই প্রয়োজনীয়। এই আপাতবিরোধী অথচ সত্য ঘটনাটির কারণগুলোর যথার্থ মূল্যায়ন ভারতীয় ইতিহাসের বিকাশের পথ নির্দেশ ও তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতার—যেগুলো স্বাধীনতা উত্তর ভারতে পরিলক্ষিত হয়েছে—এ উপলব্ধির ইংগিত দিতে পারবে।

এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ও তার তাত্ত্বিক নেতারা ভারতের ইতিহাসে এই সব সমস্যামূলক প্রশ্ন সম্পর্কে একটা অত্যন্ত প্রায়োগিক গোপন নীতি অবলম্বন করেছেন। দেশের অধিকাংশ পণ্ডিত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও এর ব্যতিক্রম নন।

আমার জ্ঞানমর্ত আমি বলতে পারি যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এই অতি বিস্ময়কর ডিগবাজি ও দেশের পক্ষে চরম ফলাফলের ব্যাখ্যায় কোন গুরুতর আলোচনা ও বিতর্ক, কোন গভীর বিশ্লেষণ কিংবা সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করা হয় নি।

'সাম্প্রতিক কালে মৌলানা আজাদের মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থ "India Wins Freedom" একটা বিরাট বিতর্কের ঝড় তুলেছে। পুস্তকটিতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন নেতাকে দেশ বিভাজনে জাতীয় কংগ্রেসকে বাধ্য করাতে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। অবশ্য এর বিরোধিতা করে ডঃ লোহিয়া তাঁর লেখা

"Guilty Men of Partition"-এ (Mankind-এ প্রকাশিত) অন্য আর এক গোষ্ঠীকে দায়ী করেছেন। এ বিষয়ে অন্যান্য যাঁরা লিখেছেন তাঁরা অবশ্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরিণতি এই সর্বনাশা ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন।

ঐতিহাসিকদের প্রধান প্রধান যুক্তিভ্রান্তি

এই ক্ষুদ্রপরিসর পুস্তকে যে সব দৃষ্টিভংগী থেকে উল্লিখিত তত্ত্বগুলোর উৎপত্তি হয়েছে সেগুলোর প্রধান প্রধান যুক্তিভ্রান্তির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। অবশ্য এক কথায় সব মতামতের প্রধান প্রধান দুর্বলতাকে গ্রন্থিবন্ধ করা যায়। এ সব তত্ত্বে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী তথা শ্রেণীস্বার্থ মূল্যায়নের প্রধান গজকাঠিটা আমাদের দেয় না। শ্রেণীবিশ্লেষণের অভাবে ঐতিহাসিকদের সেই সব কারণের ভিতরে যেতে দেয় না যেগুলোর পরিণতি হিসাবে আমরা দেখেছি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য সংগঠনের আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতধর্মী আচরণ।

জওহর লাল নেহরুর "Discovery of India"-এর মূল্যায়নে Prof. D. D. Kausambi যথার্থই বলেছেন যে "কার স্বার্থে" (cui bono) এই প্রশ্নটি তুলে ঐতিহাসিক সব চেয়ে বেশি লাভবান হতে পারতেন ; ইতিহাসের বিশেষ এক পর্যায়ে বিশেষ এক পরিবর্তন চেয়েছিলেন ও পেয়েছিলেন কোন্ বিশেষ শ্রেণী ?"[১] এ উপদেশ প্রসংগতঃ সেই সব ঐতিহাসিকের সামনে রাখা হচ্ছে যাঁরা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ নেন না।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পরীক্ষণ ও মূল্যায়নে ঐতিহাসিকদের এই ফলপ্রসূ দৃষ্টিকোণ নেওয়ার অসামর্থ কিংবা ইচ্ছার অভাব, আমার মতে, সামাজিক ঘটনাবলীর যথার্থ অনুধাবনের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বহু ঘটনার প্রায় ভাসাভাসা ব্যাখ্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ধরণের দুর্বলতা।

এই গ্রন্থে এটাই স্বীকার করেছি যে জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটা জাতি গঠনকারী বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর আন্দোলন যার উদ্দেশ্য হলো তাদের আকাংক্ষার চরিতার্থতায় সব রকমের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধার অপসারণ। একই সাথে এটা সমস্ত শ্রেণী ও গোষ্ঠীর এমন একটা আন্দোলন যা

১. D. D. Kausambi : Exasperating Essays, p. 12.

তাদের আশা-আকাংক্ষায় ইতিবাচক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সারবস্তু মেশাতে চায়। যথার্থই বলেছেন Rosa Luxumberg, "জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ হলো একটা শূন্যপাত্র যার মধ্যে প্রতিটি যুগ ও প্রতিটি দেশের শ্রেণীসম্পর্ক তাদের বিশেষ অন্তর্বস্তু ঢেলে দেয়।"

অধিকন্তু, এই বহুশ্রেণীভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যে শ্রেণী আন্দোলনের পুরোভাগে থাকে সে সেই সংগ্রামের উপর তার শ্রেণীগত ছাপটি রাখবে ও অন্যান্য শ্রেণীগুলোর স্বার্থকে নিজের শ্রেণীস্বার্থ ও আশা-আকাংক্ষার তুলনায় হীনতর করে আন্দোলনটিকে পরিপূর্ণতা দেবে। আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থ "Social Background of Indian Nationalism"-এ, বিশেষভাবে তার উপসংহারের পূর্বাভাষে সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জন করেই বলেছি যে ধনতান্ত্রিক শ্রেণীই ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে শুধু নেতৃত্বই দেয় নি তার উপর প্রভুত্বও করেছে। এ কাজ করেছে তারা তাদের চিরায়ত শ্রেণীদল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যদিয়ে যা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও কার্যক্রমিক অন্তর্বস্তু দিয়ে আন্দোলন সুরু ও তার আকার দান করেছে।

ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর ঐতিহাসিক অবস্থান

যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থান অভাব ও আকাংক্ষার মূল্যায়নে দরকার হলো ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতাগুলোর সঠিক মূল্যনিরূপণ। এরূপ মূল্যায়নের প্রয়োজনও রয়েছে তার উত্থানপতন ও পেঁচালো পথের অনুসরণটাকে বুঝবার জন্য। তখনই মাত্র আমরা বুঝতে পারবো সমকালীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনুসৃত পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন বিচিত্র স্ট্র্যাটেজি ও কৌশলগুলোকে। কংগ্রেস ভারতের ঐক্যের অদম্য নজির হয়েও কেন দেশ বিভাজনে রাজী হলো এই হতবুদ্ধিকর সমস্যাটির উপরও তা চূড়ান্ত আলোকপাত করবে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বের বুর্জোয়া শ্রেণীচরিত্র আমাদের আরও ব্যাখ্যা দেবে স্বাধীনতা-উত্তর সংবিধান ও রাজ্যগুলোর উদ্ভবগত বৈশিষ্ট্য ও কংগ্রেস সরকার কর্তৃক সূত্রবদ্ধ বিভিন্ন অর্থনৈতিক নীতি ও প্রকল্প সম্বন্ধে। পরিশেষে, ভারতীয় সমাজের উপর কেন বিশেষ দৃষ্টিগত প্রবণতা কর্তৃত্ব করছে তাও জানতে এটা আমাদের সাহায্য করবে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আপাতবিরোধী অথচ বাস্তব নীতিগুলো সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাবে এই স্বীকার্য বিষয়টির ভিত্তিতে যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এই নীতিগুলো ঐতিহাসিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় পুঁজিবাদী শ্রেণীর প্রয়োজন ও চাহিদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ও এখনও হচ্ছে।

ভারতীয় পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত আলোচনা আমরা করেছি "Social Background of Indian Nationalism"-এর বিভিন্ন অধ্যায়ে, যেমন, "আধুনিক ভারতীয় শিল্পের উদ্ভব", "আধুনিক শ্রেণীসমূহের উদ্ভব" প্রভৃতি। সংক্ষেপে আমরা প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করবো।

ঐতিহাসিকভাবে ধনতন্ত্রবাদের উদ্ভবগত পর্যায়ে ভারতীয় ধনতন্ত্রবাদের উৎপত্তি হয় নি। ইতিহাসে এর উৎপত্তি হয়েছে অনেক দেরিতে যখন বিশ্বের সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে ধনতন্ত্রবাদ একটা আংশিক ক্ষয় ও অবনয়নের যুগে এসে পড়ে। একটা দুর্বল টেক্‌নিকাল ভিত্তির উপর এর প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা গেছে; এর বৈশিষ্ট্য হলো পুঁজির অনুন্নত আংগিক গঠন আর অত্যন্ত সীমিত আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজার যা দেশের দারিদ্রপ্রপীড়িত জনগণের কম ক্রয়ক্ষমতা ও বাইরে প্রচণ্ড প্রতি-যোগিতার পরিণতি।

ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী আধা-সামান্ততান্ত্রিক ভূমধ্যাধিকারী শ্রেণীর সাথে গভীরভাবে জড়িত। ভারতীয় ধনতন্ত্রের রয়েছে এমন এক ব একচেটিয়া কাঠামো যার ভিত্তি হলো কোন শিল্পবিস্তার নয়, বরং একটা আর্থিক ফট্‌কাবাজির প্রবণতা। এই একচেটিয়া কাঠামো, যা আরও মজবুত হয়েছে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার দরুন, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে সম্পদ ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীভবনের পথ প্রশস্ত করেছে। ভারতীয় সমাজের অদ্ভুত জাত-কাঠামো ও ধনতন্ত্রবাদের বিকাশের দরুন, ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী আঞ্চলিক ভিত্তিতে কয়েকটি জাত ও সম্প্রদায়কে নিয়ে গঠিত হয়েছে। তাছাড়া, এই শ্রেণী এমন কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছে যেগুলো তার বিশেষ ঐতিহাসিক উৎপত্তি, বিকাশ ও পরি-স্থিতির ফলশ্রুতি।

ধনতন্ত্রবাদের উদ্ভবের সময়কার পুঁজিবাদী শ্রেণীগুলোর তুলনায় ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী একটা ভীরু ও অপোষমূলক মনোভাব দেখিয়েছে। জনগণের ভয়ে এই শ্রেণী বৈপ্লবিক গণআন্দোলনকে সংগঠিত করতে সাহস পায় নি। "উর্ধ্বতনদের

প্রতি অসন্তোষভরা গজড়ানো ও নিম্নতনদের ভয়ে কাঁপুনি”—এই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য। আলাপ-আলোচনার বাস্তব নীতির ব্যাখ্যার দিকেই এর ঝোঁক। ক্ষমতাসীন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আলাপ-আলোচনা ও অহিংস চাপসৃষ্টির নীতি গ্রহণ করলেও এরা জনগণের বিরুদ্ধে পীড়নমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করতেও দ্বিধা বোধ করে না যখন জনগণ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে আঘাত হানতে উদ্যত হয়।

সব অনুন্নত দেশেই, ধনতন্ত্রের অপ্রতুল বিকাশ এবং অর্থনীতি, সামাজিক সংগঠন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক উদ্ভব, এই দ্বিবিধ দোষ পরিলক্ষিত হয়। ভারতও এ দোষগুলো থেকে মুক্ত নয়। ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দরুন ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী অবশ্য ঐতিহাসিকদের বর্ণিত দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ অসমর্থ, যেমন সামন্ততন্ত্রের সম্পূর্ণ অবলোপন, সমৃদ্ধিশালী জাতীয় অর্থনীতির সংগঠন, জাতীয়তাবাদ সমস্যার সমাধান, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গণতন্ত্রীকরণ, আধুনিক জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতির সৃষ্টি প্রভৃতি।

পূর্বোক্ত গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আমরা দেখাতে প্রয়াস পেয়েছি যে ভারতীয় সমাজের মৌল সমস্যাগুলোর (অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক) সমাধান তখনই সম্ভব যখন কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলোর হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে মেহনতী মানুষদের হাতে প্রত্যর্পিত হবে।

ঐতিহাসিক গবেষণা ও অনগ্রসর জাতিগুলোর সমকালীন জীবনের অভিজ্ঞতা এই কথাই বলেছে যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ একমাত্র সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের মাধ্যমেই সম্পূর্ণ হতে পারে। যেমন সব বাহুল্য বর্জন করে Rupert Emerson বলেছেন যে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর অপনয়ন-এর সাথে সাথেই ঔপনিবেশিক বিপ্লবের পরিসমাপ্তি হয় না, বরং তখন থেকেই তা সুরু হয়।[২] বস্তুত যে, বিরাট প্রক্রিয়া তাঁর ভাষায় সমাজ বিপ্লব নামে পরিচিত তা সুরু হয় স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে যার মধ্যে থাকে শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড শ্রেণীযুদ্ধ। যদি বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা পায় তবে সে তার নিজের স্বার্থের অনুপন্থী সমগ্র অর্থনীতি, রাষ্ট্রসমাজ, সামাজিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত জীবনকে গড়ে তোলে। এই শ্রেণী, তার অবস্থানের নিয়মানুযায়ী (আধুনিক যুগের সাধারণ ধনতান্ত্রিক অবনয়ন আর অনগ্রসর সমাজে থাকার দরুন) সমাজের প্রধান সমস্যাগুলোর সফল সমাধানে ঐতিহাসিক সামর্থ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। তার নিজের

২. Rupert Emerson : Representative Govt. in South-East Asia.

অকার্যকর নীতিগুলো সামাজিক সংকটকে আরও বাড়িয়ে তোলে যার পরিণতিতে শ্রেণীগত ও অন্যান্য সামাজিক সংঘাত তীব্রতর হতে থাকে। এ সব নীতি পুঁজির একত্রীকরণ ও কেন্দ্রীভবনকে ত্বরান্বিত করে আর জনগণের বৃহৎ অংশ ও নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক ও সামাজিক দুর্দশাকে বর্ধিত করে দ্রুত শ্রেণীগত মেরুভবনের পথ প্রশস্ত করে। পরিস্থিতি দিনের পর দিন বিস্ফোরক হয়ে ওঠে। সামাজিক সংকটের গভীরতা ও সামাজিক সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রেণীশাসনের দমন নীতির প্রয়োজন অনুভব করে আর তাই ক্রমবর্ধমানহারে সে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাগুলোকে বিসর্জন দিয়ে স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলোর আশ্রয় নেয় (বার্মা, পাকিস্তান প্রভৃতি)। যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগীর বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে তা পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয়-অতীন্দ্রিয়বাদী ভাবাদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করে। জনগণের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাভাবনা ও আবেগের সূচি প্রয়োগের মাধ্যমে এই শ্রেণী তাদের বশীভূত করে রাখে। এরা ভলটেয়ারের পরামর্শটাকে মেনে চলে—যদি ঈশ্বর নাই থাকে তবে জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে তাঁকে আবিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ভারত ইউনিয়নের ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও পাকিস্তানের দুর্বল সামন্ততান্ত্রিক পুঁজিবাদী শ্রেণীর দল মুসলিম লীগের হাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তর নিজ নিজ দেশে ক্ষমতাসীন শ্রেণীর এই দলগুলোর সামনে অসংখ্য সমস্যা নিয়ে এসেছিল।

অবশ্য আমরা স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারত ইউনিয়নের নানা ঘটনার পর্যবেক্ষণেই প্রয়াসী হবো।

খ

ক্ষমতা হস্তান্তর—সাংবিধানিক কৌশল, রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলশ্রুতি নয়

আমরা সংক্ষেপে দেখবো কেমন করে উল্লিখিত ঘটনাবলীর প্রবণতাগুলো ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ও তারই ছাঁচে গড়ে তোলা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিণতিতে নিজেদের প্রকাশ করেছে। আমরা সংক্ষেপে অথচ স্পষ্ট করে দেখাবো কেমন করে ভারত ইউনিয়নের ভাগ্যের তত্ত্বাবধায়ক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঐতিহাসিকভাবে সেকেলে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণে জনগণের আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক-কৃষ্টিগত জীবনকে গড়ে তুলতে চেয়েছে ও সেই কারণেই ভারতীয় সমাজকে জটিলতর সামাজিক সংকট, তীব্রতর সামাজিক সংঘাত এবং আরও বিস্ফোরক পরিস্থিতির আবর্তে নিমজ্জিত করেছে। এর গৃহীত নীতিগুলো শুধু-মাত্র বাড়িয়ে তুলেছে বিরোধ ও বৈরিতা যেগুলো ব্রিটিশ রাজত্বকালে ভারতীয় সমাজে অর্ধসুপ্ত অবস্থায় ছিল অথচ স্বাধীনতা-উত্তর বছরগুলোতে বুর্জোয়া শাসনে তারা গতিপ্রাপ্ত হয়। এর কারণ হলো যে ব্রিটিশ শাসনে একটিমাত্র জাতীয় শত্রুর উপস্থিতি জাতীয় ঐক্যের জরুরী প্রয়োজন ও জাতীয় মুক্তির জন্য সংঘবদ্ধ সংগ্রামের স্বার্থে সংঘাতগুলোকে (শ্রেণীগত, আঞ্চলিক প্রভৃতি) দাবিয়ে রেখেছিল।

আমরা এখন খুবই সংক্ষেপে স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতীয় সমাজে যে সব প্রধান প্রধান ঘটনা ঘটছে তাদের পর্যা-লোচনা করবো।

ক্ষমতা হস্তান্তর—একটা সাংবিধানিক কৌশল, তার তাৎপর্য

আমরা প্রথমে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টি দেবো।

আমরা পূর্বে যেমন দেখলাম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় নি। কংগ্রেস ক্ষমতা পেয়েছিল ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক তার নিজের কাছে সার্বভৌমতা হস্তান্তরের পরিণতিতে আর তাও পেয়েছিল মাউণ্ট-ব্যাটেন পরিকল্পনার সর্তাবলীর উপর ভিত্তি করে; যেমন, ব্রিটিশ ভারতের কিছু অঞ্চল ছেড়ে দেওয়া (যে অংশগুলো নিয়ে পরবর্তীকালে পাকিস্তানের ভূখণ্ড গঠিত হয়) সামন্ততান্ত্রিক ভারত গঠনকারী দেশীয় রাজ্যগুলোর ভারত অথবা পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত হবার সুযোগ দান প্রভৃতি। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল একটা সাংবিধানিক কৌশল। এটা কোন বিজয়গৌরবে ভূষিত রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলশ্রুতি ছিল না যার প্রক্রিয়ায় নতুন ধরণের সংগ্রামের সূচনা হয় ও পরবর্তীকালে নয়া রাষ্ট্রকাঠামোর ইউনিট হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ, জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে সুরু করা সংগ্রামের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তার নেতৃবৃন্দ স্বাধীন ভারতের ভাবী রাষ্ট্রব্যবস্থার উপযুক্ত কাঠামোর সমস্যাদি নিয়ে মাথা ঘামায় নি।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও তার নেতারা, যাঁরা বুর্জোয়া উদারনৈতিক দর্শনে মানুষ হয়েছিলেন, মুখ্যত ব্রিটিশ ছাঁচে ঢালা বুর্জোয়া সংসদীয় সরকারের বিকল্প কোন রাষ্ট্রের কথা স্বপ্নেও ভাবেন নি। রানাডে ও গোখেল থেকে সুরু করে ভারত ইউনিয়নের সংবিধান প্রণেতাগণ পর্যন্ত কাউকেও দেখা যাবে না যিনি ভারতের প্রয়োজনের সংগে সংগতিপূর্ণ কোন নতুন ধরণের রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মৌল তাত্ত্বিক ধারণা দিতে পেরেছেন। অথচ ভারত একটা অনগ্রসর ঔপনিবেশিক দেশ (তার নিজের বিশেষত্ব সহ) হিসেবেই বেরিয়ে এসেছিল স্বাধীন সার্বভৌম সত্তা নিয়ে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বরাবরই চেয়েছিল ও সংগ্রাম করেছিল আলাপ-আলোচনা ও দরাদরির মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে আর জনগণের চাপকে ব্যবহার করেছিল শুধুমাত্র আলাপ-আলোচনার ধারটাকে জোরদার করতে। সে কোনদিনই সংগ্রামের উপযুক্ত পদ্ধতিগুলোকে নিতে চায় নি অথচ এগুলোই ছিল সাম্রাজ্যবাদ উৎখাতের পক্ষে উপযুক্ত আর স্বাধীনতার পর হতে পারতো ক্ষমতার অংগ; যেমন, পুরাতন রাষ্ট্রকাঠামো ও শাসনযন্ত্রের পরিবর্তে স্বাধীন ভারতের নয়া রাষ্ট্রকাঠামোর ইউনিট। যেমন G. L. Mehta বলেছেন, "ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল সাংবিধানিক বিপ্লবের প্রকৃতিবিশিষ্ট; সরকার কিংবা প্রশাসনের অচলাবস্থায় কোন ব্যাপার নয় যেমনটি ঘটে প্রচণ্ড কোন বিপর্যয়ের পর। ভারতের কথা মনে

করে বলতে হয় যে কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন আইন ও শাসন-বিভাগে তিন দশক ধরেইত ক্ষমতা হস্তান্তর চলছিল। এদেশে ছিল একটা প্রশাসনিক যন্ত্র, সুদক্ষ ও অনুগত সেনাবাহিনী, শিল্প ও বাণিজ্য, পৌর সংস্থাগুলোও তাদের রাজনীতি আর একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী।"[১]

১. P. W. Thayer (Ed) : Nationalism and Progress in free Asia, p. 109.

গ

বুর্জোয়া জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের উদ্ভব

স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্র কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্য

সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হয় নি এমন একটি গণ-পরিষদের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সংবিধান রচনা করে। সংবিধানের প্রধান প্রধান অংশগুলো ছিল নিম্নরূপ :

(১) ভারত ইউনিয়ন ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে পরিচিত হবে।

(২) ভারত হবে শক্তিশালী কেন্দ্র নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অবশ্য ব্রিটিশ সরকারের পাশ করা ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের মধ্যেও দেখা যাবে যে আইনও চেয়েছিল ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তুলতে। ভারত ইউনিয়নের মৌলিক আঞ্চলিক ইউনিটগুলো জরুরী প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন ভাষাগত নীতিতে চূড়ান্তভাবে গঠিত হবে।

(৩) সংবিধান তার প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতিগুলোর মধ্যে একটি উত্তম সমাজের ধারণা লিপিবদ্ধ করে।

(৪) এই সংবিধান জাত. সম্প্রদায়, বর্ণ ও স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সাম্যের নীতি ঘোষণা করেছে।

(৫) নাগরিকদের জন্য পৌর স্বাধীনতা দিলেও সংবিধানে লিপিবদ্ধ পৌর স্বাধীনতার অনুচ্ছেদগুলো এমন সব শব্দে মোড়ানো আর এমন সব 'যদি' ও সীমাবদ্ধতায় ভরা যে রাষ্ট্রের হাতে প্রদত্ত চূড়ান্ত ক্ষমতা বলে শুধু পৌর স্বাধীনতাই নয়, সংবিধানকেও মুলতুবি করে দিতে পারে।

(৬) সংবিধান শাসন বিভাগকে বিভিন্ন স্তরে বেশ কয়েকটি বিরল ক্ষমতা

দিয়েছে আর সংকটকালে ব্যবহারযোগ্য চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়েছে রাষ্ট্রপতির হাতে।

(৭) শাসনতন্ত্র ভারতীয় জনগণের উপর আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক সৃষ্ট প্রশাসনিক যন্ত্রটাকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে বজায় রেখেছিল। এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যেমন, নিম্নতর জেলা পর্যায়ে শাসন ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার সমন্বয়, যার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শাসনে জাতীয় কংগ্রেস প্রচণ্ডভাবে সোচ্চার ছিল, স্বাধীনতার পরও সংবিধানে রাখা হয়েছিল। এখনও নিম্নতর স্তরগুলোতে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে বিচ্ছিন্ন করার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। ব্রিটিশ যুগ থেকে পাওয়া প্রশাসনিক যন্ত্রের গণতন্ত্রীকরণ এখনও করা হয় নি।

(৮) সংবিধান সংসদীয় গণতান্ত্রিক সংস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সরকারের কাঠামোর মৌল আইন লিপিবন্ধ করছিল।

(৯) সংবিধান নাগরিকদের সম্পত্তির মৌলিক অধিকারের গ্যারাণ্টি দিলেও কাজের অধিকার দেয় নি।

একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্র

সংবিধান বুর্জোয়া সম্পত্তিগত অধিকারের গ্যারাণ্টি দিয়ে সংবিধানের চূড়ান্ত চরিত্র লাভ করেছে। রাষ্ট্রও সংবিাধানের এই মৌল নীতির সংগে সামঞ্জস্য রেখে যুক্তি-সংগতভাবেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

যেমন Prof. Laski লিখেছেন, "যে কোন রাষ্ট্র যাতে রয়েছে সম্পত্তির ব্যক্তি-গত মালিকানা বাস্তবে তাতে পক্ষপাতিত্বপূর্ণ ভার থাকবেই। সর্বজনীনভাবে এই রাষ্ট্র অধিকারের ঘোষণা করলেও তা সম্পত্তির মালিকদের তাদের কার্যকরী ভোগের মধ্যে তাকে সীমাবন্ধ করে রাখে। এরই আলোকেই আনুগত্যের প্রতি এর দাবী তাকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতার নামান্তর; এ ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নৈতিক ভিত্তি বর্জিত—স্পষ্টতই এটা তার সদস্যদের বোঝানোর ক্ষমতার একটা দায়িত্ব যে অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থার তুলনায় তাদের ভাগ্য এ শাসনেই ভাল। এ সামর্থ, আমার যুক্তি অনুযায়ী, সর্বদাই নির্ভর করবে রাষ্ট্রের সামনে উপস্থাপিত দাবীগুলো পূরণ করবার ক্ষমতার উপর।"[১]

১. H. J. Laski, The State in Theory and Practice, p. 211.

রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপের তাৎপর্য

রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রের সমস্যাটা আমরা তুললাম এই কারণে যে এই প্রধান সমস্যাটি সাধারণভাবে আমাদের দেশের রাজনৈতিক চিন্তানায়কদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি।

ভারত ইউনিয়নের শ্রেণীপ্রকৃতির মূল্যায়নে খুব প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা নেওয়া হয়নি। কোন গুরুতর বিতর্কিত আলোচনা, একটি সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে, করা হয় নি। সেটি হলো এই যে কেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সর্বদাই শ্রমের মর্যাদাকে গৌরবান্বিত করেও সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে ঘোষণা করেছিল অথচ স্বাধীনতার পর রচিত সংবিধানে কাজের অধিকারকে সে মর্যাদা দেয় নি। বস্তুতঃ, যে দেশের শহরে ও গ্রামাঞ্চলে বেকারের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ সে দেশে সংবিধানে কর্মের অধিকার ঘোষণা অতীব প্রয়োজনীয়। কাজের অধিকার (যা বেঁচে থাকারই প্রাথমিক সর্ত) সম্পত্তিহীন নাগরিকদের মৌল অধিকার, আর তাই জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান বলে দাবীকারী রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য। অপরদিকে, সম্পত্তির অধিকারের গ্যারাণ্টি দিয়ে সে সম্পত্তিশালী সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রধান অধিকারের রক্ষক বলে পরিচিত হয়েছে।

তার নিজের স্বীকৃতির মাধ্যমেই সে সম্পত্তির মালিকশ্রেণীর, তথা ভারতের পুঁজিবাদী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে।

অধ্যাপক ল্যাস্কির সুচিন্তিত অভিমত

রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রের মূল্য নিরূপণের প্রয়োজনের উপর অধ্যাপক ল্যাস্কির গুরুত্ব আরোপ গভীরভাবে বিবেচনার দাবী রাখে। সাধারণত, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় এ দিকটায় কচিৎ দৃষ্টি দেওয়া হয়। রাষ্ট্র সম্পর্কে ল্যাস্কি মন্তব্য করেছেন, "রাষ্ট্র, আমাদের যুক্তিতে, শ্রেণীর উর্ধে নয়। বিশেষ শ্রেণী স্বার্থকে তা অতিক্রম করতে আর সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের প্রতিচ্ছবি হতে সে অসমর্থ। নাগরিকদের ইচ্ছার বাস্তবায়নের পথে তা এগোতে অক্ষম। মানুষকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার প্রয়াসে, তার আবশ্যকীয় দাবীদাওয়া মেটাতে সে চেষ্টা করে না। চাহিদার সম্পূর্ণ সন্তোষবিধানে উপযুক্ত ও অবশ্য প্রয়োজনীয় পরিমণ্ডলের সংরক্ষণে সে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করে না। সামগ্রিকভাবে সে নর-নারীর সেবা ও কল্যাণ-বিধানে নিয়োগ করে তার ক্ষমতাকে বিধিবদ্ধ করে না।

"এ দৃষ্টিকোণ হতে তাহলে রাষ্ট্রের প্রকৃতি কি? রাষ্ট্র হলো সার্বভৌম পীড়নমূলক একটা ক্ষমতা যা ব্যবহৃত হয় কোন নির্দিষ্ট সমাজের অন্তর্ভুক্ত মৌলিক নীতির ফলাফলগুলোকে রক্ষা করতে। ··· যদি রাষ্ট্রের স্বীকৃত নীতি হয় ধনতান্ত্রিক তাহলে যুক্তি অনুযায়ী অবশ্যই তা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপযোগী সর্তগুলোকেই রক্ষা করবে। এর অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্র চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পরীক্ষাগারে উদ্ভূত ধনতন্ত্রবাদের তাত্ত্বিক ধারণাকে সংরক্ষিত করবে। এর সহজ মানে হলো এই যে রাষ্ট্র সমাজ কল্যাণের সেই সব ধারণাকেই রক্ষা করবে যেগুলোকে পুঁজিবাদীরা সেই সমাজের অনুমিতিগুলোকে উপস্থাপিত করে যেগুলোতে তাদের প্রধান প্রধান স্বার্থসিদ্ধি হয়। পুঁজিবাদী সমাজে তাই রাষ্ট্রক্ষমতা সমাজ কল্যাণের ধনতান্ত্রিক ধারণার সংগে সমবিস্তৃত হবে। এসব ধারণার সংগে ঐক্যমত নাও থাকতে পারে, তবে একমাত্র একটি পথেই এরূপ ভিন্নমত সামাজিক ক্রিয়ার প্রধান নীতি বলে স্বীকৃত হতে পারে—তা হলো সমাজের ধনতান্ত্রিক ভিত্তির রূপান্তর। আর, যেহেতু রাষ্ট্র এই বনিয়াদটারই রক্ষণাবেক্ষন করে, প্রয়োজনে সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্য নিয়েও, সেহেতু এটা বলা যায় যে রাষ্ট্রকে ভিন্নমত দিয়েই অধিকার করতে হবে যদি সমাজের ভিত্‌টাকে পাল্‌টানোর ইচ্ছা থাকে।"[২]

আরও বলা হয়েছে—

"এই ঘটনাটাই আধুনিক রাষ্ট্রে এটাকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে যে তার সশস্ত্রবাহিনী শুধুমাত্র সরকারের প্রতিই দায়িত্বশীল থাকবে। কারণ, একবার সরকারের কাছে তাঁদের আনুগত্য যদি ধরে নেওয়া যায় তবে তা সামগ্রিকভাবে না হলেও অবাধে তার যে কোন সিদ্ধান্তকে সাধারণ নাগরিকদের উপর চাপিয়ে দিতে পারবে। বাস্তবে সাম্প্রতিক অবস্থায় জনগণ নিরস্ত্র ও রাষ্ট্রের অনুপাত অনুযায়ী নিজেদের অস্ত্রসজ্জিত করার সামর্থ থাকে না বলে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্নমতকে আত্মরক্ষামূলক করে রাখে। সেই কারণে আধুনিক কালের বিপ্লবগুলোর সাফল্য সশস্ত্রবাহিনীর মনোভাবের উপর নির্ভরশীল। অধিকন্তু সেই একই কারণে এটা খুবই অর্থপূর্ণ যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সশস্ত্র বাহিনীর প্রাধিকারপ্রাপ্ত পদগুলো বিপুলসংখ্যায় পুঁজিবাদী শ্রেণীর লোকজনরাই পেয়ে থাকে। এদের মতাদর্শগত দৃষ্টিভংগী যে সরকারের অধীনে তারা কাজ করে তার প্রতিই তাদের আনুগত্যের স্বাভাবিক গ্যারান্টির দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। সমাজে সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে বলপ্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের স্বতন্ত্রীকর তার আইন শৃংখলা বজায় রাখার পক্ষে

২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২০৪-৫

প্রয়োজনীয় যাতে সম্পত্তি ব্যবস্থার অসম স্বার্থ বজায় থাকে।"[৩]

আমরা এ সমস্যার বিশদ আলোচনা করেছি ও বিস্তৃতভাবে অধ্যাপক ল্যাস্কিকে উদ্ধৃত করেছি কেননা আমাদের দেশের তাত্ত্বিক ও শিক্ষাবিদরা এই গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ হতে খুব কমই ভারত ইউনিয়নের রাষ্ট্রচরিত্রকে পরীক্ষা করেছেন। শাসনযন্ত্রের অপ্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর বিশদ আলোচনাও হয়েছে।

রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা ও রাজনৈতিক দলের নেতারা সংবিধানের কাঠামো ও কিছু গহ্বরযুক্ত সরকারী যন্ত্রের সমালোচনা করলেও ভারত ইউনিয়নের বিশেষ শ্রেণীচরিত্রের প্রধান সমস্যাটির আলোচনা হয়নি বললেই চলে। বুর্জোয়া সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের গ্যারাণ্টির ও আদালতে বলবৎযোগ্য নয় এমন একটা নির্দেশাত্মক নীতিতে কর্মসংস্থানের অর্থকরী পেশা আশ্বাসকে এক গৌণ অবস্থায় ঠেলে রাখার পূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যকে পুরোপুরি পরীক্ষা করা হয় নি। ভারতের মত ধনতান্ত্রিক-গণতন্ত্রের অর্থ বিরাট যেখানে পুঁজিবাদী অর্থনীতি দুর্বল ও অনুন্নত অন্তত: দুটি কারণে ; যেমন, ইতিহাসে এর বিলম্বিত উৎপত্তি ও প্রায় সেদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্বের দরুন তার প্রতিবন্ধ উন্নতি।

একটি বুর্জোয়া জনকল্যাণকর রাষ্ট্র

তাছাড়া, সম্পত্তির অধিকারকে গ্যারাণ্টি দিয়ে যা পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষের উন্নতিবিধানের নীতির (শুধুমাত্র নির্দেশ হিসেবে) দ্বারা দৃঢ়তর হয়েছে, আমাদের সংবিধান শুধুমাত্র একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রেরই নয়, একটা বুর্জোয়া জনকল্যাণকর রাষ্ট্রেরও ভিত্ রচনা করেছে যাকে ল্যাস্কি বলেছেন সমাজ সেবাব্রতী রাষ্ট্র। এর অর্থ দুটি, যেমন, (১) রাষ্ট্র শুধুমাত্র আইন শৃংখলা রক্ষার নেতিবাচক দায়িত্ব পালনকারী পুলিশ রাষ্ট্র হবে না ; বরং সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে সমাজ সেবার ইতিবাচক দায়িত্বও নেবে।

দুটি বিকল্প

এটা দুটো সমস্যার কথা বলে। রাষ্ট্র কি পারবে পুঁজিবাদী আর্থিক কাঠামোর মধ্যে বসবাসকারী জনগণকে পর্যাপ্ত সমাজসেবা দিতে যাতে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত দোষগুলো দূরীভূত হয় ? দ্বিতীয়ত যে জনগণ ক্রমাগতই ন্যায্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া তুলছে যেগুলো পূরণ করা সম্ভব একমাত্র

৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ : পৃঃ ২০৫-৬

পুঁজিবাদী সমাজসেবা ও মজুরিশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যের বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনে, তাদের মধ্যে আশার সঞ্চার করে পুঁজিবাদী সমাজসেবা রাষ্ট্র একটা প্রায় অসাধ্য সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। হয়, তাকে পর্যাপ্ত আর্থিক সম্পদের অভাবে সমাজ সেবার কাটছাঁট করতে হবে আর মারমুখী জনগণের সংগ্রামের সামনে দ্রুত গণতন্ত্রকে পরিহার করে ফ্যাসিবাদী অথবা সামরিক একনায়কত্বের দিকে ঝুঁকতে হবে ; আর নয়ত সংবিধানকে পরিবর্তন করতে হবে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক বনিয়াদের ভিতরেই বিপ্লবের মাধ্যমে, যে বিপ্লব হবে অবশ্য সমাজের সম্পত্তি সম্পর্কে।

কোন রাষ্ট্র—যার বিবর্তনে রয়েছে পুঁজিবাদী সমাজের স্থায়িত্ব ও স্থিতি রক্ষার প্রয়াস আর যা তার আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ আর সশস্ত্রবাহিনী ও পুলিশকে নিয়ে পুঁজিবাদী সম্পত্তি সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণে বিস্তৃত সরকারী কাঠামো তৈরী করেছে—সেই ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়ার মাধ্যম হতে পারে ? অথবা, সে কি গণতন্ত্রের ঝালরটা অপসারিত করে একনায়কতন্ত্রে নিজেকে অবিচলভাবে রূপান্তরিত করে নেবে ?

অধ্যাপক ল্যাস্কির নিম্নে প্রদত্ত গভীর মন্তব্য সযত্ন বিবেচনার যোগ্য ঃ

একথা বলাই যথেষ্ট যে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের অনিশ্চিত ব্যাপারটা ছাড়া পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের সমস্যাটার সমাধান হতে পারে হয় ধনতন্ত্র কিংবা গণতন্ত্রের দমনের মাধ্যমে। প্রথমটির অর্থ হবে উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে যৌথ মালিকানা আর সেই পরিবর্তনের সহজাত বৈশিষ্ট্য হলো শ্রেণী ও অনন্য অনুরূপ সমাজ সম্পর্কের রূপান্তর। এর আরও অর্থ হলো আমাদের জীবনধারণ পদ্ধতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন যার তুলনা চলে নিগূঢ়ভাবে ষোড়শ শতক কিংবা অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি অভিজাততন্ত্রের অচলাবস্থার পরিণতিতে পরিদৃষ্ট পরিবর্তনের সঙ্গে। তবে এ কথা ঠিক যে গণতন্ত্রের দমনে শ্রেণীসম্পর্কে এই ধরণের মৌল পরিবর্তনের সূচনা হবে না।"[৪]

সমকালীন ইতিহাসের শিক্ষা

এই আলোচনার সূত্রপাত করেছি নিম্নে বর্ণিত অর্থপূর্ণ তথ্যের উপর দৃষ্টি ফেলার জন্যই ঃ

৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ ; পৃঃ ২০৩

(১) একটা সমর্থক কল্যাণ-রাষ্ট্র কোন অধি-শ্রেণী রাষ্ট্র নয়।

(২) প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রও কোন অধি-শ্রেণী কিংবা সালিশ রাষ্ট্র নয় সেখানে সমাজটাই উৎপাদনের ব্যক্তিগত মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত আর তার পরিণতিতে রয়েছে একটা শ্রেণী কাঠামো।

(৩) ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে একটা মডেল বলে আদর্শমণ্ডিত করা অথবা রাষ্ট্র ও সরকারের কাঠামোর একমাত্র উপযুক্ত ধরণ বলে মনে করাটাই ঐতিহাসিকভাবে প্রতিপাদনের অযোগ্য আর তা অজ্ঞানতাবশত শ্রেণীভিত্তিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের যুক্তিসিদ্ধকরণের নামান্তর।

(৪) সর্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত ইতি-বাচক জনকল্যাণকর রাষ্ট্র পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত ত্রুটিগুলোর দূরী-করণে এক যথেষ্ট কার্যকরী উপায়—এই দাবীটাই অনঙ্গীকৃত আর তার পিছনে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কোন সমর্থনও নেই।

পশ্চিম ইয়োরোপীয় ও উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো ও সাম্প্রতিক কালের সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক অধিপত্যমুক্ত সদ্যস্বাধীন দেশগুলোর ইতিহাস অনু-সন্ধান একটা শিক্ষণীয় বস্তু।

জার্মানী, ইটালী, স্পেন ও দ্য গলের ফ্রান্স স্পষ্টই দেখিয়েছে যে কত সহজ-ভাবে একটা পুঁজিবাদী গণতন্ত্র সরাসরি একনায়কতন্ত্রে পরিবর্তিত হতে পারে যখন বুর্জোয়া শ্রেণী মনে করে যে তাদের শ্রেণীভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তাদের মৌল স্বার্থের প্রতিবন্ধক।

বেশ কিছু সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র যেখানে বিভিন্ন মাত্রায় গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও সামরিক একনায়কত্বমূলক শাসন দ্রুত কায়েম হয়েছে আর সকল অর্ধোন্নত দেশ যেখানে সামরিক শাসন বলবৎ হয়নি অথচ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ব্যাপক ছাঁটাই হয়েছে—তারা একই সত্যকে প্রমাণ করে। শাসনকারী শ্রেণীগুলো গণতান্ত্রিক ঝালর পরানো ব্যবস্থাটাকে প্রচলিত শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার সহজ কার্যকারিতা ও কখনও তার অস্তিত্বের সঙ্গে বেমানান মনে করে।

পৌর স্বাধীনতার দ্রুত আনয়ন ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর রাষ্ট্রের শাসনবিভাগের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ—এমন কি ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বনেদী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও—একই বাস্তব সত্যটাকে প্রকাশ করছে।

বুর্জোয়া জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের আসল কাজ

জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরাসরি ও সুনির্দিষ্ট হস্তক্ষেপ জনকল্যাণমূলক কাজের নানা প্রকল্পের বোঝা থেকে তাকে অব্যাহতি দিচ্ছে। অবশ্য সে সব প্রকল্পের কাজ যে আর্থিক দুর্বলতার দরুন সে হাতে নিতেও পারছে না। রাষ্ট্র নিজেও পুঁজিবাদীদের সক্রিয় আর্থিক সমর্থন দিয়ে চলে আর তাদের উপযোগী করব্যবস্থাও তৈরী করে। তাছাড়া, সে জাতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ রচনা করে (রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী খাত) যা মূলতঃ ব্যক্তিগত উদ্যোগেরই সাহায্য, পরিপূরণ ও শক্তিবর্ধনে যায়। এরূপ রাষ্ট্র তীব্র পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘট ও অন্যান্য ধরণের সংগ্রামের মোকাবিলায় নানা শাস্তিমূলক কৌশলও উদ্ভাবন করে (বাধ্যতামূলক সালিশীর মত ব্যবস্থা, ধর্মঘটের অধিকার প্রভৃতিতে আরও সংকোচনকারী বাণিজ্য বিরোধ আইন প্রয়োগ প্রভৃতি)। সেই কারণে পুঁজিবাদী জনকল্যাণ রাষ্ট্র মূলতঃ পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে।

তাই আমরা দেখতে পাই যে ধনতান্ত্রিক-গণতন্ত্রে ধনতন্ত্রবাদের আনয়নকালে একটা অদ্বিতীয় ঘটনা ঘটে। কোন কোন দেশে রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমানহারে পরিহার করে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক বজায় রাখতে একনায়কতন্ত্রের দিকে ঝোঁকে। অন্যান্য দেশে রাষ্ট্র ইতিবাচক সমাজ কল্যাণ রাষ্ট্রের ভূমিকা নেয় আর সক্রিয়ভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থানচ্যুতি ও অচলাবস্থা প্রতিরোধে যা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে পুঁজির চরম কেন্দ্রীভবন ও সঞ্চয়ন ও শ্রেণীর মেরুভবনের পরিণাম, বাধা দেয়।

যেমন Prof. Laski, Prof. Saville ও খ্যাতিমান কয়েকজন রাষ্ট্রনীতিবিদ্ দেখিয়েছেন যে নেতিবাচক বুর্জোয়া পুলিশ রাষ্ট্র যা আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় আপন দায়িত্বকে সীমিত রাখে, সমাজসেবা কিংবা কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিবর্তিত হয়েও বুর্জোয়াদের শ্রেণীভিত্তিক রাষ্ট্র হওয়া থেকে বিরত থাকে না। এ পরিবর্তন শুধু পুঁজিবাদী শ্রেণীর নিজের অবস্থা থেকে পরিবর্তিত চাহিদাগুলোর কথা বলে যে পরিবর্তন অবাধ ধনতন্ত্র থেকে একচেটিয়া পুঁজিবাদে রূপান্তরের নামান্তর।

কংগ্রেস সরকারের সামনে প্রধান প্রধান সমস্যা

সীমিত নির্বাচনমণ্ডলী দ্বারা গঠিত গণপরিষদের মাধ্যমে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের

তৈরী রাষ্ট্রকাঠামো একটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কল্যাণকর রাষ্ট্র মাত্র আর বিশ্বের অন্যান্য অংশে বিদ্যমান পুঁজিবাদী দেশগুলোর অনুরূপ সমস্যাগুলো এদেশের সামনেও এসে দাঁড়িয়েছে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ভারত ইউনিয়নের সরকারের আর্থ-রাজনীতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নীতিগুলো আর বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সেগুলোর প্রতি প্রতিক্রিয়া ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সারবস্তু গঠন করে।

এখন আমরা সংক্ষেপে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত প্রধান প্রধান নীতি ও স্বাধীনতা উত্তরকালে কংগ্রেস সরকার কর্তৃক সেগুলোর বাস্তবায়নের কথা বলবো।

ঘ

রাজনৈতিক প্রবণতা

রাজনৈতিক কাজ

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকারের সামনে এসেছিল নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান সমস্যা :

(ক) সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলোর অন্তর্ভুক্তি।

(খ) আঞ্চলিক রাজ্য ইউনিটগুলোর পুনর্গঠন।

(গ বিদেশী পকেটগুলোর অবলোপন।

(ঘ) মানানসই ঐতিহ্য ও রীতিনীতি সৃষ্টি ও সরকারী যন্ত্রের নমুনার সম্প্রসারণ যা আইন শৃঙ্খলাকে সুনিশ্চিত করবে যখন শিল্পায়ন ও কৃষি পুনর্গঠনের বিভিন্ন প্রকল্পগুলোকে বাস্তবায়িত করা হবে। তাকে উদ্ভাবন করতে হয়েছিল এমন সব পদ্ধতি ও কৌশল (শ্রমবিরোধ প্রভৃতির মীমাংসা, সালিশ ইত্যাদি) যাতে এই সব পরিকল্পনার ভারবহনকারী জনগণের বিভিন্ন অংশের অসন্তোষ এমন আচরণের পথ না দেখে যা পরিকল্পনাগুলোর রূপায়ণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এটার প্রয়োজন ছিল বিশেষতঃ এই কারণে যে ভারতীয় জনগণের সব শ্রেণীরই মনে এ আশা এমন কি এ প্রতীতি ছিল যে স্বরাজ তাদের সব সমস্যার সমাধান এনে দেবে আর উচ্চতর একটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তরে তাদের পেঁছে দেবে।

(ঙ) আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সদ্য স্বাধীন সার্বভৌম শক্তিহিসেবে ভারতের মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিষ্ঠা।

সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলোর অন্তর্ভুক্তি : তার কৌশল ও কারণসমূহ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে নিয়ে সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলোর

সংযুক্তিকরণের সমস্যাটার মীমাংসা করেছিল দক্ষতা ও দৃঢ়তা নিয়ে। দেশীয় রাজ্য-গুলোর বিলোপ ও ভারতীয় ইউনিয়নে তাদের ভূখণ্ডীয় সংযোজনের বিশদ ছবি Shri V. P. Menon তাঁর গ্রন্থ "Integration of Native States"-এ দিয়েছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনে গৃহীত কৌশলের প্রধান স্থপতি হিসেবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্বীকৃতি পেয়েছেন।

নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে উক্ত কৌশলকে কাজে লাগানো হয়েছিল ঃ

(১) অপেক্ষাকৃত বড় রাজ্যগুলোর রাজাদের সাথে আলাপ-আলোচনা যাতে তারা বড় রকমের 'সালিয়ানা' ও টাকার থলির প্রলোভনে সংযুক্তিকরণে রাজী হয়।

(২) দেশীয় রাজ্যগুলোকে গণ আন্দোলনের হুমকি দেখানো, যে সব আন্দোলন কংগ্রেস নেতাদের নেতৃত্বে তীব্রতর হচ্ছিল।

(৩) কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশীব্যবস্থা গ্রহণ, যেমন হায়দ্রাবাদের বেলায় হয়েছিল যেখানে সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরশাসক বাধ্যবাধকতায় আসছিল না।

এ কাজটি কয়েকটা কারণে আপেক্ষিকভাবে সহজ হয়েছিল।

(১) ভারতের সামান্ততান্ত্রিক রাজারা ১৮৫৭ সালের পর থেকেই তাদের চরম-পন্থী মনোভাব ত্যাগ করেছিল আর কৌশলগত কারণেই ব্রিটিশ শাসনের প্রতি সামাজিক সমর্থন দিতে বাধ্য হয়েছিল।

(২) বহুসংখ্যক রাজ্যই ছিল খুবই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডবিশিষ্টও কম জনসংখ্যা অধ্যুষিত।

(৩) এ সব রাজ্যের ভূখণ্ডগত যোগ ছিল ব্রিটিশ ভারতের সংগে আর এরা উন্নত হচ্ছিল অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিক থেকে ব্রিটিশ ভারতের সংগে নিবিড় সম্পর্ক রেখে।

(৪) বৃহৎ রাজ্যগুলো বেশ নিবিড়ভাবে ব্রিটিশ প্রশাসনিক, করব্যবস্থা ও সাধারণ অর্থনৈতিক আদর্শের ছাঁচটাই অনুসরণ করে যাচ্ছিল আর সেই কারণে ব্রিটিশ ভারতের সংগে সহজেই মিশে যাওয়ার পরিপার্শ্ব সৃষ্টি করে রেখেছিল। দেশীয় রাজ্যগুলোতে বসবাসকারী বণিক শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী, বৃত্তিভোগ শ্রেণী ও অন্যান্য গোষ্ঠীগুলো ব্রিটিশ ভারতের অনুরূপ শ্রেণীগুলোর সংগে সংযুক্ত ; এমনকি মিশেও ছিল।

(৫) বেশ কয়েকজন দেশীয় রাজা ভারতীয় শিল্পে বিরাট পরিমাণ পুঁজি বিনি-য়োগের দরুন বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়েছিল।

(৬) দেশের সাধারণ পীড়নমূলক আবহাওয়া আর ব্রিটিশ ভারতের জাতীয়তা-বাদী আন্দোলনের প্রভাবে রাজ্যগুলোতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরি-চালিত শক্তিশালী গণআন্দোলনের বুনিয়াদ তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

(৭) দেশীয় রাজন্যবর্গ ছিল সামরিক দিক থেকে খুবই দুর্বল। তাদের সশস্ত্রবাহিনীর, ভারত ইউনিয়নের শক্তিশালী সামরিক যন্ত্রের তুলনায় প্রদর্শনী-তুল্য মাত্র ছিল।

এই সব উপাদান, মুক্তহস্ত 'সালিয়ানা' ও রাজোচিত মোটা টাকার আর্থিক প্রলোভন আর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের চাপ সৃষ্টিকারী কৌশলের সংগে যুক্ত হয়ে ভারতের মানচিত্র হতে সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলোর অবলোপন ঘটিয়েছিল।

নীতি ও তার ফলাফলের অবাঞ্ছনীয় বৈশিষ্ট্য ?

অবশ্য দেশীয় রাজ্যগুলোর জনগণের গণভোটের পরিবর্তে ভারত ইউনিয়নের সরকার ও দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, দরকষাকষির মধ্য দিয়ে রাজ্যগুলোর অবলোপনের কিছু অনাকাংক্ষিত ফলাফল দেখা দিয়েছিল।

(১) এটি কাশ্মীর সমস্যার সৃষ্টি করে যা ভারতীয় রাজনীতির দৃশ্যপটে মরীচিকাবৎ প্রতিভাত হচ্ছে।

(২) এটি কোটি কোটি টাকার মজুত ভাণ্ডার নৃপতিদের হাতে রেখে দেয় যা ভারত ইউনিয়ন উদ্ধার করে তার আর্থিক বিকাশের পরিকল্পনার অর্থসংস্থান করতে পারত।

(৩) এই সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের একটা বড় অংশ সরকারী প্রশাসনের উচ্চতর পদগুলোতে নিযুক্ত হয় যারফলে ঐতিহ্যগতভাবে গোঁড়া ও প্রতিক্রিয়াশীল লোকেরা প্রশাসনে ঢুকে পড়ে।

রাম বিনা রাম রাজ্য

যদিও সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলোর অবলোপন—যে রাজ্যগুলো একটা প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক শক্তি ছাড়া কিছু ছিল না, আর যাদের রাজনৈতিক কৌশলগত কারণেই কৃত্রিমভাবে ব্রিটিশরা স্থায়িত্ব দিতে চেয়েছিল—একটা প্রগতিশীল ব্যবস্থা ছিল। এর ফলে ভারতে একটা সমরূপ রাজনৈতিক আদর্শের উদ্ভব হয়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বহু শতাব্দীর

পুরাতন রাজতন্ত্রবাদী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সমাধি রচনা করে আর তার ফলেই ভারতে অ-রাজতন্ত্রী বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ইতিহাসে অনেক বক্রোক্তিই শোনা যায়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যা এদেশে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, সেই হলো রাজকীয়-রাজতন্ত্রী ব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণু নিদর্শনগুলোর অবলোপনকারী, যে ব্যবস্থাতে প্রগতিশীল পর্যায়ে রামই ছিল সবচেয়ে বড়।

জাতিসমূহের কণ্টকাকীর্ণ সমস্যা

প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারত ইউনিয়ন গড়ে তোলার সমস্যাটা কণ্টকাকীর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কয়েকটি সমস্যা নিম্নরূপ :

(১) ব্রিটিশ যুগের পুরাতন প্রদেশগুলোর ভূখণ্ডগত পুনর্বণ্টন ও নতুন অংগ রাজ্যের সৃষ্টি। এর ফলে দেখা দিয়েছিল সীমান্ত অঞ্চল নিয়ে বিবাদ।

(২) ভারত ইউনিয়নের প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সাথে সামন্ততান্ত্রিক দেশীয় রাজ্যগুলোর যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্তি।

(৩) ভারত ইউনিয়ন গঠনকারী অংগরাজ্যগুলোর সঠিক আয়তন নির্ধারণ, যাতে তারা অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে যথাক্রমে কার্যকর ও পরিচালন-যোগ্য হতে পারে।

(৪) অংগরাজ্যের কাঠামো ও কার্যধারা অবশ্যই এমন হবে যাতে বিরাট সংখ্যক মানুষ প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, অভাব অভিযোগ জানাতে পারে ও তার বিভিন্ন কাজে সক্রিয় আগ্রহ দেখাতে ও অংশ গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে শাসনকার্যে জনগণের পরিচিত আঞ্চলিক ভাষা প্রশাসনের ভাষা হিসেবে গৃহীত হয় এবং সরকারও তাদের কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

(৫) সরকারের এমন সব বিভাগ ও পদ্ধতিগত নিয়মকানুন নিয়ে অংগরাজ্য গঠিত হবে যাতে তার কাজের উপর নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ ও মতামত দেওয়ার অধিকার বজায় থাকে।

(৬) অংগরাজ্যের সংগঠন এমন হবে যাতে দায়িত্বহীন 'আমলাতান্ত্রিক' প্রশাসন জনগণের ইচ্ছার প্রতি দায়ী ও প্রতিবেদনশীল থাকে।

(৭) অংগরাজ্যগুলোর পুনর্গঠন এমনভাবে করতে হবে যাতে তাদের অসম ও ভারসাম্যহীন বিকাশ না ঘটে। রাজ্যগুলোর সমরূপ উন্নতিই হবে অবশ্য কাম্য।

গুণগতভাবে ইউনিয়নের অংগরাজ্যগুলোর একটা নতুন ধরণের পুনর্গঠনের কথাই এখানে বলা চলে। এর মধ্যে ছিল জাতীয়তাবাদ ও ভাষাগত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এক নতুন ধরণের ভূখণ্ডগত পুনর্বণ্টন আর প্রতিটি রাজ্যের সমান বিকাশের প্রতিশ্রুতি। শুধু তাই নয়। এর অর্থ ছিল এই যে ভারত ইউনিয়ন হবে সাদৃশ্যপূর্ণ আর্থিক বুনিয়াদযুক্ত কিন্তু সাংস্কৃতিক বর্ণালীঘেরা অথচ সমভাবে সমৃদ্ধিশালী ভারতীয় জনসমাজ নিয়ে গঠিত একটা রাজ্যগুচ্ছ। ভারতবর্ষ হবে ভারতীয় জাতিগঠনকারী বিভিন্ন জাতিসমূহের স্বাধীন স্বেচ্ছামূলক সমবায়-ভিত্তিক রাষ্ট্র। পরিশেষে, এ সব জনসমাজের মৌলিক স্বার্থ ও বন্ধনে স্বেচ্ছা-মূলক স্বীকৃতির ভিত্তিতে তা তার ঐক্য ও সংসক্তি বজায় রাখবে।

"Social Background of Indian Nationalism"-এ "জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু সমস্যা" শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা জাতিত্ববিষয়ক সমস্যাগুলোর বিশদ আলোচনা রেখেছি। সেখানে আমরা দেখিয়েছি কিভাবে এ সব সমস্যার সম্পূর্ণ ও সঠিক সমাধান সম্ভব। প্রথমতঃ, যদি ক্ষমতা ভারতের কায়েমী স্বার্থের হাতে না দিয়ে শ্রমজীবী মানুষদের হাতে দেওয়া হত আর দ্বিতীয়তঃ, একমাত্র যখন জাতীয় অর্থনীতিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন উৎপাদনের মালিকদের হাতে মুনাফা অর্জনের দিকে চালিত না করে উৎপাদনের উপায়গুলোর সামাজিক মালিকানা ও সর্বজনীন পরিকল্পনার উপায় প্রতিষ্ঠিত হত আর যদি তা জনগণের চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য কাজ করতো।

কংগ্রেসের অভিজ্ঞতাপ্রসূত দৃষ্টিভংগী

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্যায়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলোর পুনর্গঠনের ঘোষণা করেছিল। তবে, স্বাধীনতার পরে সে নিজের থেকে সংবিধান-এর ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যবস্থা রাখে নি। এর ফলে এই দাবীতে বিভিন্ন জাতভিত্তিক গোষ্ঠীর বেশ কয়েকটি সংগ্রাম সুরু হয়। বহুভাষাভিত্তিক প্রদেশ-গুলোতে ভাষাভিত্তিক প্রদেশের জন্য সংগ্রাম আরও জটিল হয়ে পড়ে সে সব প্রদেশের অন্যান্য সংগ্রামের পরিণতিতে, যেমন, আর্থিক আধিপত্যলাভে বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পুঁজিবাদীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সংগ্রাম এবং আসন, পদ ও কাজের জন্য মধ্যবিত্তশ্রেণীগুলোর মধ্যে সংগ্রাম। অধিকন্তু, বহুভাষা-ভিত্তিক রাজ্যগুলোর জনসাধারণ একটি বিশেষ ভাষাভিত্তিক রাজ্য দাবী করে যাতে

তারা প্রশাসনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে ও প্রভাব ঘটাতে পারে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সমস্যাটার মোকাবিলায় একটা সুনির্দিষ্ট নীতিযুক্ত দৃষ্টিভংগী না নিয়ে এ নিয়ে একটা অভিজ্ঞতাজাত সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করে। অন্ধ্রের দাবী কংগ্রেস মেনে নেয় যখন সেখানে একটা গণসংগ্রামের বিস্ফোরণ ঘটে আর স্বতন্ত্র অন্ধ্রের দাবীতে একজন খ্যাতনামা যোদ্ধার অনশনে মৃত্যুজনিত চাপ সৃষ্টি হয়। জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠী-গুলোর সমস্যা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যেই ছিল মতপার্থক্য। বহু গড়িমসি করে কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকার এই কঠিন সমস্যার সমাধানে একটা রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন বসায়। কমিশন বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক গোষ্ঠীর দাবীর অনুসন্ধানে বেরোলে গভীর বৈরিতা-পূর্ণ আবেগের সঞ্চার ঘটে। অবশ্য ভাষাগত গোষ্ঠীগুলোর বিভিন্ন অভাব-অভি-যোগ এর ফলে জানা যায় আর জনগণের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী স্মারকলিপি স্তূপীকৃত হতে থাকে। এ আন্দোলনে সরকার অনুসৃত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নীতিগুলোর বিরুদ্ধে অসন্তোষও প্রতিফলিত হতে থাকে। ভাষাগত আন্দোলনের অন্তরালে যে সব সমস্যা সামনে চলে আসে সে-গুলো হলো চাকরী ও আসনসংক্রান্ত, আঞ্চলিক আর্থিক বিকাশ ও শিক্ষাবিষয়ক, সমাজকল্যাণ প্রকল্পের উপকারে অংশলাভ, শিক্ষা ও প্রশাসনের মাধ্যম সংক্রান্ত প্রভৃতি। এ সব সমস্যা নিয়ে বিরোধ এখনও চলছে আর তার ঐতিহ্যবাহী প্রকাশ ঘটেছে বিরাট আয়তন ও পরিচালনের অযোগ্য বোম্বাই রাজ্যের সংযুক্ত মহারাষ্ট্র ও মহাগুজরাট আন্দোলনের মধ্যে। সীমান্ত অঞ্চল নিয়ে নানা সংগ্রামের মধ্যেও এর প্রকাশ ঘটেছে।

অবশ্য একথা মানতেই হবে যে পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুসৃত রাজ্যগুলোর পুন-র্গঠনের পরিকল্পনা মোটামুটি ভাষাগত ভিত্তিতেই হয়েছে। কিন্তু জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীগুলোর সমস্যা ভাষাভিত্তিক রাজ্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে শেষ হয় না। এর ভিতর রয়েছে প্রতিটি জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীকে তার সম্ভাবনাগুলোকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করার সুবিধা দান। সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জনগণকে পরিপূর্ণ আর্থ-সামাজিক সুবিধা দেওয়াও এর অর্থ। এর আরও অর্থ হলো তাদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ (জনসাক্ষরতা ও শিক্ষা, আঞ্চলিক ভাষাগুলোর অবাধ ও পূর্ণ বিকাশ প্রভৃতি) যাতে নিজ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতিতে অংশ নিতে পারে। অবশ্য এর তাৎপর্য রয়েছে। শাসকগোষ্ঠী বুর্জোয়া শ্রেণী ও কংগ্রেস সরকারের পক্ষে এমনভাবে তাদের সম্পদগুলোর বিন্যাস করা যাতে সমগ্র দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিটি জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর এলাকাও উন্নত

হতে পারে। আমরা পূর্বেই দেখেছি ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী তার অবস্থানগত কারণেই এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে না। এ ঐতিহাসিক কার্যসম্পাদনে তার না আছে সম্মান না আছে ক্ষমতা। জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সমস্যার মোকাবিলায় কংগ্রেস সরকারের গৃহীত অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা তার অক্ষমতারই চূড়ান্ত প্রমাণ।

বিদেশী অধিকৃত অঞ্চল

ফরাসী ও পর্তুগীজ অঞ্চলগুলো সম্পর্কে কংগ্রেস সরকার আলাপ-আলোচনার নীতি নেয়, আর এই আলোচনার গুরুত্ব বাড়াতে জন বিক্ষোভকেও উৎসাহিত করে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ অতীতে অধিকৃত ও শাসিত ভারতীয় ভূখন্ডের কিছু অংশ ভারত ইউনিয়নের হাতে প্রত্যর্পণ করে দিলেও পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদ সে পথ গ্রহণ করে না। গোয়া ও ভারতের অন্যান্য অংশ সে ছাড়তে অস্বীকার করে ও পর্তুগীজ অধিকৃত ভারতের ও ভারতীয় ইউনিয়নের জনগণের মুক্তি আন্দোলনকে নানা ভাবে দমন করে। যুক্তি-পরামর্শ ও আলাপ-আলোচনার শান্তিপূর্ণ নীতি অনুসরণ করে কংগ্রেস সরকার ঐ সব অঞ্চল পুনরুদ্ধার করা থেকে শুধু বিরতই থাকেনি, বরং গোয়া মুক্তি আন্দোলন সংগঠনকারী ভারতীয় জনগণকেও গোয়া অধিকারে বাধা দিয়েছে। জনগণের মধ্যে গোয়া সমস্যা নিয়ে কংগ্রেস সরকারের এই নীতি ও মনোভাব জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল।

পর্তুগীজ অঞ্চলের সমস্যা অপরিবর্তিত থেকে গেল। বৃহৎ শক্তিগুলির ঠাণ্ডা-যুদ্ধ ও সর্বব্যাপী আণবিক যুদ্ধের ভীতির দ্বারা প্রভাবিত বিদ্যমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে সামগ্রিক বৈদেশিক নীতি (পঞ্চশীলা) বস্তুতঃ ভারত সরকারের বর্তমান নীতি নির্ধারণ করত। নেহরু বারবার বলেছিলেন যে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান শান্তিপূর্ণভাবে ও আলোচনার মাধ্যমে করা উচিত।

প্রশাসনিক সমস্যা

ক্ষমতায় এসে কংগ্রেস তারই সৃষ্ট গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামোগত কার্যধারার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও উপযুক্ত ঐতিহ্য ও রীতিনীতি উদ্ভাবনের দায়িত্বের সম্মুখীন হয়। তাছাড়া তাকে এমন একটা প্রশাসনিক যন্ত্র বাছতে হয় যা দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকরীভাবে আইন-শৃংখলা বজায় রাখতে পারবে। এ পরিবর্তন অবশ্য মিশ্র অর্থনীতির স্বীকৃত নীতি ও পুঁজিবাদী ধন-

তান্ত্রিক রাষ্ট্রভিত্তিক কর্মসূচী ও দেশের দ্রুত শিল্পায়নের পরিকল্পনার ভিত্তির পরিণতি, যাতে জনগণের উপর ভাবী অর্থনৈতিক বোঝা চাপবে ও ফলে দেখা দেবে তাদের প্রতিরোধ। জনগণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও তাদের পরিণতিতে সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতেই বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও জাতীয় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে বজায় রাখতে হয়—যে জনগণ বিগত কয়েক দশক ধরে এই স্বপ্নই দেখেছিল যে জাতীয় স্বাধীনতা এ সব মৌল সমস্যা যেমন বেকারত্ব, খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও জীবনের প্রয়োজনের সমাধান এনে দেবে।

তাছাড়া সংবিধান মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতি সংযোজিত করে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সাধারণ মানুষের মনে এই আশা জাগিয়েছিল যে সমাজকল্যাণ অথবা কল্যাণ রাষ্ট্রের চরিত্রই পাবে ভারত। দারিদ্র্য-প্রপীড়িত জনগণের সামনে গণতন্ত্র ও সমাজকল্যাণের ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দিয়ে একটা দুর্বল জাতীয় অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে—যে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি তার নিজের স্থিতির জন্য শোষণ ও মুনাফা অর্জনকেই লক্ষ্যবস্তু করেছিল—কংগ্রেস নিজেই একটা গোলমেলে ও পরস্পর বিরোধী পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফেলেছিল। রাষ্ট্র যখন জীবনের মানবৃদ্ধি ও সমাজকল্যাণকর ব্যবস্থা নিয়ে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য দূর করতে ব্যর্থ হয়, তখন ইতিহাসের শিক্ষাই হলো, জনগণ সংগ্রামী হয়ে উঠে সাধারণ ধনতান্ত্রিক ভিত্‌টাকেই চ্যালেঞ্জ করে বসে। এ অবস্থায় রাষ্ট্র আইন শৃংখলা রক্ষায় সংগ্রাম বন্ধ করতে চায় কিংবা ধনতন্ত্রবাদের উচ্ছেদ চায়। যেমন অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেছেন যে প্রথম পথটাই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে সহজতর ও ভাল। মৌল নীতিগুলোর সাথে তা সংগতিপূর্ণও বটে। অধিকতর অনমনীয়তা ও নাগরিক স্বাধীনতার ক্রমবর্ধমান সংকোচনের দিকে ভারতীয় রাষ্ট্রে বিবর্তন, আমাদের ধারণা, অধ্যাপক ল্যাস্কির মন্তব্যকেই সমর্থন করে। ভারত রাষ্ট্র সমাজের ধনতান্ত্রিক ভিত রক্ষার্থে ধীরে ধীরে গণতন্ত্রকে ধ্বংশ করার পথ ধরেই চলেছে।

ক্রমবর্ধমান অনমনীয়তা ও গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার সংকোচন?

আমরা দেখলাম নাগরিক অধিকারের সাংবিধানিক অনুচ্ছেদগুলোর ভাষায় অনেক ছিদ্র রয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন শাসনবিভাগীয় দপ্তর ও এজেন্সীগুলোকে তা প্রচন্ড ক্ষমতা দিয়েছে। তাছাড়াও, ভারত ইউনিয়নের সরকার নিবর্তনমূলক আটক আইনের মত বেশ কিছু জরুরী বিধি জিইয়ে রেখেছে যেগুলো ছিল ব্রিটিশ

যুগে কংগ্রেসের আক্রমণের বস্তু। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, সরকারী কর নীতি, শ্রমজীবী মানুষের নাগরিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণকারী আইন (ধর্মঘটের অধিকার প্রভৃতি), শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে জনগণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ধর্মঘট, বিক্ষোভ, ব্যক্তিগত ও গণ অনশন প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ সব সংগ্রাম দ্রুত বাড়ছে। আর কংগ্রেস সরকার এ সবের মোকাবিলায় দেশের বিভিন্ন স্থানে আটক, গ্রেপ্তার, কারাগারে নিক্ষেপ, ১৪৪ ধারা জারী, সভা-মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা, লাঠি ও গুলিচালনা প্রভৃতির আশ্রয় নিচ্ছে। এটাই বলছে যে শক্ত হাতে ও ক্রমবর্ধমানভাবে নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করার প্রবণতাই সরকারের রয়েছে। বাম ও দক্ষিণপন্থী উভয় দিক থেকেই এই ঝোঁকটার সমালোচনা হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের যথার্থতা সম্পর্কেও কিছু রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের মধ্যে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। দলহীন গণতন্ত্রের আদর্শের পক্ষে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে আচার্য বিনোভা ভাবে ও জয়প্রকাশ নারায়ণ মন্তব্য করেছেন। গণতন্ত্র তুলে দেওয়ার পরামর্শও কয়েকটা গোষ্ঠী দিয়েছেন; আবার কিছু লোক সর্বজনীন ভোটাধিকার ও পর্যায়বৃত্ত নির্বাচনের রাজনৈতিক মূল্য সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে একনায়কত্বের প্রয়োজনকে বিকল্প পথ হিসেবে বিবেচনা করছেন।

সংকটজনক কাল এসেছে ভারতের জনগণের জীবনে। পরের দশকটা বেশ গোলমেলে ঘটনাতে ভরে যেতে পারে। নাগরিক অধিকার সংকোচন ও গণতন্ত্রকে পংগু করে দেওয়ার ক্রমবর্ধমান প্রবণতার পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে, দক্ষিণপন্থীদের কাছ থেকে একনায়কতন্ত্রী শাসনের বিপদের আঁচ।

বৈদেশিক নীতি

পূর্বে আমরা যেমন দেখেছি, বুর্জোয়া কংগ্রেস সরকার তার ইতিহাস-নির্দিষ্ট অবস্থানের জন্য স্বাধীনতা-উত্তর কালে বরাবরই সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতন্ত্রী জোট দুটির মধ্যে সমদূরত্ব বজায় রেখে উভয়ের কাছ থেকেই কারিগরি, আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য আদায়ের প্রচেষ্টা নিয়েছে। যেহেতু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ভারতে রয়েছে, আর ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর হাতেই রয়েছে ক্ষমতা, তাই তার মূল নীতি ধনতন্ত্রী জোটের দিকেই রয়েছে। এ বাস্তবতার চূড়ান্ত নিদর্শন ব্রিটিশ কমনওয়েলথে ভারতের সদস্যপদ, সাম্যবাদের প্রতি নেহরু ও অন্যান্য

নেতার অনীহা, গণতন্ত্র ও সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্রের মধ্যে বৈপরীত্য দেখানো আর ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর সংগে ভারতের সুবিস্তৃত অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত বন্ধন।

পঞ্চশীল

সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্যবাদী জোট দুটোর মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধজনিত সংঘাত যত তীব্র হয়েছে ততই নেহরু সরকার উভয় জোটের মধ্যে ভারসাম্য আনার ব্যাপারে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের সম্পর্কে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল বুর্জোয়া শ্রেণী বেশ সন্ত্রস্ত। তাই নেহরু সরকার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি বা পঞ্চশীলের বিশস্ত সমর্থক। তবে কতকগুলো গুরুতর ঘটনা যেমন্ সুয়েজের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের আক্রমণ, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ, হাংগেরীয় বিপ্লব, তিব্বতের বিরুদ্ধে চীনের আগ্রাসন, চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে মাঝেমাঝে গোলা বিনিময়, পাকিস্তান, বার্মা ও অন্যান্য দেশে সামরিক একনায়কত্ব, লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে প্রায় সাপ্তাহিক যুদ্ধ ও বিপ্লব, বিস্ফোরক বার্লিন সমস্যাকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সংঘাত, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আলজেরীয় জনগণের মুক্তিযুদ্ধ, আফ্রিকার উদ্ধারমান জাতিগুলোর সংগ্রাম প্রভৃতি পঞ্চশীল ও জাতীয় ও শ্রেণীগত সহাবস্থানের নীতির প্রতি এক বিদ্রূপ বিশেষ। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি যত গলাফাটিয়ে প্রচারিত হচ্ছে ততই নিদারুণভাবে তা সমাজ-জগতে বৈরী গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা বাস্তবে লংঘিত হচ্ছে।

আমরা আগে যেমন দেখেছি, সমকালীন পৃথিবীর হিংসাত্মক ও প্রচণ্ড আলোড়নপূর্ণ ঘটনাবলীর উৎপত্তির কেন্দ্রবিন্দু হলো জগতের পরস্পর বিরোধী সমাজব্যবস্থা যা সরকারের বৈরিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বী সংঘাতের জন্ম দেয়। যতদিন এ পৃথিবী প্রভুত্বকারী ও পদানত জাতি, শোষণকারী ও শোষিত শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে থাকবে ততদিন সংঘাতও থাকবে। একমাত্র সমাজতন্ত্রই সমাজ-জগতের সংঘাত দূর করতে পারে আর তা পারে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদকে সরিয়ে। এমনকি এগুলোকে যখন সমাজতন্ত্র অতিক্রম করে যায় (উৎপাদনের উপায় সমূহের সামাজিক মালিকানাভিত্তিক সমাজ) তখনও নিতান্ত ঐতিহাসিক কারণে একটা আমলাতান্ত্রিক জাতের উৎপত্তি হতে পারে; আর ধনতান্ত্রিক উৎপীড়নের অবসান হলেও এক নতুন ধরণের

অত্যাচার সুরু হয়ে পোজ্‌নান দাঙ্গা ও হাংগেরীয় বিপ্লবের মত নানা সংঘাতের সৃষ্টি করতে পারে।

খুব সংগত কারণেই পণ্ডিত নেহরু মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছিলেন যখন সুয়েজে ব্রিটিশ অভিযান শুরু হয় আর তিব্বতে চীনা সেনাবাহিনী ঢুকে পড়ে ও পরে নির্দয়ভাবে স্বাধীনতার জন্য তিব্বতীদের বিদ্রোহকে দমন করে। অথচ পঞ্চশীলের প্রতি আনুগত্য ঘোষণায় পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে চীনা নেতারা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নেমেছিল।

জাতীয় স্বার্থ, পঞ্চশীলের মত ধোঁয়াটে নীতি নয়, জাতি ও শ্রেণীর অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করে। বলা বাহুল্য, ভারত সরকারের বিদেশ নীতিও নির্ধারিত হচ্ছে তার নিজের স্বার্থের দ্বারা।

৬

ঐতিহাসিক পছন্দ—ধনতন্ত্র অথবা সমাজতন্ত্র ?

কংগ্রেসের অর্থনৈতিক নীতি

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ক্ষমতায় এসে একটা সমৃদ্ধিশালী জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার দায়িত্বের মুখোমুখি হয়। এরূপ অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হবে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে ভারসাম্যের উপর। এ দায়িত্বের আর একটা দিক ছিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থনীতি গড়ার প্রয়াসে শক্তিশালী ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা। এ কাজ ছিল কঠিন। অতীতে ব্রিটেনের বাধা দানের ফলে, যেমন আমরা দেখিয়েছি "Social Background of Indian Nationalism"-এ, ভারী শিল্প খুব মন্থর গতিতে বিকশিত হয়েছিল। কৃষি অর্থনীতি নির্ভরশীল ছিল মান্ধাতা আমলের লাঙ্গল ও নিড়ানি পদ্ধতি, জমির ব্যাপক বিভাজন ও খণ্ডীকরণ আর অলাভজনক জোতের উপর। আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূমি সম্পর্কের মিশ্রণের দোষও ছিল এতে। দ্রুত অবনতি হচ্ছিল কৃষিতে যার ফলশ্রুতি হলো গ্রাম্য-জনসাধারণের তীব্র দারিদ্র্য ও কৃষিজীবীদের মধ্যে মেরুভবন। শিল্পের প্রসার কম হওয়ায় গ্রামের বাড়তি জনসংখ্যাকে তাতে নিযুক্ত করা যাচ্ছিল না। বরং কৃষির উপর অত্যধিক চাপ অসহ্য হয়ে পড়ে আর বেকারত্ব ও আধা-বেকারত্বের সমস্যা ভয়াবহ রূপ নেয়। এমন কি যুদ্ধের সময় কৃষিজাতদ্রব্যের উচ্চ মূল্য জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী সমাজ ও সমাজের উঁচুস্তরের একাংশের সুবিধা করে দেয়।

গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো

একটা অর্ধোন্নত ঔপনিবেশিক অর্থনীতি সমৃদ্ধিশালী জাতীয় অর্থনীতিতে

রূপান্তরের কাজ অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার জন্ম দেয়। সেগুলো হলো ঃ

(১) ধনতন্ত্রের গণ্ডীর মধ্যেই কি এই রূপান্তর আনা সম্ভব ? না এর জন্য দরকার হবে প্রচলিত ধনতান্ত্রিক সম্পত্তি সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ?

(২) ধনতন্ত্রের ভিত্তিতে যদি সমৃদ্ধিশালী জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলা যায়ই তবে কি তা সম্ভব হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মূলধন ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ন্যূনতম হস্তক্ষেপের পরিবেশে ? না কি এই কাজে পরিপূর্ণতা আনতে রাষ্ট্রকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে ? যদি এই উন্নয়ন কাজে সরকারী ক্ষেত্রের প্রধান ভূমিকা থাকে তবে কি তা সমাজতন্ত্রের দিকে প্রগতিবাহী হবে ? অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ও জাতীয় অর্থনীতিতে সরকারী উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান কি ধন-তন্ত্রবাদের পংগুত্বকে বোঝাবে ? ধনতন্ত্রবাদ কি জাতীর আর্থিক জীবনে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ও তাকে গড়ে তোলার প্রতি অন্তর্নিহিতভাবে বিরোধী ?

(৩) ধনতন্ত্রবাদী নীতির ভিত্তিতে বিকশিত অর্থনীতি কার্যকরী বিপণনের মৌল সমস্যার সমাধান কি করতে পারে ? আরও, এটা কি পারবে কৃষি সমস্যার সমাধান করতে যা একটা অনগ্রসর অর্ধোন্নত দেশের কৃষি অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সংকট বলে পরিচিত ?

(৪) জাতীয় অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিগুলো কি পারবে একই সংগে দুটো কাজ করতে ? যেমন—(ক) মূলধন গঠনের প্রক্রিয়ার গতিবেগ সঞ্চার ও (খ) বেকার, আধা-বেকার অসংখ্য মানুষ ও লক্ষ লক্ষ দরিদ্র চাষী কারিগর ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের, যারা জীবনধারণের নীচের স্তরে বাস করে তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে ?

(৫) কে পারবে আর্থিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়ানোর এমন দায়িত্ব পালন আর বাণিজ্যিক ও ফাটকাবাজীর ক্ষেত্রের পরিবর্তে শিল্পক্ষেত্রে তাকে বিনিয়োগ করতে ? ভোগের ক্ষেত্রে তার নিঃশেষ হয়ে যাওয়াটা কে রোধ করবে ? তাছাড়া বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে এই আর্থিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টির উৎস হবে কোনগুলো ?

(৬) তাছাড়া, কৃষি সংকটের মোকাবিলা কি করে সম্ভব হবে ? এর সমাধান সম্ভব একটা বড় রকমের শিল্পায়নের দ্বারা যার বৈশিষ্ট্য হবে কৃষি থেকে শিল্পে উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দুর অপসারণে শুধু নয়, তা উদ্বৃত্ত কৃষি শ্রমিকদের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ দানে গৌণ ও তৃতীয় পর্যায়ের পেশার সুবিস্তৃত ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। কৃষির গভীর সংকট স্থায়ীভাবে কাটাতে কোন প্রচেষ্টাই সফল হবে না যদি

না উদ্বৃত্ত কৃষি শ্রমিকদের কৃষি থেকে সরিয়ে নিয়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। অধিকন্তু, কৃষি সংকটের সমাধান সম্ভব যদি লক্ষ লক্ষ অলাভজনক নিতান্ত জীবনধারণের উপযোগী কৃষি জোতগুলোকে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক, দক্ষ ও সুসজ্জিত একক হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়। সম্পত্তি সম্পর্কের একটা মৌল পুনর্বিন্যাসও এর তাৎপর্য। এতে বোঝাত সমস্ত আর্থিক ও সামাজিক সম্পর্কের একটা সামগ্রিক ওলট পালট। এখন প্রশ্ন—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার গর্তে থেকে এসব পরিবর্তন আনা কি সম্ভব হবে ?

(৭) বিপুল জনসংখ্যার বাঁচবার তাগিদে ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর সমস্যার সমাধান কি করে সম্ভব হবে ? দুর্বল ধনতন্ত্রবাদ একই সংগে কি পারবে পুঁজিবাদী শ্রেণীকে মুনাফা ও জনগণের বিরাট অংশের হাতে বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের ক্ষমতা দিতে ? সংক্ষেপে, অনগ্রসর দেশের ধনতন্ত্রবাদ আর তাও তার জীবনের অবনয়নকালে, তার একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা অর্জনকে ভয়ানকভাবে না কমিয়ে, এমন কি তাকে পুরোপুরি তুলে দিয়ে, লক্ষ লক্ষ বেকার মানুষের কর্মসংস্থান ও শ্রমজীবী জনগণকে জীবনযাত্রার মান স্থির করে দিতে পারবে ? এ ব্যবস্থা কি জনগণকে খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও অন্যান্য চাহিদা মিটিয়েও পুঁজিবাদী শ্রেণীর মুনাফাকে নিশ্চিত করতে পারবে ?

সংক্ষেপে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সামনে দুটি প্রধান বিকল্প ব্যবস্থাই ছিল ?

আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থে ("Social Background of Indian Nationalism") এই যুক্তিই দেখিয়েছি যে ভারতীয় সমাজের সম্মুখে যে প্রধান আর্থিক বিপর্যয় এসেছে তার একমাত্র সমাধানসূত্র রয়েছে পুঁজিবাদী সম্পত্তি সম্পর্কের সম্পূর্ণ বিনাসের ভিত্তিতে তার সামগ্রিক পুনর্বিন্যাসে। সাধারণ মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর আশ্বাসদান ও অর্থনীতির সংগতিপূর্ণ উন্নত বিকাশ তখনই সম্ভব যদি প্রচলিত ধনতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামোগত রূপান্তরসাধন হয়, যে রূপান্তর সেই অর্থনীতির ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্টাকে উৎখাত করতে পারবে আর তার স্থানে উৎপাদনের উপায়গুলোর সামাজিক মালিকানা আনতে পারবে। এই নতুন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মুনাফার জন্য কাজ করবে না, করবে সমাজের সকল মানুষের স্বীকৃত প্রয়োজন মেটাতে। সামগ্রিকভাবে সমাজই মানবিক চাহিদার পরিতৃপ্তিতে উৎপাদনের একমাত্র

অলংকরণ হিসেবে তার নিয়ন্ত্রণাধীন উৎপাদন কৌশলের উপর কর্তৃত্ব ও পরিচালনা করবে।

উল্লিখিত গ্রন্থটির প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা বলেছি যে ধনতন্ত্রবাদের আবর্তে ভারতীয় জনগণের প্রধান প্রধান সমস্যার সমাধান হতে পারে না। আমরা আরও দেখিয়েছি যে ধনতন্ত্রবাদের ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান প্রচেষ্টা আরও বৈপরীত্য, শ্রেণীগুলোর আরও মেরুভবন, আর আরও অসাধ্য উভয়-সংকটের দিকে এমনভাবে নিক্ষেপ করবে যে সমস্ত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াটাই একটা প্রকৃত অচলাবস্থায় এসে দাঁড়াবে।

কংগ্রেসের সামনে অর্থনৈতিক উভয়সংকট

একটা উভয়সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল ক্ষমতাসীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। একদিকে সে কৃষিজীবী, শ্রমিক, বেকার ও আধাবেকার মানুষ, কারিগর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্যান্য লোকদের এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিল যে বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি তাদের দুর্দশা ও সব সমস্যার সমাধান করবে। জনগণের দিক থেকে তার সমর্থন প্রতিষ্ঠিত ছিল এসব প্রতিশ্রুতির উপর যা তাদের মনে একটা উজ্জ্বল মানব জীবনের আশার প্রদীপ জ্বালিয়েছিল। এমন কি জনগণকে সমাজতন্ত্রের কথাও শুনিয়েছিল। অপর দিকে এই দলই কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির পক্ষে মৌলিক সমর্থন দিয়েছিল। গান্ধীর নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে সে বলেছিল যে পুঁজিবাদীদের সম্পত্তির অধিকার রয়েছে, যদিও বাস্তবে তারা মানবতাবাদী পুঁজি-বাদী হিসেবে সম্পত্তির অছি হিসেবেই থাকবে। দেশ থেকে ব্রিটিশরা চলে গেলে যখন কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পিত হলো তখন ভারতবাসীদের রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাগ্য নির্ধারণের নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করতে হয়েছিল। দুটি বিকল্পের মধ্যে তাকে একটি পছন্দ করতে হয়েছিল। আমরা আগে যেমন বলেছি, বুর্জোয়া শ্রেণীর অনুরাগী দল হিসেবে ভারতীয় সমাজের পুঁজিবাদী বিকাশের পথ অনুসরণ ও ধনতন্ত্রের মৌলিক সর্তের ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তাই সংবিধান সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে ঘোষণা করেছিল। ধনতন্ত্রের ভিত্তিতে একটা সমৃদ্ধিশালী ভারতীয় সমাজ বিকাশে সে রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করার সিদ্ধান্তই নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, যেহেতু ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল আর্থিকভাবে দুর্বল তাই পুঁজিবাদের

ভিত্তিতে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ, অংশগ্রহণ ও উদ্যোগ নিয়েই ভারতীয় সমাজের বিকাশে একটা দৃঢ় নীতি পছন্দ করেছিল।

মিশ্র অর্থনীতির নীতি

কংগ্রেস সরকারের ১৯৪৮ ও ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসের দুটি নীতি নির্ধারণকারী প্রস্তাবে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের রূপদান ঘটে। আর্থিক বিকাশের পরিকল্পিত কর্মসূচীর মৌল পূর্বানুমান উক্ত দুটি প্রস্তাবে সূত্রবন্ধন ঘটে। এগুলো সুস্পষ্টভাবে বলে যে ভারতের আর্থিক বিকাশ মিশ্র অর্থনীতির অনুসারী হবে। মিশ্র অর্থনীতির পদ্ধতি গ্রহণ করা ছাড়া উপায়ও ছিল না কেননা ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী অত্যধিক দুর্বলতার দরুন পারত না। প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার মাধ্যমে কংগ্রেস সরকার এই মৌল নীতিকে বাস্তবায়িত করতে প্রচেষ্টা নেয়। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিবর্তনের নামে ইহা মূলত ধনতান্ত্রিক নীতি কার্যকরী করতে সাহায্য করত।

যেমন Prof. Hanson বলেছেন ভারতের সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের আপেক্ষিক গুণাবলী সারগ্রাহী কিংবা অভিজ্ঞতামূলক একটা নামকরা দৃষ্টান্ত। তাঁর ভাষায়, "অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ধারনার প্রতি ভারত সম্পূর্ণভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ, যদিও অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সুযোগ দিতে ও উৎসাহী করতেও প্রস্তুত যতক্ষণ তা জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে বাধ্য থাকবে আর জাতীয় স্বার্থে কাজ করবে। ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণাধীন কলকারখানাগুলোর উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নেহরু এক সময় বলেছিলেন, "যতক্ষণ এসব শিল্প চালু থাকছে ও বহু মানুষকে কাজ দিচ্ছে, ততক্ষণ নতুন প্রকল্প ও অধিকতর কর্মসংস্থানের জন্য আমরা আমাদের সম্পদ ব্যবহার করে যাবো। এসব শিল্পে উপযুক্ত ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা থাকলে কোন সময়েই তাদের জাতীয়করণের প্রয়োজন অনুভূত হবে না। যদিও কংগ্রেস দল সরকারীভাবে অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে দায়বদ্ধ, তবু এ নীতির তাৎপর্য হলো জনকল্যাণ অর্থনীতি, উৎপাদনের উপাদানের জাতীয়করণ, বণ্টন ও বিনিময় নয়, আর শ্রীনেহরুর উক্তি প্রথম পরিকল্পনার মত দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও সংগতিপূর্ণ।"[১]

১. A. H. Hanson (Ed.) : Public Enterprise, pp. 400-401.

পরিকল্পনার দুটি ধারণা

বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণার অবসান হওয়া দরকার। পরিকল্পনার ধারণা সমাজতন্ত্রের সংগে নিবিড়ভাবে জড়িত কেননা সোভিয়েত ইউনিয়নে বিশদীকৃত পরিকল্পনা থেকেই তার অনুপ্রেরণা এসেছে। আজকাল অবশ্য দুটি সুস্পষ্ট অর্থ পেয়েছে পরিকল্পনার ধারণা—একটি হল ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনা যার অর্থ হলো বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণে অপরিহার্যভাবে উদ্ভূত পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় কার্যকরী ক্ষেত্রে প্রবর্তিত নিয়ন্ত্রণ। অন্যটি হলো সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা যার ভিত্তি হলো একটা কাঠামোগতভাবে পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা। আর এ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে থাকবে পুঁজিবাদী শ্রেণীর বিলুপ্তি, উৎপাদন-ক্ষেত্রে মুনাফার উৎখাত, আর উৎপাদনের উপায়সমূহের সামাজিক মালিকানা ও প্রয়োজন মাফিক উৎপাদন।

অবশ্য একথাও বলতে হবে যে সরকারী ক্ষেত্রের প্রসারণসহ অর্থনৈতিক কার্যকলাপে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ আজকাল পুঁজিবাদী সমাজ সংরক্ষণের বিরোধী বলে বিবেচিত হচ্ছে না।

সরকারী ক্ষেত্র ও ধনতন্ত্রবাদ

বস্তুতঃ, "শিল্পক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগে আধুনিক জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভবতঃ অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।" Prof. Friedman যেমন লিখেছেন, "এর বিকাশ উনবিংশ ও বিংশ শতকের মধ্যবর্তী আর্থিক ও সামাজিক চিন্তাধারায় এক তাৎপর্যময় পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এক শতাব্দী আগেও প্রচলিত এই তাত্ত্বিক ধারণা লক্ষণীয় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব তদারকী কাজের ক্ষেত্রেই সীমিত। বিশেষ করে, সামরিক, পররাষ্ট্র, পুলিশ ও ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে এবং শিল্পের জগতে তার কোন ভূমিকা নেই আজ পরিত্যক্ত। আজ এটা স্বীকৃত যে এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ আধুনিক সরকারের একটা বৈধ ও অপরিহার্য দায়িত্ব। বেশ কিছু উদ্দেশ্য ও প্রেরণা এরূপ বিবর্তনের জন্য দায়ী যেগুলো দেশে দেশে বিভিন্ন সরকারের মধ্যে এক রকম নয়।"[২]

এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও, যে দেশ "বেসরকারী উদ্যোগ" ও ধনতান্ত্রিক

২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির আদর্শ দেশ বলে পরিচিত, সরকারী উদ্যোগের উৎপত্তিই শুধু হয় নি তার প্রসারও ঘটেছে। Lilienthal ও Marquis সরকারী উদ্যোগগুলোকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যেমন, (১) আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা ও সামাজিক দিক থেকে কাম্য ক্ষেত্রে নির্দেশাদির প্রয়োজনে ব্যক্তিগত ব্যবসাকে সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে উদ্যোগ; (২) লাভজনক নয় কিন্তু সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলোতে উদ্যোগ; (৩) যে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে অসন্তোষজনক বলে মনে হয় সেগুলোর বেলায় উদ্যোগ এবং (৪) বেসরকারী চরিত্রবিশিষ্ট সরকারী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ।"[৩]

Prof. Hanson মন্তব্য করেছেন, "আজকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী উদ্যোগের প্রতি সহনশীলতা অন্যান্য দেশের তুলনায় সীমিত হলেও এ শতকের বিশের দশকে নিশ্চিতভাবে সমাজতান্ত্রিক বলে অভিহিত হত।"[৪] তাঁর মতে, "সরকারী উদ্যোগ ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফাঁকগুলোকে যুক্তিসংগতভাবেই পূরণ করছে বলা যেতে পারে।"[৫]

এক কথায়, সরকারী ক্ষেত্র, যা জাতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশগ্রহণ বোঝায়, বর্তমান একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগেও একচেটিয়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংরক্ষণের স্বার্থেই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ত্রুটিপূর্ণ প্রতিযোগিতা, পুরাতন শিল্প চালু রাখা, প্রযুক্তিগত বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন শিল্পস্থাপন ও আর্থিক উদ্যোগ গ্রহণে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিরাট পরিমাণ পুঁজি প্রভৃতি জোগাড় করার নানা অসুবিধা এর কারণ। সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সকল কার্যের তত্ত্বাবধানকারী রাষ্ট্র কেন পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাজ ক্রমবর্ধমানভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে তার প্রধান প্রধান কারণগুলো নীচে উল্লেখ করবো।

(১) শিল্প ও অন্যান্য উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় অতি উন্নত ও আধুনিক কারিগরি যন্ত্রপাতির জন্য বিরাট বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ সংগ্রহে ব্যক্তিগত পুঁজি অক্ষম।

(২) ব্যক্তিগত একচেটিয়া কারবারীরা রাষ্ট্রীয় সাহায্য চায় আন্তর্জাতিক

৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৮
৪. ঐ, পৃঃ ২৯
৫. ঐ, পৃঃ ২৮

বাজারে সফলতার সংগে প্রতিযোগিতা করতে, যেখানে বিরাটাকায় একচেটিয়া কারবারগুলোকেও আরও বড় কারবারগুলোর তুলনায় ছোট বলে মনে হবে।

(৩) রাষ্ট্রের কৌশলগত ও সামরিক প্রয়োজন মেটাতে ভারী ও বিরাট পরিমাণ সামরিক অস্ত্রসম্ভার দরকার।

(৪) সম্পদশালী শ্রেণীগুলোর অনুকূলে তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের আবশ্যিকতা রয়েছে।

(৫) জাতীয় অর্থনীতির স্থিতি বজায় রাখতে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে মজবুত করতে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও ধনতন্ত্রবাদের কাজের তদারকি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

সরকারী ক্ষেত্র—পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থে প্রয়োজন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি অতি উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতেও যদি এ পরিস্থিতি দেখা যায় তবুও অর্ধোন্নত ও ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত সদ্য স্বাধীন দেশগুলোতে পুঁজিবাদকে টিঁকিয়ে রাখতে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদানকারী ভূমিকার অপরিহার্যতা আরও বেশী করে দেখা দিয়েছে। "এই গোষ্ঠীর প্রতিটি দেশে বেসরকারী উদ্যোগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশ পছন্দ নয়, প্রয়োজনের ব্যাপার। তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা নয় যে প্রচলিত ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলোর জাতীয়করণ উচিৎ না অনুচিৎ। তাদের সামনে প্রাথমিক প্রশ্ন হলো কি উপায়ে রাষ্ট্র, যার হাতে রয়েছে পর্যাপ্ত পুঁজি ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা জোগাড় করার ক্ষমতা, যে সব সংস্থায় সবচেয়ে বেশী বিকাশ ঘটাতে পারে যাদের শৈল্পিক, নির্যাস গ্রহণকারী অথবা জনহিতকর উপযোগিতা রয়েছে। এগুলো ছাড়া "অনগ্রসরতা" অতিক্রান্ত হয় না ও জাতীয় স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণভাবে দায়িত্বের অংগীকার দেওয়া যায় না। Rangoon Seminar-এ সুদূর প্রাচ্যের পর্যবেক্ষক বলেছেন, "গ্রেট ব্রিটেনের জাতীয়করণকে শিল্প সংগঠনের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায় বলেই মনে করতে হবে। যদিও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এটা হলো প্রথম পদক্ষেপ আর কোন কোন দেশে একটা শিল্প-সমাজ গড়ে তোলার দিকে এটাকে একটা ইচ্ছাকৃত সামরিক ব্যাপার বলেই ভাবতে হবে।"[৬]

৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ : পৃ: ৪০০

পাঁচশালা পরিকল্পনার বুর্জোয়া পূর্বাভাস

বস্তুত, এ সব অনগ্রসর দেশের ক্ষেত্রে একটা পরস্পর বিরুদ্ধ অথচ সত্য বিষয় হলো এই যে এ সব দেশের পুঁজিবাদী বিকাশ ঔপনিবেশিক পর্যায়েও রাষ্ট্রের সংরক্ষণ-মূলক পৃষ্ঠপোষকতায় প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ঘটেছিল। ভারত ইউনিয়ন তার পরিকল্পিত আর্থিক উন্নয়নের প্রকল্প সুরু করার আগে, এমন কি ব্রিটিশ যুগেও ভারতের বিত্তবান শ্রেণী ও ব্রিটিশ সরকারের দিক থেকেও পরিকল্পনার বহু প্রস্তাব ও নানা প্রকল্পেব প্রমাণ মিলেছিল। বিশ্বেশ্বরাইয়ার বুর্জোয়া পরিকল্পনার জন্য উদাত্ত আহ্বান, নেহরুর সভাপতিত্বে ও Prof. K. T. Shah-র সম্পাদনায়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আনুকুল্যে রচিত জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির রিপোর্ট, কেন্দ্র ও প্রশাসনিক স্তরে ব্রিটিশ সরকার স্থাপিত বিভিন্ন প্রাদেশিক স্তরে বিভিন্ন কমিটি ও পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তরগুলোর বিভিন্ন রিপোর্ট, বিশেষ করে যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালে নানা বিস্তৃত পরিকল্পনার বিষয়ে, আর্থিক উন্নয়নের সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ের উপর রিপোর্ট আর, পরিশেষে, সুপরিচিত বোম্বাই পরিকল্পনা যা টাটা-বিড়লা পরিকল্পনা নামে খ্যাত—এগুলো সবই ছিল পরিকল্পনার প্রচেষ্টা, যেগুলো হয় বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক উন্নয়ন-প্রকল্প বলে উদ্ভাবিত হয়েছিল কিংবা যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর সংকটের মোকাবিলায় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পরিকল্পনা হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিল।

Prof. Wadia ও Prof. Merchant বলেছেন, "শাসনতন্ত্র রচনার বহু পূর্বে ১৯৪৪ সালের প্রারম্ভে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে প্রদেশগুলো পরিকল্পনা রচনা করেছিল আর তাদের নির্বাচিত প্রকল্পগুলো আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। অনুরূপভাবে, কেন্দ্রীয় সরকার তার পরিকল্পনার কাজও শুরু করেছিল। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ যে সব প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয় তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হলো দামোদর উপত্যকা প্রকল্প, তুংগভদ্রা ও ভাক্‌রা বাঁধ প্রকল্প।"[৭]

ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী, যুদ্ধের সময় তুলনামূলকভাবে কিছুটা শক্তিশালী হলেও, সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় সাহায্য ছাড়া ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পায়নের দুরূহ কাজ এককভাবে হাতে নিতে পারতো না।

ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী কংগ্রেস সরকার এই কঠিন কাজ সামগ্রিকভাবে হাতে নিল। এ কাজ সম্পাদনে সে সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির

৭. Wadia and K. P. Marchant-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ২০

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেয় ও অর্থনৈতিক বিকাশের পদ্ধতি হিসেবে জাতীয় ক্রিয়াবাদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই দৃষ্টিভংগীপ্রসূত সিদ্ধান্তের প্রতিফলন ঘটলো তার শিল্পনীতিতে যা বাস্তবায়িত হলো প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলোতে।

তবে কংগ্রেস সরকার ঘোষিত পরিকল্পনাগুলো যে পূঁজিবাদী পরিকল্পনাই ছিল, সমাজতান্ত্রিক নয়, তার সঠিক উপলব্ধিতে সাধারণভাবে ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজের পরবর্তী বিকাশের পর্যালোচনা দরকার।

চ

অর্থনৈতিক প্রবণতা

পুঁজিবাদী দর্শনে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের সিদ্ধান্ত নিলেও কংগ্রেস সরকারের সামনে এলো অসংখ্য সমস্যা যাদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ও গোলমেলে সমস্যাটা ছিল বিভিন্ন পরিকল্পনার আর্থিক সম্পদ জোগাড়। সম্পদ সংগ্রহের এ সমস্যা কঠিন ও জটিল ছিল এই কারণে যে এর সমাধান প্রক্রিয়ার লক্ষ্য ছিল বুর্জোয়া শ্রেণী ও জাতীয় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির শক্তিবৃদ্ধি।

এই কঠিন ও প্রধান দায়িত্বের দিকে ঝোঁক রেখে সরকারের শিল্প, কৃষি ও আর্থিক নীতিগুলো রচিত হয়েছে।

কংগ্রেস সরকারে শিল্পনীতি

সরকারের শিল্পনীতি হয়েছে নিম্নরূপ ঃ

(১) সরকারী ক্ষেত্রে কয়েকপ্রকার অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ভার অর্পিত হয়েছে। সরকারী ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন, জলসেচ. ভারী শিল্প, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ভার রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রকে অপসারিত না করে তার শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

(২) অধিকাংশ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পকে, যেগুলো বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানায় ছিল, ব্যক্তিগত হাতেই রেখে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, কর ব্যবস্থা ও আমদানী-রপ্তানীর নীতির দ্বারা সে তাদের সম্প্রসারণে সাহায্য করেছে।

(৩) পুঁজিবাদীদের সাহায্য দানের প্রয়াসে সরকার বেশ কিছু আর্থিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেছে।

(৪) সরকারী ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ঠিকাদারদের মাধ্যমে কাজ চালাচ্ছে। একটি বিশেষ গোষ্ঠীর এই ঠিকাদারগুলি সংগ্রহের ফলে সরকারি আমলাতন্ত্র ও ব্যক্তিগত পুঁজিপতি গোষ্ঠীর মধ্যে একটি অশুভ আঁতাত জন্ম নেয়, অনুগ্রহ প্রদর্শন, দুর্নীতি ও কায়েমি স্বার্থ যার ফলস্বরূপ। এ ব্যবস্থা অসংখ্য বেসরকারী ব্যক্তিকে মুনাফা অর্জনের দারুণ সুযোগ এনে দিয়েছে। জাতপাত ও আঞ্চলিক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রদর্শিত আনুকূল্য রাষ্ট্রীয় সংগঠনে জাতপ্রথা ও আঞ্চলিকতাকে বাড়িয়ে তুলেছে। জীপ গাড়ী, ট্রাক্টর, সামরিক সম্ভার ক্রয়, সার ব্যবসা, মুদ্রা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কেলেংকারী এ কথাই বলে যে অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর দেশে কিভাবে সরকারী আমলা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যেকার সংযোগে ('লিয়াজঁ') পুঁজিবাদীদের এক অংশের মধ্যে পাহাড়-প্রমাণ দুর্নীতি, সরকারী অর্থের অপব্যবহার ও বিরাট মুনাফার খেলা চলে। বলাবাহুল্য এসব লোককেই সরকারী ক্ষেত্রে কিছু প্রকল্পের বাস্তবরূপায়নের ভার দেওয়া হয়।

(৫) প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা থেকে পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় সরে যাওয়ার নীতি, বেশ কিছু পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীর কর ফাঁকি ও অনাদায়ীকৃত কর মাফ করে দেওয়া, নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের ঘনঘন নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়ন্ত্রণের নীতিগত পরিবর্তন, লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ পুঁজিবাদী গোষ্ঠীকে সুবিধা দান আর সেই সব জিনিসের আমদানীর জন্য বিদেশী মুদ্রা ব্যয়, যেগুলো দরকার বেসরকারী ক্ষেত্রে, আর বুর্জোয়া শ্রেণী, পেশাদারী শ্রেণীগুলোর ধনী লোকজন, উচ্চ আমলা ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিলাস চরিতার্থতায়। এই ধরণের ব্যবস্থা পুঁজিবাদী শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত সমাজের উচ্চ গোষ্ঠীকেই সুবিধা দিয়েছে। এটাই প্রমাণ করে যে ধনতন্ত্রবাদে সরকারী নীতি সামগ্রিকভাবে সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিনিময়ে ধনিক শ্রেণীকেই সুবিধা করে দেয়।

(৬) বাধ্যতামূলক সালিসি ও অন্যান্য উপায়ে সরকার শ্রমজীবী মানুষদের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোকে সংকুচিত করেছে।

(৭) সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া শ্রেণী ও বিশেষ করে তার একচেটিয়া পক্ষের স্বার্থসংরক্ষণের প্রয়াসে সরকার বুর্জোয়া শ্রেণীর কিছু অংশের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত ও কমাতে চেয়েছে যারা শিল্পক্ষেত্রের বাইরে নানা ফাটকাবাজী কারবারে লিপ্ত। সেই সব কৌশল উদ্ভাবন সে করেছে যেগুলো তাদের সম্পদকে সরিয়ে এনে শিল্প বিনিয়োগে দেবে যা জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

(৮) অধিকন্তু, আর্থিক সাহায্যের জন্য সরকার ক্রমবর্ধমানভাবে বিদেশী পুঁজির

উপর নির্ভর করার নীতি গ্রহণ করেছে। অধিকতর সুবিধাদানের শর্তে নিশ্চয়তাও তাকে দিচ্ছে। বিদেশী কোম্পানীগুলোর সংগে সেই সব চুক্তিই সে করছে যেগুলো তাদের কাছে খুবই সুবিধাজনক। Standard Vacuum Company ও Burmah Shell Company-র সাথে সরকারের সম্পাদিত চুক্তি স্পষ্ট করেছিল, যে কেমন করে সরকার তার পূর্বেকার শর্তগুলি নমনীয় করে তোলে এবং এই সমস্ত বিদেশী সংস্থাগুলোকে উত্তরোত্তর সুবিধা দেয়।

ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকেই পরিকল্পনা সাহায্য করেছে

জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালের জানা ঘটনা প্রমাণ করে যে এদেশে আর্থিক পরিকল্পনা ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে, বিশেষ করে তার একচেটিয়া পক্ষকে সুবিধা দিয়ে আসছে। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে পুঁজির কেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়া দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। মুষ্টিমেয় একচেটিয়া কারবারীরা জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রকে অক্টোপাসের মত ধরে রাখছে। কংগ্রেস সরকার কর্তৃক ভারতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়ার ঘোষণার পরও এ ঝোঁকটার কোন বিরাম দেখা যায় নি।

নিম্নে প্রদত্ত সারণি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প মুনাফার প্রবণতা দেখাচ্ছে :

শিল্প-মুনাফা সূচক (১৯৩৯ = ১০০)

বছর	পাট	তুলা	লোহা ও ইস্পাত	চা	চিনি	কাগজ	কয়লা	সিমেন্ট	অন্যান্য শিল্প
১৯৪৭	৩১৩·২	৩১৭·৭	৮৬·১	২১৬·৩	১৭১·৫	১৬৭·৬	১৭১·৮	১৪২·৫০	১৯১·৬
১৯৪৮	৩৬১·২	৫৪৮·১	৯৬·৩	১২৭·৯	৩৮১·৩	২৫৭·০	২০১·০	২৫২·৬	২৫৯·৯
১৯৪৯	৮৯·৩	১৯২·০	১১৬·০	১৩৮·৪	২১৬·৪	২১৬·৭	২৮৭·২	২৯৫·০	১৮১·৫
১৯৫০	৪৫৬·৯	৩৫৬·৬	১৩৪·২	২৭১·২	২৬২·৪	৪৭৯·০	২০৯.২	৩৩৩.৪	২৪৬.৬
১৯৫১	৬৭৯·১	৫৫১·	১৫৭·৭	১০৩·৯	৪২০·৮	৬০৪·১	১৭৮·৪	৪১৯·৭	৩১০·৫
১৯৫২	১৪৩·৪	২৬২·৮	১৬২·৬	৮৮·৮	৪০৯·১	৫৬৬·৮	২২০·৪	২৯৩·৪	১৯০·৬
১৯৫৩	৩২৬·২	৩৭৯·৪	১৭৯·৪	৩৯১·৪	৪১৯·৮	৫১২·৭	১৪৫·৫	২৭৯·০	২৬১·২
১৯৫৪	৩৫৬·৪	৩৪৭·২	২২২·৯	৭১২·৩	৩৩৪·৯	৬৬৬·১	১৫৩·০	৩৪১·৪	৩১৪·২

পুঁজিবাদীদের মুনাফা সম্পর্কে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্‌দের অভিমত

উল্লিখিত নির্ঘণ্ট, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্‌দের ভাষায়, বহু পুঁজিবাদী "পাহাড়-প্রমাণ অবৈধ মুনাফার হিসেব দেয় না যা তারা নিয়ন্ত্রণবিধি ফাঁকি দিয়ে ও কালোবাজারীর মাধ্যমে অর্জন করে।"[১] এগুলো "যুদ্ধোত্তর কালে কয়েকটি শিল্প

১. উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৭২।

কর্তৃক অর্জিত বিরাট পরিমাণ মুনাফার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে", আর "এই বিপুল পরিমাণ মুনাফা-বলে ভারতে পুঁজিবাদী বিকাশ চলছে ধনতন্ত্রের অপ্রতিরোধনীয় নিয়ম মেনে। ভারতে শ্রমিকদের উপর শোষণ পুরোমাত্রায় চলেছে। জনগণের ত্যাগের পরিণতিতে গড়ে ওঠা বর্তমান সমৃদ্ধি ভোগ করছে বহু শিল্প। অথচ, যখন কেউ ন্যূনতম মজুরীর কথা তোলে—বাঁচবার মত মজুরীর কথা কিংবা প্রগতিশীল শ্রমিক আইনের কথা ছেড়েই দিলাম তখন এর বিরুদ্ধে বিরাট শোরগোল শুরু হয় আর সর্বদাই দেখানো হয় শিল্পের আর্থিক বোঝা বহনের অক্ষমতার কথা। ···যে দেশে জনমতের অস্তিত্ব নেই, নেই শ্রমিকদের শক্তিশালী সংগঠন, সেদেশেই সম্ভব ম্যানেজিং এজেণ্ট হিসেবে সময় সময় পুরো মুনাফার সমান কমিশন দাবী কিংবা শতকরা পনের থেকে বিশ অথবা তিরিশ কিংবা তারও বেশি লভ্যাংশ বণ্টন আর তারই সাথে শিল্পের পক্ষে কতখানি বোঝা বহন করা যায় তার ওকালতি।"[২]

ভারতীয় জনগণের অর্থনৈতিক শাসকগোষ্ঠী

স্বাধীনতার পরেও ভারতীয় শিল্পগুলোতে দ্রুত গতিতে মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন Sri M. M. Mehta তাঁর "Structure of Indian Industries" ও Combination Movement in India"-তে। Prof. V. K. R. V. Rao তাঁর "Structure of Indian Industries"-এর ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন :

"ভারতীয় শিল্পগুলোতে ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ও আর্থিক সংহতির সাম্প্রতিক প্রবণতার বিশ্লেষণই হলো Dr. Mehta-র সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক অবদান। তিনি দেখিয়েছেন যে কয়েকটি ম্যানেজিং এজেন্সী পরিবারের বড় বড় শিল্পগুলোর উপর প্রচণ্ড নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে। Dr. Mehta সবশেষে সঠিকভাবেই বলেছেন, যে কয়েকটি ম্যানেজিং এজেন্সীর ফার্মেই মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীভবনের নির্ভুল প্রবণতা রয়েছে। অন্যান্য ভয়াবহ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তিনি আমাদের সাম্প্রতিক কালের শিল্পের ইতিহাসে বৃহৎ ট্রাস্টগুলো কর্তৃক ক্ষুদ্র ট্রাস্টগুলোর একত্রীকরণ ও বিশেষণের প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন, আরও দেখেছেন বিপুলাকার আর্থিক ও পরিচালনব্যবস্থা ভিত্তিক সম্পদের অধিকারী বড় ট্রাস্ট-

২. উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৭৩-৫৭৪

গুলোর পারস্পরিক একত্রীকরণ। বহুবিধ অধিকতর ব্যবস্থা যার বৈশিষ্ট্য হলো সীমিত কয়েকজনের হাতে শিল্প সংক্রান্ত ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন অন্য একটি পর্যায় যেটি Dr. Mehta পাঠকদের নজরে রাখতে বলেছেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১০০ জন লোকের হাতে রয়েছে ১৭০টি ডিরেক্টারশিপের ভার, এদের মধ্যে ৮৬০টির পদে রয়েছে ৩০ জন লোক; আর এই ৩০ জনের মধ্যে অন্ততঃ ১০ জনের মধ্যে প্রায় ৪০০টি ডিরেক্টরশিপের দায়িত্ব বণ্টিত হয়েছে। তাই Dr. Mehta-র ভাষায়, "বাস্তবে ভারতের কয়েকটি মুষ্টিমেয় পরিবারই ভারতের শিল্পজগতের ভাগ্য-নিয়ন্তা। নতুন কোন যুবশক্তি এরূপ শিল্পগোষ্ঠীতন্ত্রে প্রবেশের বড় একটা সুযোগ পায় না। শিল্প সংগঠনের আর যে বৈশিষ্টের প্রতি Dr. Mehta দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেটি হলো শৈল্পিক ও আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে ব্যবস্থাপকীয় সংহতি অথবা আলাপ-আলোচনাভিত্তিক ডিরেক্টরশিপের মাধ্যমে বিকশিত নিবিড় সম্পর্ক। এই-ভাবে প্রধান ছটি নেতৃত্বদানকারী ভারতীয় ব্যাঙ্কিং এজেন্সী হাউস ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও বিনিয়োগ ট্রাস্টগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনাভিত্তিক নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখেছে। তাছাড়াও, একই ম্যানেজিং এজেন্সীর অধীন কোম্পানী-গুলোতে পুঁজির আন্তঃবিনিয়োগ ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সী হাউসগুলোতে ব্যাপকভাবে রয়েছে।"[৩]

প্রসংগত: লক্ষ্যণীয় যে ১৯৬০ সাল হতে বলবৎযোগ্য Company Law Reform Act এই ধরণের প্রবণতারোধে প্রণীত হলেও ম্যানেজিং এজেন্টদের সমগ্র নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর পুনর্গঠনে এমনভাবে সময়ের অবকাশ রেখেছে যাতে পরোক্ষভাবে শিল্পের উপর একই পরিবারের কর্তৃত্ব বজায় থাকে।

আর্থিক গোষ্ঠীতন্ত্র, স্বজনপোষণ, দুর্নীতি

শিল্প, বাণিজ্য ও পুঁজির ক্ষেত্রে বিশেষ জাত ও জাতিভিত্তিক জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি পরিবারের নিয়ন্ত্রণের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য রয়েছে কর্মসংস্থান ও আর্থিক সুযোগের দিক থেকে। পরিবার, জাত ও প্রাদেশিকতা ভিত্তিক বিচার-বিবেচনা কর্মচারীবৃন্দের নির্বাচনের সমস্ত ব্যবস্থাটাকেই বিকৃত করে। অধিকন্তু, অর্থের কেন্দ্রীভবন ও কয়েকটি পরিবারের নিয়ন্ত্রণাধীন জনমতগঠনকারী বিভিন্ন মাধ্যম, যেমন, প্রেস, চলচ্চিত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের একাংশ ও মধ্য-

৩. M. M. Mehta : Structure of Indian Industries, pp. viii-ix

বিত্ত শ্রেণীর কয়েকটি অংশকে কিনে নেবার ক্ষমতা দেয়, জাত, সম্প্রদায় ও প্রাদেশিকতাকে কেন্দ্র করে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সংগ্রামকে জাগিয়ে তোলে, মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে উচ্চতর কলা ও ক্ষমতা অর্জনের (বৈজ্ঞানিক, কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সাধারণ বিদ্যায়) বৈষম্যমূলক সুবিধা দেয় যাদের প্রয়োজন হয় আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের জন্য কর্মচারীদের জোগান দেওয়া। আইনসভা, প্রশাসনিক ও সরকারী দপ্তরগুলো ছাড়াও মন্ত্রিপরিষদের বিভিন্ন ব্যক্তির পারিবারিক, জাত ও সম্প্রদায়গত পটভূমি এমন কি সমাজ সংস্কার, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রণালীবদ্ধ বিশ্লেষণ (Mill-এর 'ক্ষমতা-গোষ্ঠী'র উপর পথপ্রদর্শনকারী কাজের আলোকে) সাম্প্রতিক কালের ভারতের বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো, সরকার ও অন্যান্য এজেন্সীগুলোর মধ্যে গভীর লিয়াজঁ ও কখনও কখনও বা একীকরণের উপর উজ্জ্বল সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়ন করেছে। এরাই ভারতীয় জনগণের মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক জীবনকে গড়ে তোলে। এসব প্রবণতার দ্রুত বৃদ্ধির পর্যাপ্ত সাক্ষ্য দেখা যাচ্ছে।

ভারতে এ সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতার বিকাশকে এই প্রেক্ষাপটেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

রাষ্ট্র ও বেসরকারী ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতর বোঝাপড়া

ভারতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বার্থেই এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সরকারী ক্ষেত্রের দ্রুত সম্প্রসারণের দরকার হয়ে পড়েছিল। জীবনযাত্রার ঊর্ধ্বতর ব্যয়বৃদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষের অবস্থার দ্রুত ক্রমাবনতির পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের মোকাবিলায় কিছু সমাজ-কল্যাণকর ব্যবস্থা গ্রহণের দরকার হয়। সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর কয়েকটি পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর বে-আইনী ও অসাধু উপায়ে মুনাফা অর্জনের অস্বাভাবিক অস্থিরতার মোকাবিলায় কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ; পাকিস্তানের দিক থেকে আগ্রাসন নীতি ও ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ গোলমালের মোকাবিলায় রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় সামরিক যন্ত্রদানবের সংরক্ষণ ও বিকাশের স্বার্থে বিপুল প্রতিরক্ষা ব্যয়; জটিল ও প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে কংগ্রেস সরকার কর্তৃক গৃহীত অদৃষ্টপূর্ব ও অভিজ্ঞতামূলক নীতিসমূহ; দেশে ঝড়ের গতিতে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও আন্দোলনের প্রসার আর কংগ্রেসের নিজের পতাকাতেই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজের শ্লোগান উৎকীর্ণ

করা—এ সব ঘটনা ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভূমিকা সম্পর্কে পুঁজিবাদী শ্রেণীর মনে কিছুটা ত্রাসের সঞ্চার করে। অবশ্য ইদানিং এরূপ ভয় কেটেছে আর যে সরকারী ক্ষেত্র সম্পর্কে সরকারী নীতির যথার্থ মূল্যাবধাবনের পরিণতিতে ঐ শ্রেণীর মনে আত্মপ্রত্যয়ের অনুভূতি জন্মেছে। পুঁজিবাদের সমর্থনে সরকারের দায়িত্বশীল কর্তাব্যক্তিদের দ্ব্যর্থহীন উক্তির ফলেই এটা ঘটেছে।

নয়া শিল্পনীতির ভাষা ও অন্তর্বস্তুর মূল্যায়নে পরিবর্তিত আবহাওয়ার বর্ণনা সঙ্গতভাবেই Charles A. Myers এইভাবে দিয়েছেন :

"দ্রুত শিল্পায়নে বেসরকারী উদ্যোগের ভূমিকা সম্পর্কে নরমপন্থী মনোভাব ও প্রশংসা ঘোষিত নীতি ও উক্তির বেশ বিরোধী যেগুলোর প্রতি বেসরকারী ক্ষেত্রের সংযত সমর্থন দেখা গিয়েছিল। এটা আরও লক্ষ্যণীয় এই কারণে যে ব্যবসায়ী সমাজের যে সব মনোভাব ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় সেগুলোতে সরকারী কাজের নমুনাগতভাবে সুসমঞ্জস্য মূল্যধারন কিংবা সম্পূর্ণভাবে ব্যবসায়ীরা যে মানসিকতা নিয়ে কাজ করে তার সঠিক নির্দেশক নয়। কিন্তু এ ব্যাপারটার ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি এসেছে যে, যেমন ধরা যাক, বাড়তি ইস্পাত কারখানার আবশ্যিকতা সত্ত্বেও তার মালিকানার পরিবর্তে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তার দ্রুত স্থাপনা। সরকার ও ব্যবসায়ী মহলে এই বিশ্বাসই বাড়ছে যে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে পরস্পরের স্বার্থরক্ষণকারী ও পরিপূরক, বিরোধী নয়। ১৯৫৬ সালের প্রস্তাবের বিশ্লেষণে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের সংগে কার্যরত একজন আমেরিকান অর্থনীতিবিদ্ বলেছিলেন, "জাতীয় সম্পদ ও উপযোগের ক্ষেত্রে উৎপাদনরত দু একটি শিল্পছাড়া, সরকারী ক্ষেত্রের আওতায় পড়ে এমন বেসরকারী শিল্পগুলোর জাতীয়করণের সর্বাংগীণ কর্মসূচী পরিত্যাগ করেছে।" সরকার তার "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের" পরিকল্পনা কোন ক্রমেই ত্যাগ করেনি যদিও শিল্পায়নে বেশি গতি সঞ্চয়ের দিকে গুরুত্ব আরোপ করেছে আর এর অর্থ হলো বেসরকারী উদ্যোগকে পুরোপুরি ব্যবহার করা। যে সব ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ীরা সন্তোষজনক কাজ করছে সেখানে ভারতসরকার তার সীমিত মূলধন ও ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতাকে ব্যয় করতে চাইছে না। ·· সম্ভবতঃ এটা সত্য যে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ঐতিহ্যবাহী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলো ও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনে অভিলাষী সরকারের মধ্যে সঙ্গতি বিধানের প্রথম ও সবচেয়ে কঠিন পর্যায়টা সমাপ্তির মুখে।"[৪]

৪. C. A. Myers : Industrial Relations in India, pp. 48-49.

বুর্জোয়াদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী মতামত

অধিকতর নিরাপত্তা লাভ করে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর কিছু লোক জনগণের একাংশকে খুশী করার প্রয়াসে সরকার কর্তৃক গৃহীত কল্যাণমূলক কাজে 'আর্থিক অপচয়' দূরীকরণে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। তাছাড়া তারা দুটি শক্তিজোটের মধ্যে নানা কৌশলযুক্ত বিদেশ নীতি বর্জন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বিশ্বপুঁজিবাদী জোটে যোগ দিয়ে নিজের একাত্মীকরণের পক্ষে ওকালতি করছে। সরকারকে এ পরামর্শই তারা দিচ্ছে বিদেশী পুঁজিবাদী গোষ্ঠী ও সরকারগুলোর মধ্যে অধিকতর প্রত্যয় সৃষ্টি করতে যাতে তারা ভারতকে আরও বেশি আর্থিক সাহায্য দেয় ও বিনিয়োগ করে। এমন সব অপচয়কারী ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে তারা সরকারকে চাপ দিচ্ছে যেগুলো জনগণের মধ্যে মিথ্যা আশা জাগিয়ে হতাশার কারণ হতে পারে ও যার পরিণতিতে তারা বিদ্রোহও করতে পারে। এককালের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ যেমন শ্রীরাজাগোপালাচারী, রংগ প্রমুখ ও পণ্ডিত নেহরুর গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন নেতার মধ্যে নানা বিরোধ এই প্রবণতারই সাক্ষ্য দিয়েছিল। নেহরু ও রাজাজী দুটি ঝোঁকের প্রতীক ছিলেন—নেহরু ছিলেন পূর্বোক্ত মতের ধারক ও রাজাজী পরেরটির। কংগ্রেসের ভিতর এমন কি ক্যাবিনেটের ভিতরেও মোটামুটিভাবে এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ক্ষমতা অর্জনের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। দুই পৃথক মতের দিক থেকে পণ্ডিত নেহরু ও মোরারজী দেশাই সকলের দৃষ্টিতে পড়েছিলেন যদিও রাজাজীর সব মতে মোরারজী দেশাই সায় দেন নি।

বুর্জোয়া শ্রেণী ও বুর্জোয়া রাজনীতিকদের দুই গোষ্ঠীর মতামতের মধ্যে যে পার্থক্যই থাকুক না কেন খুব সংগত কারণেই এটা বুঝতে হবে যে উভয় পক্ষই কিন্তু মৌলিক অর্থে ধনতন্ত্রবাদের সংরক্ষণে ঐকান্তিকভাবে নিরত, যে ধনতন্ত্রের রূপ ও ভিন্নতা যাই হোক না কেন। এই দুটি দৃষ্টিকোণ ভারতে পুঁজিবাদের কাঠামো-গত রূপ ও তাকে সুদৃঢ় করার ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী ধারণা ব্যক্ত করেছে।

কংগ্রেস সরকারের কৃষিনীতি

আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থ "Social Background of Indian Nationalism"-এ ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান প্রধান সমস্যার উল্লেখ করেছি। আমরা এ কথা জোর দিয়েই বলেছি যে ভারতের জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনের

সমস্যার কেন্দ্রই হলো কৃষি-সমস্যা। আমরা আরও বলেছি যে কৃষি বিষয়ক সংকটের সমাধান তখনই হতে পারে যখন, প্রথমতঃ, ভূমি সম্বন্ধীয় সম্পত্তি সম্পর্কের সামগ্রিক বিপ্লব ঘটবে; দ্বিতীয়তঃ, কৃষি উৎপাদনে যথোপযুক্ত আর্থিক অবস্থা সৃষ্টি হবে; তৃতীয়তঃ, উৎপাদন কৌশলের উন্নতি বিধানে চাষীরা সুযোগসুবিধা পাবে; চতুর্থতঃ, উৎপাদনে এতটুকু অবদান না রেখে যে বিরাট সংখ্যক মানুষ কৃষির উপর চাপ সৃষ্টি করেছে তাদের অপ্রধান শিল্প ও ত্রিপর্যায়ী কাজে নিযুক্ত হবে আর পঞ্চমতঃ, সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনের সংগে সুসমঞ্জস্য কৃষি-উৎপাদনের পরিকল্পনা রচিত করে।

আমরা সংক্ষেপে কংগ্রেস সরকারের কৃষিনীতি ও কৃষি ও সামগ্রিক জাতীয় অর্থনীতির উপর তার প্রভাব পর্যালোচনা করবো। আমার আর একটা গ্রন্থ "Rural Sociology in India"-তে খ্যাতিমান বিদগ্ধব্যক্তিদের সমীক্ষা আর সরকারী ও অন্যান্য বিভিন্ন কমিটির নানা উক্তির উল্লেখ করে আমরা উন্নয়ন প্রবণতার দিকটা আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। প্রথমেই আমরা কংগ্রেস সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রধান প্রধান ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো এবং কৃষি অর্থনীতি ও সামগ্রিকভাবে কৃষি সমাজের উপর তাদের ফলাফল পরীক্ষা করবো।

সরকারী ব্যবস্থা

সরকারী ব্যবস্থাগুলোকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে :

ক) বিদ্যমান কৃষি প্রথার বিকাশ ও উন্নয়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা।

১) চাষের জন্য কোন্ কোন্ ধরণের জমি উদ্ধার।

২) মুখ্য ও গৌণ জলসেচ প্রকল্প রূপায়ন—তাদের মধ্যে কয়েকটি হবে বহু-মুখী বিশিষ্ট।

৩) উন্নত বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ও কীটনাশক ঔষধের উৎপাদন।

খ) ভূমি সম্পর্কের সংস্কারে গৃহীত ব্যবস্থা

১) ক্ষতিপূরণের ভিত্তিতে মধ্যবর্তী ভূ-স্বত্বাধিকারীদের সম্পত্তির অধিকার অর্জন (জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি)—কয়েক ধরণের সম্পত্তি যেমন, গৃহসংলগ্ন কৃষিজমি, বাস্তু প্রভৃতি ছাড়া।

২) বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের দ্বারা জমির ভবিষ্যৎ অধিগ্রহণের উপর সীমা-

রেখা আরোপ।

৩ খাজনা হ্রাস, প্রজাদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তাদান ও জমির উপর নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে স্থায়ী অধিকার অর্জনের সুযোগ দেওয়ার জন্য, জমিদারের নিজের চাষের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি রাখার অধিকার রেখে প্রজাস্বত্ব সংস্কার।

৪) জমি কেনাবেচা, বন্ধক ও ভাড়া খাটানো ও ইজারা দেওয়ার উপর সীমারেখা আরোপ।

গ) পাওনাদারদের উৎপীড়ন থেকে কৃষকদের রক্ষা করার ব্যবস্থাদি

১) মহাজনদের ঋণদান নিয়ন্ত্রণে অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ।

২) ঋণ আনুপাতিকহারে কমানোর ব্যবস্থাদি নেওয়া।

ঘ) গ্রামাঞ্চলের সংগঠন বিকাশে ব্যবস্থা গ্রহণ যাতে সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির শক্তিবৃদ্ধি ঘটে।

১) সমষ্ঠি উন্নয়ন ব্লক ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা প্রকল্প।

ঙ) গ্রামীণ মানুষদের জীবনের মনোন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে নতুন সংগঠন সৃষ্টি।

১) সমবায় সমিতি, বিকাশ মন্ডল, গ্রাম পঞ্চায়েত ও ন্যায় পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা।

২) গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু ক্ষুদ্র ও গৃহশিল্পের সাহায্যে ব্যবস্থা গ্রহণ।

গৃহীত ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া

গ্রামাঞ্চলে গণবেকারত্বের প্রধান সমস্যার উপযুক্ত সমাধানে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। ক্ষেত মজুরেরা কৃষকদের এক-তৃতীয়াংশ হলেও তাদের জমি দেওয়া হয় নি কিংবা সহনশীল জীবন ও জমিতে কাজের অবস্থাও তারা পায় নি। যেমন David Mandelbaum বলেছেন, "সবচেয়ে নীচু জাতের লোকেরা যারা প্রধানতঃ ভূমিহীন কৃষক, জলসেচ প্রকল্পগুলো ও জমি পুনর্বণ্টনের কর্মসূচী থেকে প্রায়ই কিছু পায় না। কোন কিছু সুরু করার কোন অবলম্বনই নেই তাদের, কিংবা নেই এমন কিছু যার উন্নতি তারা করতে পারে আর তাই তারা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে বঞ্চিত। 'উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর জন্য বরং প্রায়শ অন্যান্য গ্রামবাসী ও তাদের মধ্যেকার ব্যবধানটা কমছে না বরং বাড়ছে।"[৫]

৫. India's Villages (A Collection of articles originally published in the Economic Weekly of Bombay), p. 15.

কৃষি সংস্কারের প্রাণকেন্দ্র সম্পর্কে অধ্যাপক গ্যাডগিল (Prof. Gadgil)

ভারতে "কৃষি সংস্কারের প্রাণকেন্দ্র" সম্পর্কে, যেমন, কৃষি উৎপাদনের সংগঠন, বিশেষ করে, তার আয়তন ও এককের কাঠামো সম্পর্কে Prof. Gadgil খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, "কৃষি উৎপাদনের বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করেই সরকারকে সন্তুষ্ট থাকতে দেখা যাচ্ছে এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা ও কাজের সংগঠনে কোন আমূল পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব সে করে নি।"[৬] এ ধরণের পরিবর্তন প্রচলিত কৃষি উৎপাদন সম্পর্কের কাঠামোতে একটা—বিপ্লবকেই বোঝাবে যা সমাজের বিপুল সম্পত্তির মালিক শ্রেণীর মৌল স্বার্থ সংরক্ষণকারী কংগ্রেস সরকার আনতে পারে না। তাছাড়া সম্প্রতি তার সমবায় চাষের শ্লোগান ও কর্মসূচীর পক্ষে আয় পরিষ্কার বোঝায় কেমন করে সরকার নিজেই তার পূর্ববর্তী ব্যবস্থাদির ব্যর্থতা স্বীকার করেছে। অবশ্য, শ্লোগানটির যথাযথ পরীক্ষান্তে আমরা দেখবো যে তার কৃষি নীতিতে কোন মৌলিক পরিবর্তন সে চাইছে না ; যেমন কিছুটা অদলবদল সহ কৃষি সমাজের শ্রেণী কাঠামোকে বজায় রাখা।

ভূমি সংস্কারের সমালোচনা

সরকার প্রবর্তিত ভূমি সংস্কার বিষয়ে অসংখ্য গবেষণা প্রমাণ করেছে যে গ্রামীণ সমাজের মূল শ্রেণী কাঠামোকে তারা পরিবর্তিত করতে পারেনি বরং পুরাতন জমিদারদের এক নতুন ধরণের জমির ধনী মালিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত করেছে। যদিও তারা বেশ কিছু প্রজাকৃষককে স্বত্ববান কৃষকে পরিণত করেছে, তবু বিরাট সংখ্যক দরিদ্র কৃষক ও প্রজাকৃষক তাদের চরম দারিদ্র্যের দরুন ক্ষতিপূরণ দান ও জমি ক্রয়ে অক্ষম হয়ে জমিতে নিরাপত্তাহীন কৃষকের পর্যায়ে নেমে এসেছে যা বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতিতে তাদের খেত মজুরদের বাস্তব মর্যাদা দিতে পারে মাত্র।

যেমন Prof. Thorner কিছু না ঢেকেই বলেছেন, "সামাজিক দিক থেকে অনুন্নতদের জন্য প্রণীত লোক দেখানো ভূমি সংস্কার আইন ভারতের গ্রাম্য কাঠামোর মৌল পরিবর্তন আনতে পারেনি। মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীতন্ত্রই এ সব আইনের সুযোগ নেওয়ার যথেষ্ট বুদ্ধি ও ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া আইনগুলোর

৬. Prof. D. R. Gadgil : Presidential Address at Allahabad, 1954.

বড় বড় ছিদ্র তাদের কৌশলগত নানা সুযোগও দিয়েছে। আইনসম্মতভাবেই হোক আর বেআইনী করেই হোক নিজেদের চাষী বলে চালিয়ে গ্রামের মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভারতের গ্রামগুলোতে নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে তাদের অবিরাম অবস্থানের অর্থই এই যে গ্রামাঞ্চলে "উৎপীড়কের' শক্তিগুলো নিরন্তর শক্তভাবেই কাজ করে যাচ্ছে।"[৭]

জমিদারী উচ্ছেদ ও জমিতে সম্পত্তি সম্পর্কিত অনুরূপ আইনকানুন, অনেক পর্যবেক্ষকের মতে, নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলো থেকে ভুগছে ঃ

(১) 'কৃষক' শব্দটির অতি অস্পষ্ট সংজ্ঞা আসল চাষীর চেয়ে বাস্তবে মালিকদেরই ভূমি সংস্কার আইনগুলোর ব্যাখ্যা বেশি সুযোগসুবিধা দিয়েছে।

(২) এই সব আইনকানুনের ছিদ্রগুলো ভূমি স্বত্বাধিকার বজায় রাখতে ভূমির মালিকদের নানা সুবিধা দিয়েছে।

(৩) জমিদার কিংবা অন্তর্বর্তী শ্রেণীকেই দিতে হবে ক্ষতিপূরণ, অথচ চাষী বা প্রজাদের নিকট স্বত্বাধিকার হস্তান্তরিত হবার কথা। স্বাভাবিকভাবেই ধনী চাষী ও প্রজাদের একটা অংশই ক্ষতিপূরণ দানের ক্ষমতা ভোগ করে বলে জমি ক্রয়ের সামর্থও রাখে। আইনপ্রদত্ত সুবিধা তাই দরিদ্র চাষী ও প্রজাদের এক বিরাট অংশ নিতে পারে না। তাছাড়া, ঐ আইনের পরিণতিতেই দরিদ্র প্রজাদের এক বড় অংশকে, যারা জমি কিনতে অসমর্থ, অরক্ষিত করেছে ও ভূমিহীন খেত মজুরের পর্যায়ে প্রায় নামিয়ে দিয়েছে—বর্তমান অগুণতি ভূমিহীন মজুরদের সংখ্যাটাই বেড়েছে তার ফলে।

(৪) কৃষি অঞ্চলে এ ব্যবস্থা আইনসংক্রান্ত শত্রুতার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। ভূমিস্বত্বাধিকার, জমি থেকে প্রজা ও উপপ্রজাদের উচ্ছেদ প্রভৃতি নিয়ে নানা বিবাদ ও মামলা গ্রামের পরিমন্ডলকে উত্তেজনাপূর্ণ করে রেখেছে।

কৃষি আইনের উপর বিশেষজ্ঞ একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক তীক্ষ্ণভাবে মন্তব্য করেছেন, "যদি ভারতের সাম্প্রতিক কৃষি ইতিহাস কিছু প্রমাণও করে থাকে সেটা হলো এই যে কিছু না করা বা বলাটাই ছোট ছোট শ্লথগতি ও ভীরু পদক্ষেপের তুলনায় ভূস্বামীদের অধিকতর পছন্দ। ভারতীয় পরিস্থিতিতে যদি অ-কৃষক ভূ-স্বামীদের নীতি একেবারে বাদ না দিতে পার তবে তুমি গ্রামের মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীযুক্ত লোকদের জমিদারে পরিণত হওয়া থেকে বাধা দিতে পারবে না। কৃষক

৭. Daniel Thorner : The Agrarian Prospect in India, p. 79

নয় এমন ভূস্বামীদের সম্পত্তি আয়ের দরজা তুমি একটু খুললেই—আর তা তোমাকে করতেই হবে যতক্ষণ মাঠে শ্রম বিনা ভূসম্পত্তির মালিকানা তুমি জিইয়ে রেখেছো—তুমি গ্রামীণস্তরে ক্ষমতা কেন্দ্রীভবনের সমস্ত প্রকার দোষগুলোকে দুলকি চালে চলে আসতে দেখবে। যতদিন কিছু কৃষক ভূমিহীন অথবা খুব কম জমির মালিক থাকবে তারা অ-কৃষি ভূস্বামীদের করুণার পাত্র হবেই। সংগঠিত-ভাবে এড়ানোর কৌশলের সমস্ত জগৎটাই, যার নিদর্শন বহু-সংখ্যক গ্রামেই রয়েছে, বিরামবিহীন ভাবেই চলবে।[৮]

সংক্ষেপে, পুঁজিবাদী দৃষ্টিভংগীর দরুন কংগ্রেস সরকার একটা ব্যবস্থা নেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে যদিও তা আসল উদ্দেশ্যটির রূপায়নের পথে একেবারেই প্রথম অপরিহার্য ধাপ। সেটা হলো জমির প্রকৃত চাষীকে জমি হস্তান্তর। সমস্ত অনগ্রসর দেশের ইতিহাসই বলে কেমন ভাবে এই প্রারম্ভিক অথচ অপরিহার্য ব্যবস্থাটা ছাড়া কৃষি-অর্থনীতির নবরূপ দান এবং কৃষকদের দারিদ্র্যের অবলোপনের জন্য গৃহীত আর সব ব্যবস্থাই ব্যর্থ হয়েছে। একই সত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের কৃষির ইতিহাস। শুধু তাই নয়। আমরা আরও বলতে পারি যে এ পদক্ষেপ যতক্ষণ না নেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ কৃষি অঞ্চলে উন্নত কৃষি কিংবা সামাজিক শান্তির দেখা মিলবে না। চাষীদের সবচেয়ে বড় ক্ষুধা জমির জন্য, আর এ ক্ষুধা না মিটলে কিষাণ সমাজ চিরকালই অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবে আর জমির জন্য স্বতঃস্ফূর্ত ও সংগঠিত সংগ্রাম সুরু করবে।

সংগতিসম্পন্ন চাষীদের সুযোগসুবিধা গ্রহণ

যেহেতু জলসেচ ব্যবস্থার সুবিধা, বীজ, আরও উন্নত যন্ত্রপাতি চাষীদের বিনা পয়সায় দেওয়া হয় না, বরং সেগুলোর বিনিময়ে অর্থ দিতে হয়, সেহেতু সে সব সুবিধা সুযোগের সদ্ব্যবহার, যেমন সমষ্টি উন্নয়ন মূল্যায়ন রিপোর্ট বলছে, কেবলমাত্র সংগতিসম্পন্ন চাষীরাও করতে সক্ষম।

মহাজনী কারবারের দোষগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার সরকারী ব্যবস্থাগুলোর ফলাফল খুব ভাল হয় নি। তার প্রমাণ মিলেছে গ্রাম্য ঋণ সার্ভে ও অন্যান্য গবেষণায়। তাছাড়া মহাজনদের ধরণটাই পাল্টে গেছে। সংগতি সম্পন্ন চাষী

৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৮২

বা জমিদাররা সমবায় সমিতি ও এই ধরণের সংস্থাগুলোতে তাদের প্রাধান্যপূর্ণ অবস্থানের সাহায্যে আগেকার দিনের মহাজনদের মতই নানা উপায়ে ও বিভিন্ন বেশে একই প্রকার লুন্ঠনকার্য চালিয়ে যাচ্ছে'।

ধনিকশ্রেণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গ্রামীণ সংস্থাগুলো

সকলেই মনে করেন যে কৃষি পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে সরকারী নানা ব্যবস্থা হতে উদ্ভূত বিভিন্ন সংগঠনগুলো কৃষি সমাজের ধনী লোকদেরই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধিই করেছে। সমষ্টি প্রকল্প মূল্যায়ন রিপোর্ট এ ঘটনার কথা বলেছে এইভাবে, "বিভিন্ন গ্রামীণ সংগঠনের সদস্যভুক্তির নমুনা-খানা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে সংগঠন সমবায় সমিতি, বিকাশ মন্ডল, গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা ন্যায় পঞ্চায়েত যাই হোক না কেন, তাদের অধিকাংশ সমস্যাই এসেছে বড় বড় কৃষক পরিবার থেকে। ছোট চাষী কিংবা ক্ষেত মজুরদের এ সব সংস্থায় কোন স্থান নেই বললেই চলে।'[৯]

বিরাট বিরাট সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পগুলো তাদের সমষ্টি প্রকল্প ও সম্প্রসারণ পরিষেবা প্রধানতঃ কৃষি সমাজের ধনিক শ্রেণীকেই বেশি সুযোগসুবিধা দিয়েছে।

সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বহু পন্ডিত ব্যক্তি ও সংগঠনের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে। গ্রামের জনগণের উপর এদের প্রভাবের মূল্যায়ন করেছেন Prof. Wilson, Prof. C. Taylor, Prof. Oscar Lewis, Prof. Opler ও তাঁর দল, Prof. Mandelbaum, Prof. Dube, Dr. Chapekar, Dr. Sangave প্রমুখ পন্ডিতেরা। প্রকল্প মূল্যায়ন সংস্থা ও বিশেষ কমিটি-গুলোও সুসম্বন্ধভাবে এ সব বিরাট ও ব্যয়বহুল প্রকল্পগুলো নিয়ে গবেষণা করেছেন যাদের লক্ষ্য হলো একটা সমৃদ্ধ কৃষি ও বস্তুগত ও কৃষিগতভাবে উন্নতি-শীল গ্রামীণ সম্প্রদায় গড়ে তোলা।

বিপজ্জনক প্রবণতা

বিশেষজ্ঞ ও সরকারী মূল্যায়ন কমিটি ও সংস্থাগুলোর রিপোর্ট ও গবেষণা-পত্রে নিম্নলিখিত ভয়াবহ ফলাফলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে :

৯. Evaluation Report, 2nd Years Working of Community Projects, Vol. I, pp. 139-141.

(ক) সংগতিসম্পন্ন চাষীরাই উন্নয়নের সুযোগসুবিধাগুলো প্রধানতঃ ভোগ করেছে।

(খ) গ্রামীণ জনগণ কর্তৃক সাহায্য দানের ব্যাপারটা জনগণের নিম্নবর্গের লোকদের কাছে বড় বোঝা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(গ) এ সব অঞ্চলে পরিবর্তন আনয়নে উদ্ভূত সংস্থাগুলোয় গ্রামের জনগণের উচ্চ বর্গের লোকদেরই আধিপত্য রয়েছে ও সেগুলোতে দরিদ্রতর মানুষের কোন ভূমিকা নেই।

(ঘ) প্রকল্পগুলো কর্তৃক সৃষ্ট প্রারম্ভিক উৎসাহ নিম্নতর জনগণের মধ্যে ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে।"[১০]

নতুন ধরণের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত

কংগ্রেস সরকারের কৃষিনীতি কয়েকদিক থেকে কৃষি সমাজকে প্রভাবিত করেছে। সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের মত পুরাতন কয়েকটি শ্রেণীকে তা পংগু করে দিয়েছে। বরং সংগতিসম্পন্ন চাষীদের একটা শ্রেণীর সংহতি ও শক্তি-বৃদ্ধি করেছে। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত চাষী সম্প্রদায়, ক্ষেত মজুর ও গ্রামীণ জনগণের নিম্নতর অংশের লোকজনদের কথা ধরলে, কৃষি নীতির বাস্তবায়ন অন্যান্য কর্ম-সূচীগুলোসহ তাদের বৈষয়িক জীবনযাত্রার কোন উন্নতি ত করেই নি বরং তাদের প্রচলিত অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়েছে।

আমরা পূর্ববর্তী এক সমীক্ষায় বলেছি, "সরকারের কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে গৃহীত ব্যবস্থাগুলোর ফলশ্রুতি হিসেবে, স্বার্থের একটা তীব্র সংঘাত ও তারই পরিণতি-স্বরূপ উদ্ভূত সামাজিক ফাটল গ্রামাঞ্চলে দেখা যাচ্ছে। একদিকে রয়েছে সমৃদ্ধি-শালী চাষী, জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী ও গ্রামের জনগণের মধ্যেকার কিছু ধনী লোক, অন্যদিকে রয়েছে মধ্যবর্তী ও ছোট চাষীরা. ক্ষেত মজুরদের বিরাট বাহিনী ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অ-কৃষি জনসংখ্যা...। আমরা আগে ত বলেইছি, সামাজিক জাতপাত ও আর্থিক শ্রেণীগুলো নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ফলে শ্রেণীসংঘাত অনেক সময়ই বিভিন্ন জাতের সংঘাতও বুঝিয়ে থাকে। এইভাবে গ্রামাঞ্চলগুলো নতুন নতুন জাতের সংঘাতে ভরে উঠেছে। এগুলো দেখা যায়

১০. পূর্বোক্ত রিপোর্ট, পৃঃ ১৪০-১৪১

কখনও কখনও নির্বাচনকালে, কখনও বা অর্থনৈতিক সংগ্রামে, আবার কখনও বা স্থানীয় সংগঠনগুলোর সংঘাতের মধ্যেও। উত্তেজনার নতুন নতুন নমুনা প্রকাশ্য মঞ্চে চলে আসছে। এদের বিস্তৃতিও ঘটছে বেশ।"[১১]

বিভিন্ন সরকারী ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামাঞ্চলে যে সব পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার ফলশ্রুতিতে গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ বাড়ছে আর তারা জাতপাত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিক পটভূমিতে তাদের মধ্যে উত্তেজনা, বৈরিতা ও সংঘর্ষ বাড়াচ্ছে। এদের পুরো গুরুত্ব অনুধাবন ভারতীয় সমাজের সামগ্রিক বিকাশের গতিকে বুঝতে দরকার।

বাস্তবে, কৃষি অর্থনীতির বিকাশের বর্তমান প্রবণতা স্পষ্টতই বলছে যে, যে সরকার মিশ্র অর্থনীতি ও উৎপাদনের মুনাফা লাভের বুর্জোয়া অর্থনৈতিক তত্ত্বে বিশ্বাসী সে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা তথা কৃষি সমস্যার সফল সমাধানে অক্ষম। অন্ততঃ এই তত্ত্বের ভিত্তিতে কৃষি সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে না। বস্তুতঃ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যা, যেমন, খাদ্য, কর্ম-সংস্থান, উন্নততর জীবনযাত্রার মান, লঘু শিল্পগুলোতে গতি সঞ্চারকারী জনগণের ক্রয়ক্ষমতা প্রভৃতি এখনও সমাধানের অপেক্ষায় রয়েছে।

সরকারের সাধারণ অর্থনৈতিক নীতি

কংগ্রেস সরকার ব্রিটিশ শাসন থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একটা অনগ্রসর ঔপনিবেশিক জাতীয় অর্থনীতিকে সুদৃঢ় শিল্পায়নের ভিত্তিতে সমৃদ্ধিশালী, স্বাধীন ও ভারসাম্যযুক্ত অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্য সামনে রেখেছে। আমরা আগেই দেখেছি, যে সরকার মিশ্র অর্থনীতির মৌলিক স্বীকার্যের গন্ডীতেই এই রূপান্তর সাধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ কাজ সম্পাদনে সরকার নিম্নলিখিত দুটি সমস্যার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ঃ

(১) পরম্পরাগত উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ কেমন ভাবে করা যাবে?

(২) ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে এসব সম্পদ সৃষ্টি কেমন ভাবে হবে?

১১. Transaction of the Third Congress of World Sociological Congress, Vol. I, p. 276

ব্রিটিশদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ভারতের অনগ্রসর ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণে পর্যাপ্ত সম্পদ ছিল না। কংগ্রেসের সামনে তাই সর্বপ্রথম সমস্যা ছিল কতখানি দ্রুত সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়। তাছাড়া, জাতীয় অর্থনীতির ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে তারা সম্পদ বৃদ্ধির যে কৌশলই উদ্ভাবন করুক না কেন তা হবে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির গর্ভজাত। এর অর্থ হলো এই যে সম্পদ বর্ধনের প্রক্রিয়াকে এমন-ভাবে পছন্দ করতে হবে যাতে প্রথমতঃ, পুঁজিবাদী ও অন্যান্য সম্পদশালী শ্রেণীগুলো অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী হবে আর দ্বিতীয়তঃ বর্ধিত সম্পদকে হাতে রাখতে এই সব শ্রেণীকে ততদূর সুযোগ দিতে হবে যতদূর তারা তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে যথেষ্ট উৎসাহ পেতে থাকে।

দেশীয় সম্পদের দ্বিগুণ নিষ্কাশন

শিল্প ও কৃষি প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে পুঁজি সংগ্রহে সরকার যে সব অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি নিয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে মজুত স্টার্লিং ভান্ডার, ঘাটতি ব্যয় ও ভারী পরোক্ষ কর ব্যবস্থা। তবে এখন এ তিনটে উৎসমুখই প্রায় শুকিয়ে এসেছে। কয়েকটি বুর্জোয়া অনুমানের সংগে সংগতি রেখে সরকার অন্য কয়েকটি রিজার্ভের দিকে তাকায় নি। উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে যে সব ভান্ডারের দিকে তাকানো উচিৎ ছিল সেগুলো হলো ধনিক শ্রেণীর হাতে মজুত বিরাট পরিমাণ স্বর্ণভান্ডার, রাজা, জমিদার ও পুঁজিবাদীদের সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ অর্থ, শিল্পপতি ও সম্পদশালী অন্যান্য গোষ্ঠীর দ্বারা গোপনে ও অসাধু উপায়ে সঞ্চিত পাহাড় প্রমাণ টাকা, ধর্মীয় ও অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠান ও ট্রাস্টের হাতে প্রচুর টাকা পয়সা, ভারতে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের পরিণতিতে মুনাফা প্রভৃতি। প্রয়োজনের তুলনায় এ সব আর্থিক সম্পদ হয়ত পর্যাপ্ত হত না, তথাপি তাদের প্রারম্ভিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যেত না। অধিকন্তু, কংগ্রেস সরকার শুধু এসব সম্পদ সংগ্রহের চেষ্টাই শুধু করে নি ; বরং রাজন্যবর্গকে মুক্ত হস্তে 'সালিয়ানা', জমিদারদের উদার ক্ষতিপূরণ আর পুঁজিবাদীদের রাষ্ট্রসৃষ্ট বিভিন্ন আর্থিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে রাজস্বখাত থেকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। পুঁজি-বাদীদের এক বড় গোষ্ঠীর কাছ থেকে অনাদায়ীকৃত গোপন করের টাকা মাপ করে

দিয়েছে। অন্যদিকে সস্তাদরে ভোগ্যদ্রব্যের নিশ্চিত আশ্বাস না দিয়ে আমদানী-কৃত দ্রব্যাদির উপর সংরক্ষণমূলক শুল্ক বসিয়ে তাদের মুনাফা অর্জনে আরও সাহায্য করেছে।

গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা

জাতীয় সম্পদের এরূপ দ্বিগুণ নিষ্কাশনের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়, শুধু এইটুকু বলা যায় যে সরকার পুঁজিবাদী ধারনার উপর ভিত্তি করে, বিশেষ করে, প্রারম্ভিকভাবে. ধনতান্ত্রিক আর্থিক কাঠামোর স্বার্থের দৃষ্টিকোণ হতে আর গৌণভাবেই শুধু জনকল্যাণের দিক থেকে কাজ করেছে। কখনও কখনও বলা হচ্ছে যে কংগ্রেস সরকারের আর্থিক পরিকল্পনা চরিত্রগতভাবে গণতান্ত্রিক। একজনের মনে একটা প্রশ্ন সম্পর্কে এ অপ্রতিরোধ্য কৌতুহল জাগতে পারে যে, যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবার সমগ্র জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে যখন জনগণের বিরাট অংশ প্রচন্ড দারিদ্র্য, জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনের জন্য সংগ্রাম ও বহুকাল ধরে লক্ষ লক্ষ বেকারের অবস্থিতি রয়েছে, তখন গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা কি খুঁজে পাওয়া যায়! মনে বিস্ময় জাগে, প্রশ্ন ত বটেই, যে এটা কি ধরণের গণতন্ত্র যেখানে সরকার জ্ঞানে কি অজ্ঞানে দৃঢ়ভাবে বিত্তবানদের রক্ষা করছে, আর্থিক সমর্থন দিচ্ছে, যখন, অনুরূপ দৃঢ়তার সংগে সেই সব আর্থিক ব্যবস্থাই নিচ্ছে যেগুলো তাদের স্বল্প সম্পদ নিষ্কাশিত করে দিচ্ছে আর ঘাড়ে ভারী করের বোঝা চাপিয়ে জীবনযাত্রার মানকে আরও নীচু করে দিচ্ছে। আরও বিস্মিত হতে হয় এ গণতন্ত্রের গুণ দেখে যা সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিকতায় আর কর্মের অধিকারকে প্রাসংগিক অধিকার বলে মনে করে।

অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়াসে বিভিন্ন পরিকল্পনার আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির এ পদ্ধতি আত্মবিরোধী হলেও সত্য। যেহেতু আসল বোঝাটাই চাপে সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজনের ঘাড়ে সেহেতু তাদের ক্রয়ক্ষমতা বিপজ্জনক-ভাবে কমে যায় আর তার ফলে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলোর পক্ষে প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া, আর্থিক সম্পদের উৎসমুখটাই তা নিষ্কাশিত করে দেয়। সমাজের এ সব স্তরে আয় বাড়লেই তারা পরিকল্পনার আর্থিক সংস্থানে উদারভাবে সাহায্য করতে পারে। তাই পুঁজিবাদী চিন্তাপ্রসূত পরিকল্পনার এমন সব নীতি উদ্ভাবিত হয় যেগুলো

অতিরিক্ত কর ও অন্যান্য উপায়ে সাধারণ মানুষের আয়স্রোত ক্রমান্বয়ে কমিয়ে দেয়। সেই উৎসমুখটাই শুষ্ক করে দেয় যেখান থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা যেত। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করে তা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলোর শুধু প্রসার কেন, তাদের বজায় রাখার পথও বন্ধ করে দেয়। ফলে হাল্কা শিল্পগুলোর ক্ষেত্রে সংকট নেমে আসে।

আর্থিক উভয় সংকট

ক্রমবর্ধমান ভাবে অভ্যন্তরীণ বাজারের সংকোচন পুঁজিবাদীদের এমন এক পরিস্থিতিতে নিয়ে আসে যেখানে তাদের সামনে আসে উভয় সংকট, যেমন, হয়ত রপ্তানী কর, নয়ত ধ্বংস হও।

কিন্তু ভারতীয় পুঁজিবাদীরা অধিকতর শিল্পোন্নত ও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পঃ জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশগুলোর সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ক্রমশই অসুবিধা বোধ করে। যুদ্ধের সময় পংগু হয়ে পড়া এসব দেশের অর্থনীতিও যুদ্ধোত্তরকালে পুনর্জন্ম পেয়েছে। ফলে ক্রমশই এ সব দেশ বিদেশী বাজার থেকে ভারতবর্ষকে হটিয়ে দিচ্ছে। ফলে, ভারতীয় পুঁজিবাদের রপ্তানী নির্গমনটাও ছোট হয়ে আসছে।

সরকারী ও বেসরকারী পরিচালনাধীন ভারী শিল্পগুলোর ক্ষেত্রেও একই সংকট। যেহেতু সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশই কমে গেছে সেহেতু হাল্কা শিল্পগুলোও প্রসারিত হচ্ছে না অথবা তাদের ক্ষেত্রেও এসেছে আধা-সংকট। ভারী শিল্পগুলোর উৎপাদিত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির চাহিদাও হ্রাস পেয়েছে। ফলতঃ রাষ্ট্রই হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের আসল ক্রেতা। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্রয়ক্ষমতাও ত তার আর্থিক অনটনের দরুন সীমিত যে ক্ষমতা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে, তার সম্পদের উৎসমুখগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে বলে। জনগণের বিপুল অংশ এমন এক স্তরে পেঁৗছেছে যখন তারা আর তাদের উপর পরোক্ষ করের বোঝা বইতে পারছে না।

এসব বিষয়ের ক্রমপুঞ্জিত পরিণতিতে জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন স্তরে একটা ভারসাম্যহীন অপ্রতিসম বিকাশ ধরা পড়েছে। অর্থনীতির বিভিন্ন অংশে স্বাভাবিক ভাবেই সামঞ্জস্যের অভাব দেখা দিয়েছে। জাতীয় অর্থনীতি তাই কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতার মুষ্টিতে বাঁধা পড়েছে।

বিদেশী পুঁজির জন্য মরিয়া ভাব

এ পরিস্থিতি বিদেশী পুঁজির জন্য মরিয়া হয়ে ছোটাছুটির পথটাই প্রশস্ত করেছে, আর্থিক সাহায্যের অনুসন্ধানে সরকারী ও বেসরকারী বিদেশী এজেন্সীর কাছে পাগলের মত দরবার করতে হয়েছে যাতে চরম অচল অবস্থার হাত থেকে, এমন কি মৃত্যুর হাত থেকে জাতীয় অর্থনীতিটাকে বাঁচানো যায়। বিদেশী সরকার ও বেসরকারী কর্পোরেশনগুলোকে বোঝানোর জন্য ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের হামেশাই বিদেশে পাড়ি দেওয়া, আর বিড়লাদের মত ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বড় কর্তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পঃ জার্মানী ও অন্যান্য আরও ক্ষমতাশালী আর্থিক গোষ্ঠীদের স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে ভালিয়ে এদেশে মূলধনের বিনিয়োগের জন্য তাড়াতাড়ি বিদেশে যাওয়া চূড়ান্তভাবেই বলে দিচ্ছে যে পুঁজিবাদী ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিকে চাংগা করার প্রয়াসে কংগ্রেস সরকার ও বেসরকারী পুঁজি-বাদীদের আর্থিক নীতিগুলো এ যাবৎ ব্যর্থ হয়েছে।

Prof. Baran চিন্তার খোরাক দেয় এমন একটি গ্রন্থ "The Political Economy of Growth" সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছে বিদেশী সাহায্যের কেমন নিজেরই একটা অপরিহার্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে।[১২] যখন কোন শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক দেশ কোন দুর্বল দেশকে আর্থিক সাহায্য দেয় তখন সাধারণতঃ তার ফলে দুর্বল দেশটির উপর প্রথমোক্ত দেশটির ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক নির্ভরশীলতা, এমন কি অধীনতাও ঘটে। তাছাড়া, বিদেশী পুঁজিবিনিয়োগ-কারীরা পুঁজিবিনিয়োগের ক্ষেত্রে এমনভাবে করছে যাতে তাদের হাতে আসে সর্বাধিক মুনাফা। তাদের নির্ণয়টাই হলো তাদের মুনাফার স্বার্থ, যে দেশে তারা অর্থ বিনিয়োগ করছে তার মুক্ত, দ্রুত ও সামঞ্জস্য বিকাশের প্রয়োজনে নয়। তাদের সাহায্যের পরিণতিতে সেদেশের জাতীয় অর্থনীতির ভারসাম্যহীন অসামঞ্জস্য বৃদ্ধিই ঘটে। বইটির পূর্ববর্তী অংশে এ ঘটনার আলোচনা রেখেছি।

বুর্জোয়া দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র মতবিরোধ

বুর্জোয়া শ্রেণীর দুটি পক্ষ, একটি পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বাধীন ও অন্যটি "Forum of Free Enterprise"-কে কেন্দ্র করে শ্রীমোরারজী দেশাই ও অধুনা

১২. দ্রষ্টব্য : Prof. Paul Baran-এর The Political Economy of Growth

প্রতিষ্ঠিত স্বতন্ত্র দলের বিদেশী মূলধন সাহায্যের সমস্যা নিয়ে দুটি পরস্পর বিরোধী মত শোনা গেছে। পণ্ডিত নেহরুর পক্ষ বলছে দুই শক্তি জোটের সংঘাতের পুরো সুবিধা নিয়ে দুটি (জোটের একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যটি সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্তৃত্বাবধীন) থেকেই সাহায্য নেওয়া উচিত। অবশ্য এ পক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কমনওয়েলথের দেশগুলোর দিকেই ঝোঁকটা বেশি রাখতে ইচ্ছুক। ধনতন্ত্রী দেশগুলোর প্রতি এই ঝুঁকে পড়াটা অপরিহার্য কেননা ভারতে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঐ সব দেশের মতই পুঁজিবাদী। অবশ্য পণ্ডিত নেহরু এই মতেরও চরম পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন যে ভারতের উচিৎ হবে একটা জোট নিরপেক্ষ ভূমিকা নেওয়া ও স্বাধীন বিদেশ নীতি অনুসরণ করা। এ পক্ষ আরও চায় সরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ও জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ ও চরিত্র নিয়ন্ত্রণে তার চূড়ান্ত ও প্রধান ভূমিকা। সমাজসেবা মূলক কাজের বড় ধরণের প্রকল্পেরও এরা সমর্থক। এদের বিশ্বাস যে দুর্বল জাতীয় অর্থনীতিতে এ কাজ যতই অবিবেচক মনে হোক না কেন তা জনগণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে প্রশমিত করতে পারে।

অন্যপক্ষ ধনতান্ত্রিক শক্তিজোটের সংগে আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও বেসরকারী উদ্যোগ ও অধিকতর সুযোগসুবিধার প্রয়াসে স্বার্থহীন মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের উপর রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া উদ্যোগের (যা সরকারী ক্ষেত্র নামেও পরিচিত) ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের বিরোধী তারা। এরা অর্থনীতির স্বার্থেই ব্যাপক সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্পেরও বিরুদ্ধে।

বুর্জোয়াদের এ দুটি পক্ষের মধ্যে চলেছে তীব্র বিতর্ক ও সংঘাত। এ বিতর্ক ও সংঘাত কংগ্রেস, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে সামগ্রিকভাবে দুটি বৈরী জোটে ভাগ করে ফেলেছে। অবশ্য এ কথা মনে রাখা দরকার যে উল্লিখিত দুটি পক্ষ কিন্তু চূড়ান্ত অর্থে একই শ্রেণীর —সেই বুর্জোয়া শ্রেণীরই দুটি পক্ষ বা গোষ্ঠীমাত্র।

Prof. Ball-এর সুচিন্তিত অভিমত

তাছাড়া, যেমন পূর্বেই বলা হয়েছে, কংগ্রেস সরকারের শিল্প ও কৃষি বিষয়ে আর্থিক নীতি ভারতের আর্থিক বিকাশকে একটা অচলাবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে। বস্তুগত দৃষ্টিতে তা দরিদ্র মানুষদের অসুবিধা ঘটিয়ে ধনীদের শক্তিশালী করে তুলছে আর জনগণের

মধ্যে আর্থিক অসাম্যের গতিকে দ্রুততর করে তুলছে। কংগ্রেস সরকারের আর্থিক নীতিগুলোর তাৎপর্য আলোচনার উপসংহার টানবো আমরা Prof W. M. Ball-এর নিম্নলিখিত চিন্তাপূর্ণ মন্তব্যগুলো উল্লেখ করে :

"অবশ্য, ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে কংগ্রেস তার পথ পরিবর্তন করে। রক্ষণশীল শক্তিগুলোকে খুশী করার ব্যাপারে সে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছে যেগুলো তার কর্মসূচীতে বিচ্ছিন্নভাবে অন্তর্ঘাত নিয়ে আসতে পারতো। রাজন্য-বর্গকে সে মোটা পেন্সন দিয়ে আর জমিদারদের উদার হস্তে ক্ষতিপূরণ দিয়ে সে তোষন করেছে। ভারতের জনপালন কৃত্যককে তার পূর্বতন সর্তগুলোর গ্যারান্টি দিয়ে তাবেও খুশী করেছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের পথটাই মসৃণ করা হচ্ছিল যাদের সে পূর্বতন ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছিল। ১৯৪৮ সালে শিল্পপতিদের তোষন পূর্বেকার ক্ষমতা ও সুযোগসুবিধার সংরক্ষণ ও শক্তিবর্ধনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। কংগ্রেসের নতুন নীতির প্রকাশ ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিলে প্রকাশিত শিল্পনীতি সম্পর্কে সরকারী প্রস্তাবে ঘটেছিল। আর্থিক ক্ষেত্রে অন্যান্য কাজ এটাই দেখিয়েছিল যে সরকার শিল্প বিকাশের স্বার্থে পুঁজিবাদী অর্থনীতির চিরায়ত উৎসাহ-উদ্দীপনার উপরই নির্ভর করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। যেখানে সম্ভব নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা তুলে দিয়ে, অবাধে জিনিষপত্রের দাম বাড়াতে দিয়ে, উচ্চতর ব্যক্তিগত আয়ের ও মুনাফার উপর কর হ্রাস করে সে শিল্পপতিদের উৎপাদন বাড়াতে সুযোগ দিয়েছে। প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষ কর ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। একই সময়ে সরকার ভারতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহ দিয়েছে শক্তিশালী বিনিয়োগকারীদের এই আশ্বাস দিয়ে যে তাদের বিরুদ্ধে কোন বৈষম্যই থাকবে না আর তাদের স্বার্থই সংরক্ষিত হবে যদি ভবিষ্যতে সরকার কখনও শিল্প জাতীয়করণের ক্ষেত্র প্রসারিত করে। এর অর্থই হলো যে সরকারের নীতি শিল্পোন্নয়নে ব্যর্থতা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক বৈষম্যই বাড়িয়েছে আর তার দ্বারা কম ভাগ্যবানদের অসন্তোষকেই জিইয়ে রেখেছে।"[১৩]

১৩. দ্রষ্টব্য W. M. Ball-এর Nationalism and Communism in East Asia, পৃঃ ১৮৬

ছ

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান

তার সামাজিক সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

ভারতীয় জনগণের আর্থ-রাজনৈতিক জীবনের বিকাশের প্রবণতার বিস্তৃত চিত্রানুগ বর্ণনা আমরা করেছি কেননা জনগণের জীবনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের নির্ধারক প্রভাব রয়েছে তাদের সাংস্কৃতিক ও ভাবাদর্শগত জীবনের উপর। ভারতীয় সমাজের রূপান্তর প্রক্রিয়া বিশেষভাবে জটিল এই কারণে যে এ সমাজ গঠিত হয়েছে অসংখ্য সামাজিক গোষ্ঠী নিয়ে যারা বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এসে পৌঁছেছে আর যাদের আর্থিক পরিমণ্ডলেও বিপুল পার্থক্য বর্তমান। এই সব পৃথক সামাজিক গোষ্ঠীর ও সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জনগণের সামাজিক, শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত ঘটনাগুলো আমাদের আলোচ্য সময়কালে বিস্তৃতভাবে ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে গবেষণা করা হয় নি। তাদের নিয়ে রচিত গ্রন্থাদিতে আংশিক বর্ণনার সন্ধানই শুধু মেলে। অবশ্য সামগ্রিক বিকাশের রূপরেখা তাতেও পাওয়া যায়। এদের বর্ণনা আমরা এবার সংক্ষেপে দেবো।

ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যস্ত অতীতের আইনগত অস্বীকৃতি

ভারতীয় সংবিধানের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সেই নীতির ঘোষণা করেছিল যার উপর সমগ্র সমাজ কাঠামোকে পুনর্গঠন করে তোলা হবে। সংবিধান ঘোষণা করেছিল যে ভারতীয় সমাজ জাতি ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ ও অন্যান্য পার্থক্য, নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের জন্য সাম্যনীতির ভিত্তিতে পুনর্গঠিতহবে। এই ভাবে তা আইনগতভাবেই ভারতীয় সমাজের প্রচলিত কাঠামোকে অস্বীকৃতি জানায় যে

কাঠামো বহুকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত ছিল জাতি, ধর্মমত, স্ত্রীপুরুষ ও অন্যান্য উপাদানের উপর ভিত্তি করে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান এইভাবে গুণগতভাবে পৃথক নীতির ঘোষণা করে যাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সমাজ পুনর্গঠিত হবে। এটা ছিল একটা যুগান্তকারী ঘটনা। এর লক্ষ্য ছিল ভারতীয় সমাজকে পরিবর্তিত করা যা প্রতিষ্ঠিত ছিল, Prof. Hobhouse-এর ভাষায়, ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাস ও অসাম্যের ভিত্তিতে 'কর্তৃত্বের মুচলেকার'' উপর। সমাজের এ রূপান্তর চাওয়া হলো সমস্ত নাগরিকের সমতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নাগরিকের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে।

সমতার নীতির ঘোষণার মাধ্যমে সংবিধান স্বাধীন ইউনিয়নের সমস্ত সদস্যকে যারা এতকাল বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকবলে গণ্য হত, সমান সামাজিক, আর্থ-রাজনীতিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক অধিকারের সুযোগ সহ নাগরিকের মর্যাদা দেয়। ভারত ইউনিয়নের জনগণের জন্য এইভাবে সমতার এক নতুন যুগের সূচনা করলো সংবিধান।

সংবিধান জনগণের জন্য সমান ও সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারও দিল। অবশ্য, এই সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের বোধশক্তিসম্পন্ন প্রয়োগের জন্য একটা গণতান্ত্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল সেই সব নাগরিকদের জন্য যারা বহু শতাব্দী ধরে ঐতিহ্যবাহী ও কর্তৃত্বসম্পন্ন আবার অনুষ্ঠানের কুণ্ডলীতে বিজড়িত ছিল আর যাদের বিপুল সংখ্যক মানুষ ছিল দরিদ্র ও নিরক্ষর। জনগণ যাতে প্রকৃত সম অধিকার সম্পন্ন নাগরিক হতে পারে তার জন্য সরকারকে এইভাবে দিতে হয়েছিল জীবনযাত্রার মান ও শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সুযোগসুবিধা। কংগ্রেস সরকারের সামনে ছিল এ ধরণের কাজের দায়িত্ব।

কংগ্রেস সরকারের সামনে বিরাট সমস্যা

সংবিধান এই ভাবেই উপস্থাপিত করলো সরকারের সামনে সামাজিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রচণ্ড সমস্যাগুলো। তা সামাজিক অসাম্যের (জাতপাত, কর্তৃত্বব্যঞ্জক যৌথ পরিবারভিত্তিক প্রভৃতি) স্তরবিন্যস্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত পুরাতন সামাজিক কাঠামোর অপসারণ দাবী করলো আর সমাজ নিয়ন্ত্রণের পুরাতন রীতি

যেমন ধর্ম, প্রথা প্রভৃতিকে পরিবর্তন অথবা হঠাতে চাইলো। ঐতিহ্যবাহী এই সব প্রতিষ্ঠান ও সমাজ নিয়ন্ত্রক নাগরিকদের প্রদত্ত আইনগত মর্যাদাকে বাস্তবায়িত করতে বাধা দিত। একাজ সম্পন্ন করা যেত যদি সমাজ-সম্পর্কের এক নতুন বুনন, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের এক নতুন বর্গ, সমাজ নিয়ন্ত্রণের নতুন কৌশলাদি ও সমাজ পরিবর্তনের নতুন এজেন্সী যা সাম্যের নীতির সংগে সুসামঞ্জস্য হয়ে ভারতীয় জনগণের আর্থ-সামাজীক জীবনের দ্রুত ও সমন্বয়পূর্ণ বিকাশের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, সৃষ্টি করা যেত।

ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন ব্রিটিশ সরকার এনেছিল। কিছুটা সে পুরাতন প্রতিষ্ঠান ও নিয়ন্ত্রণকারী এজেন্সীগুলোকে স্পর্শ করেছিল। পূর্ববর্তী গ্রন্থে আমরা বলেছি যে আংশিক ও উৎসাহবর্জিত সংস্কার এনে সে ভারতীয় সমাজকে চরিত্রগতভাবে দো-আঁশলা ও পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক ও আধুনিক প্রতিষ্ঠানের একটা মিশ্র প্রতিরূপ গড়ে তুলেছিল। এটা ছিল ব্রিটিশদের নিজের দেশের সমাজ-চিত্রের বিপরীত। ব্রিটিশরা তাদের নিজেদের দেশে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে একেবারে নতুন এক আধুনিক গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। ভারতে তারা প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একেবারে বিলোপ সাধন করেনি। প্রায়ই তারা সেগুলোকে রক্ষা করেছে। তাই দ্বিবিধ ক্ষতি হয়েছে ভারতীয় সমাজের। একদিকে ছিল এ সমাজে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ও তখনও প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আচার-ব্যবহার ও বিশ্বদৃষ্টিজনিত দোষ আর অন্যদিকে ছিল অসম্পূর্ণভাবে বিকশিত ধনতান্ত্রিক সমাজ থেকে উদ্ভূত ক্ষতি। অন্য কথায়, ভারতে ছিল অসম্পূর্ণ বুর্জোয়া বিপ্লবের পরিণতিজনিত ত্রুটি।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সংবিধানে নতুন সমাজ জীবনের পুনর্গঠনের মূল নীতি সংযোজিত করেছে। আমরা আগেই বলেছি, এ নীতি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বীকার্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মৌল বুর্জোয়া আর্থিক নীতির উপর ভিত্তি করে তা একটা সমাজব্যবস্থার উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা চায়। সেটি হলো উৎপাদনের উপায়ে ধন-তান্ত্রিক সম্পত্তির স্বীকৃতি, অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রধান বৈশিষ্ট্য আর সমস্ত ব্যক্তিগত কাজে প্রতিযোগিতা হবে প্রধান আর্থিক প্রয়াস বা প্রেরণা। কংগ্রেস বিরাট আকারে শিল্পায়ন, বাণিজ্যিকীকরণ, যন্ত্রীকরণ, অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোর আর্থিকীকরণ চেয়েছে ধনতান্ত্রিক, মিশ্র অর্থনীতির নীতির উপর ভিত্তি করে। এ

অর্থনীতি ভারতীয় সমাজ ও জনগণের জন্য বস্তুগতভাবে সমৃদ্ধিশালী ও সেই কারণেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নত ভারতীয় সমাজ ও জনগণের জন্য চাপযন্ত্র হিসাবে কাজ করে।

কংগ্রেস সরকার চেয়েছিল জনগণকে জীবনযাত্রার একটা মান ও কৃষ্টিগত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সমস্ত নাগরিকের আইনগত সাম্যকে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কাঠামোতে নাগরিকদের প্রকৃত সাম্যে রূপান্তরিত করতে। এটা সম্ভব নয়। এটা মরীচিকার পিছনেই শুধু ছোটা।

সাম্য ও অধিগ্রাহী সমাজ

একটা অধিগ্রাহী সমাজে অসম সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে উৎপাদন ও প্রতিযোগিতার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন আর যেখানে উৎপাদনের উপায়ে রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সেখানে সমস্ত নাগরিককে সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে যথার্থ সাম্য দেওয়া সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ অতি শিল্পোন্নত ও সমৃদ্ধিশালী পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাগুলোতেও মিলবে। এটা আরও কঠিন সে দেশে, যে দেশ অর্থনৈতিক ভাবে অর্ধোন্নত যার যার পর্যাপ্ত সম্পদ নেই। সমাজ কল্যাণ ও জনগণের উন্নততর জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত কংগ্রেস সরকারের সমস্ত পরিকল্পনা এ ধরণের পাহাড়েই ঘা খেয়ে ভেংগে পড়ছে।

কংগ্রেসের ঘোষণা ও কাজের মধ্যেকার তীব্র বৈষম্যের একমাত্র ব্যাখ্যা করা চলে একদিকে সদিচ্ছা ও অন্যদিকে একটা দুর্বল ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্বল্প সম্পদের মধ্যেকার তফাতের ভিত্তিতে। কোন ব্যক্তিবিশেষ কিংবা গোষ্ঠীর স্বাধীন ইচ্ছার প্রশ্ন এটা নয়, কিংবা নয় তাদের সততা ও অসাধুতার প্রশ্নও। পণ্ডিত নেহরুর গভীর মানসিক ও অনুভূতিসঞ্জাত যন্ত্রণা ও হতাশা জনগণকে বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সমান সুযোগ দানের অভীপ্সা ও ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে তার বাস্তবায়নের অপরিহার্য ব্যর্থতার মধ্যেকার দ্বিবিভাজনকে প্রতিফলিত করেছে। ইতিহাস আইন-শাসিত। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকেই ধনতন্ত্রবাদ অবাস্তব। বিংশ শতকে উৎপাদিকা শক্তির স্বাধীন ও দ্রুত বিকাশের পথে তা একটা অনতিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে তা, যা বিশেষভাবে সমস্ত অর্ধোন্নত দেশে তীব্র, কেননা সে সব দেশে ধনতন্ত্রবাদ দুর্বল ও তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে তা বেপরোয়াভাবে সচেষ্ট। যেমন একদল

প্রখ্যাত বিদগ্ধ-ব্যক্তি বলেছেন, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, বলতে কি, প্রায় পাগলামির পর্যায়ে এসে পড়েছে। বাস্তব জীবনে সমাজ-ব্যবস্থা হিসাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নাগরিকদের সমান সুযোগ দিতেই শুধু ব্যর্থ হয় নি, আজকালকার সংকটে সুযোগের অসাম্যকেই বাড়িয়ে তুলেছে। যুদ্ধোত্তর বিশ্বে ভারত সহ সমস্ত অর্ধোন্নত দেশের অভিজ্ঞতা এরই সাক্ষ্য বহন করেছে। শুধু তাই নয়। বুর্জোয়া নীতির পরিমণ্ডলে নাগরিকদের সমান অধিকার দেওয়ার চেষ্টাটাই বিপরীত পরিণতির সূচনা করছে। বস্তুত, পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মকানুনের বস্তুগত কার্যধারা ও এসব দেশে ধনতান্ত্রিক শ্রেণী ও সরকারগুলোর আর্থিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে অসাম্য বেড়েছে। শ্রেণীসমূহের মেরুভবন দ্রুত প্রসার লাভ করছে। আমরা আগেই বলেছি পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সংরক্ষিত ও আরও বিকশিত করার জন্য ক্ষমতাসীন ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর নীতিগুলোই সেই অর্থনীতিরই ভার-সাম্যহীন বৃদ্ধি ও জনগণের দুঃখদুর্দশা বৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হচ্ছে। এসব নীতি শুধুমাত্র বড় বড় একচেটিয়া কারবারী ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উপর তলারই উপকারে লাগছে।

অনগ্রসর দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া শ্রেণী পুঁজিবাদ ও তাদের মুনাফার হারকে বজায় রাখতে পারে কেবলমাত্র জনগণের জীবনযাত্রার মানে ক্রম-বর্ধমান হস্তক্ষেপ ও তাদের সমাজ সেবামূলক কাজ ও শিক্ষাদীক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে। বড় বড় সংস্থাগুলোতে পুঁজি সংরক্ষণ ও তার খণ্ডীকরণকে বাধা দিতে, পুঁজিবাদী শ্রেণী নারী জাতীকেও সমান সম্পত্তি অধিকার না দিতে বাধ্য হয়। Hindu Rights to Property Act এর সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কংগ্রেসের বিগত বিশ বছরের শাসনে ভারতের সমাজ বিকাশের ইতিহাস এই মৌল সত্যের দুঃখজনক স্বীকৃতি ধরে আছে।

ধর্মনিরপেক্ষ ন্যায়-সংহিতা নয়

এ সব ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবো আমরা। সংবিধান ঘোষিত নীতিগুলোর সংগে সামঞ্জস্য রেখে দরকার ছিল এমন একটা পক্ষপাতশূন্য ন্যায়-সংহিতা (সিভিল কোড) রচনা করা যা সমস্ত নাগরিকের প্রতি প্রযোজ্য হবে ও যা সমস্ত নাগরিকের জন্য সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। নতুন ফরাসী রাষ্ট্র যার উদ্ভব ঘটে ফরাসী বিপ্লবের পর, Code Napoleon-এর মাধ্যমে নতুন বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থাকে

কার্যকরী করা ও তার আরও বিকাশে আইনগত ভিত্তি রচনা করে যা সমস্ত নাগরিকের প্রতিই প্রযোজ্য ছিল।

রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমজীবীদের রাষ্ট্র তার বিশেষ সমরূপ সমাজ-সংহিতা প্রস্তুত করে যা সমস্ত নাগরিকের প্রতিই প্রযোজ্য ছিল আর যা নতুন সমাজ ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও আরও বিকাশের আইন ভিত্তি ছিল। একই-ভাবে নতুন চীন দেশও যার সৃষ্টি চীন বিপ্লবের পর, সব নাগরিকের প্রতি প্রযোজ্য নিজস্ব সমাজ-সংহিতা তৈরী করেছিল।

কংগ্রেস সরকার কিন্তু সংবিধানে ঘোষিত সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ন্যায়-সংহিতা আজও রচনা করে নি।

একটা সমরূপ ও গণতান্ত্রিক ন্যায়-সংহিতা রচনার ব্যাপারে সরকারের আপোস-মূলক দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছিল সংসদের সামনে উপস্থাপিত Hindu Code Bill প্রসংগে। প্রথমতঃ, এতে প্রমাণ হয়েছিল যে সরকার সমস্ত ভারতীয় নাগরিকের প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে এমন একটা সমরূপ ন্যায়-সংহিতা রচনায় ধারণাকে বর্জন করে ছিল। দ্বিতীয়তঃ, Hindu Code Bill প্রণীত হয়ে আইনের স্বীকৃতি পেলেও আসল বিলটার মধ্যে এমন সংশোধন আনা হয় যা হিন্দু সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল লোকদের দাবীই মেনে নেয় ও তাদের খুসী করে।

এইভাবে যখন সম্পত্তি, বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দু আইনের সংস্কার আনা হলো তখন কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়গুলোর (যেমন, মুসলমান, খৃীষ্টান প্রভৃতি) নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলী অপরিবর্তিত থাকে।

এইভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রচলিত পুরাতন ন্যায়-সংহিতাগুলোর সংস্কার সাধন ও বাতিল করা আর একটা সমরূপ ন্যায়-সংহিতা রচনায় ব্যর্থ হয়ে, যে সংহিতা সমস্ত নাগরিকের প্রতি সমানভাবে প্রযুক্ত হতে পারতো, সরকার তার উৎসাহ-হীনতা, বৈষম্য ও এমনকি রক্ষনশীল শক্তিগুলোর প্রতি ভীরুতামিশ্রিত সুযোগসুবিধাদানের জন্য সমালোচিত হয়েছে।

জ

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবণতা

কংগ্রেস সরকার ও অন্যান্য সংস্থাগুলো কর্তৃক গৃহীত শিক্ষাবিষয়ক নানা ব্যবস্থার মধ্যেও দুঃখজনক এক পরিস্থিতির কাহিনী শোনা যায়। এ সব ব্যবস্থা উদ্যোক্তাদের বিভ্রান্তি ও প্রয়োগবাদ ও তাদের পেশা ও অভ্যাসের বৈপরীত্যটাকেই নির্দেশ করে।

ব্রিটিশ যুগে শিক্ষার প্রধান প্রধান ত্রুটি

স্বাধীনতার পর ভারতের শিক্ষার গুরুত্ব বাড়ে প্রচণ্ডভাবে। ব্রিটিশ যুগে এদেশের বিরাট জনসংখ্যাকে নিরক্ষর করে রাখা হয়েছিল। তাছাড়া, ব্রিটিশদের তৈরী শিক্ষা-নীতি তার রাজনৈতিক-প্রশাসনিক যন্ত্রের জন্য মানুষ তৈরীর স্বার্থেই রচিত হয়েছিল। এ যন্ত্রের মাধ্যমেই সে ভারত শাসন করতে ও অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করতে চেয়েছিল। একজন সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকের ভাষায়, এ ধরণের তৈরী মানুষ হবে "রক্ত ও বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, মতামত, নৈতিকতা ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ।" "Social Background of Indian Nationalism"-এর শিক্ষা বিষয়ক অধ্যায়ে ব্রিটিশ যুগের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষানীতি ও নানা ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা রেখেছি। সেখানে বিবৃত শিক্ষানীতির প্রধান প্রধান দোষগুলো নিম্নরূপ:

(১) গণশিক্ষার গুরুতর অবহেলা।

(২) প্রচণ্ড ব্যয়বহুল শিক্ষাব্যবস্থা।

(৩) শিক্ষার গুণগত মান ও দক্ষতার ছদ্মবেশে শিক্ষাপ্রসার রোধ যাতে রাজনৈতিকভাবে সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী সংখ্যায় না বাড়ে।

(৪) শিক্ষাক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত ব্যয়।

(৫) কারিগরি শিক্ষার প্রতি অবহেলা।

(৬) বাস্তব জীবন থেকে শিক্ষার বিচ্ছিন্নতা ; ব্রিটিশ শাসনকে গৌরবান্বিত করা ও জাতীয় গৌরব ও আত্ম-মর্যাদাকে দুর্বল করার প্রয়াসে বিকৃতি।

(৭) একটা বিদেশী ভাষা ইংরাজীর মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসকদের আর্থিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য শিক্ষাদান। তার দ্বারা ভারতীয়দের দ্রুত আধুনিক, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আত্তীকরণে বাধা দান আর শিক্ষিত ভারতীয় ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধান রচনা।

(৮) জাতীয় ভাষার প্রসারের অভাব যা সর্বভারতীয় উদ্দেশ্যে ইংরাজীর বিকল্প হতে পারতো।

(৯) ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক, গণতান্ত্রিক, যুক্তিবাদী, জাতীয়তাবাদী ও সামাজিক সাহিত্য হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় ভাষান্তরে ইচ্ছাকৃত-ভাবে উৎসাহ না দেওয়া।

(১০) শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিপূর্ণ সংগঠন ও শিক্ষার ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিসমূহ।

কংগ্রেস সরকারের সম্মুখে শিক্ষাবিষয়ক কার্যক্রম

স্বাধীনতার উন্মেষে ব্রিটিশ শাসনে অনুসৃত শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতির উল্লিখিত ত্রুটিগুলোর অবলোপনের দায়িত্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ঘাড়ে পড়ে। এর জন্য প্রয়োজন হয় সম্পূর্ণভাবে নতুন এক শিক্ষানীতি ও শিক্ষার জন্য এক নয়া ব্যাপক পরিকল্পনার। এর জন্য আরও প্রয়োজন হয় শিক্ষার সর্বস্তরে একটা সুপরিকল্পিত, সুচিন্তিত পারম্পর্য, বিভিন্ন স্তরে সম্পদের যথার্থ বণ্টন ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রগতিশীল সাহিত্যের পর্যাপ্ত রচনা যা আধুনিক পশ্চিমী জগতের উদার-নৈতিক, গণতান্ত্রিক, যুক্তিসিদ্ধ ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার উন্নত ঐতিহ্যের বাস্তব রূপ দেবে ও ইংরাজী না জানা মানুষদের কাছে সেগুলোকে অধিগত করতে দেবে আর এইভাবেই তাদের মনকে প্রতিক্রিয়াশীল মধ্যযুগীয় ভাবাদর্শ ও অশোধিত কুসংস্কার ও সমাজ সম্পর্কের কর্তৃত্ববাদী ধারণা থেকে মুক্ত করতে পারবে। ইংরাজীর বিকল্প একটা সর্বভারতীয় ভাষাকে ও সর্বভারতীয় সংযোগ-সাধন ও সর্ব-জাতীয় বিনিময়ের এক নতুন মাধ্যমও ছিল অপরিহার্য। কংগ্রেসের সামনে আরও একটা দায়িত্ব এসে পড়ে। সেটি হলো আন্তর্জাতিক বিনিময় ও পরি-

বর্তনশীল ইংরাজী সাহিত্যের অন্তর্গত ক্রমপ্রসারণশীল ও বহুবিভক্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আত্তীকরণের সুযোগ দানে ভারতীয় জনগণকে সাহায্য করতে ইংরাজী ভাষাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়ার কর্তব্য।

যুদ্ধপরবর্তী ভারতে নয়া শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ ও জনগণের পক্ষে কম ব্যয়বহুল ও সহজলভ্য করারও প্রয়োজন ছিল। তাছাড়াও প্রয়োজন ছিল প্রাগ্রসর ও বিকাশশীল ভারতীয় সমাজের আদর্শের সংগে সামঞ্জসপূর্ণ হওয়ার।

শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্তিসিদ্ধ পরিকল্পনার অভাব

স্বাধীনতার এক দশকের বেশী সময় অন্তেও একটা ভাল শিক্ষাব্যবস্থা আজও গড়ে তোলা যায় নি। শিক্ষা অবাস্তব ও ব্যয়বহুলও হয়ে পড়েছে। বিভ্রান্তিও রয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে। এর প্রমাণ মিলবে নিম্নে বর্ণিত ঘটনাগুলোর মধ্যে ঃ

(১) একটা কার্যকর ও সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার যখন হওয়া উচিৎ ছিল সর্ব-ভারতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী। অথচ শিক্ষা এখনও কেন্দ্রীয় বিষয় নয়, বরং তা ছড়িয়ে রয়েছে কেন্দ্র, রাজ্য ও আঞ্চলিক এ তিনটি স্তরে। তাছাড়া নাগরিকদের কাছে শিক্ষা হওয়া উচিৎ একটা মৌলিক অধিকার আর তাই কর্মসংস্থান, খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের মত তা হবে রাষ্ট্র কর্তৃক সুনিশ্চিত ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। নিরক্ষর ও অশিক্ষিত নাগরিকদের নিয়ে প্রকৃত গণতন্ত্র হয় না। বিষয় ও পদ্ধতির দিক থেকে কংগ্রেস সরকার একটা বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসিদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারেনি। শিক্ষার বিভিন্ন নমুনাগুলোও কার্যকরী ও আদর্শগতভাবে পারম্পর্য-পূর্ণ নয়। সব রাজ্যেই শিক্ষার সব স্তরেই রয়েছে প্রচণ্ড বিভ্রান্তি। কোন সমরূপতাও নেই শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে কিংবা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর পঠন-পাঠনের বছরগুলোতে অথবা শিক্ষাব্যবস্থার সাংগঠনিক কাঠামোতে।

(২) অসংখ্য কমিশন, সম্মেলন ও সেমিনারের বহু প্রচেষ্টা একটা কম ব্যয়বহুল, সুমরূপ, মুক্ত ও বাস্তব শিক্ষাব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট নমুনার আবির্ভাব ঘোষণা করতে পারে নি। শিক্ষার জগতটাই তাই অনেক সমাধানের অতীত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় ভরে আছে।

শিক্ষা এখনও Cinderella-এর মত

(৩) শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা অর্থ এখনও স্বল্প যদিও ব্রিটিশ যুগে শিক্ষাখাতে

ব্যয়িত অর্থের তুলনায় তা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তবু সরকারের অন্যান্য বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট অর্থের তুলনায় শিক্ষা দপ্তরের জন্য বরাদ্দ অর্থ বিস্ময়করভাবে কম। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সামরিক খাতে খরচ (অহিংসার প্রতি সরকারের আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও) সমগ্র বাজেটের অর্ধেকের সমান। তাছাড়া, সরকারের এ সিদ্ধান্তও আছে যে জাতীয় উন্নয়নের পরিকল্পিতখাতে যদি প্রয়োজনীয় অর্থ সংকুলান না হয় তবে পরিকল্পনার আসল অংশের স্বার্থে সে শিক্ষা ও সমাজ-সেবার খরচ (যা এখনই কম) আরও ছাঁটাই করবে।

(৪' শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার মাধ্যমের সমস্যার সমাধান কংগ্রেস সরকার এখনও পারে নি। এ কাজ ছিল কঠিন তবুও এর সমাধান সাফল্যের সংগে করা যেত। সরকার পারতো বেশ কিছু অর্থের সংস্থান করে প্রখ্যাত লেখক ও বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিযুক্ত করে তাদের নিজস্ব বিষয় ও সবচেয়ে ভাল বিজ্ঞান, কারিগরি, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের গ্রন্থগুলোর ইংরাজী থেকে হিন্দীতে ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করতে। এর ফলে সাধারণ মানুষগুলো পেত তাদের প্রয়োজনীয় সাহিত্য যা হতে পারতো আধুনিক জ্ঞান ও বর্তমান যুগের প্রগতিশীল, উদারনৈতিক, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও অন্যান্য মতাদর্শগত বিষয়ের সম্ভার। সব ভাষাকেই তা উন্নত করতে পারতো। আধুনিক জগতের বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিশীল সমাজচিন্তার স্রোতধারায় তার ফলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হতে পারতো। আধুনিক জ্ঞানের সম্ভার হিসেবে একটা উজ্জ্বল সাহিত্য সৃষ্টির জন্য একটা পরিকল্পিত প্রয়াসের খুবই দরকার ছিল। দুর্ভাগ্যবশত এমন প্রয়াস কখনও নেওয়া হয় নি। বিদেশী ভাষা থেকে গুরুত্বপূর্ণ বইগুলোর ভাষান্তরের পরিকল্পনার বাস্তব রূপদান ও এদেশের ভাষাগুলোতে মৌলিক রচনাসৃষ্টির খরচ তার সফল পরিণতির তুলনায় এমন কিছু বেশী হতো না। অথচ সরকারের অন্যান্য প্রকল্প যেমন বিপুলায়তন শীততাপনিয়ন্ত্রিত চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞান ভবন, রবীন্দ্র ভবন, হোটেল, প্রাসাদোপম সচিবালয় নির্মাণ ও সরকারী প্রচার ও পর্যটকদের জন্য রাশিরাশি বিজ্ঞাপন আর মন্ত্রী ও অন্যান্যদের বিদেশ ভ্রমণ নিয়ে রচিত সংখ্যাতীত দলিল ও সংবাদ চিত্রগুলোর জন্য কত খরচই না হচ্ছে।

Pelican, Penguin, Home University-এর অনুসরণে মূল্য সিরিজে বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক, নান্দনিক, দার্শনিক ও অন্যান্য বিষয়ে কমখরচায় ইংরাজী থেকে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় ভাষান্তরের জন্য একটা

বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা শুধু জনগণকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক, উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কৃষ্টির সংগে পরিচয় ঘটাতো না, তা এমনই একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পারতো যাতে হিন্দী ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাগুলোর পরিপুষ্টি সাধন আর উপযুক্ত ও সাবলীল প্রকাশ ও পঠনপাঠনের মাধ্যমও হতে পারতো। দুর্ভাগ্য-বশত ইংরাজীকে সরিয়ে একটা সর্ব-ভারতীয় ভাষা নির্বাচনের সমস্যার সমাধান হয়নি। এমন কি ইংরাজীর পরিবর্তে হিন্দীকে সর্ব-ভারতীয় উদ্দেশ্যে নির্বাচিত করার সাংবিধানিক অনুচ্ছেদগুলোও প্রায়শই পাল্টে যাচ্ছে। তাছাড়া, বর্তমানে হিন্দীর বিকাশ ও বিবর্তন ঘটছে উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্যে সংস্কৃতের নিবিড় প্রভাব নিয়ে আর দ্রুততর গতিতে। হিন্দী সাহিত্যের রয়েছে একটা প্রাধান্যপূর্ণ পুনরভ্যুদয়বাদী. আর্য-সংস্কৃতি ঘেঁসা মতাদর্শগত আধেয়। ফলে অহিন্দীভাষী বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলোর মনে, বিশেষভাবে দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলোতে এ-ব্যাপারটা হিন্দী সম্পর্কে সংশয় এনেছে। "হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ", "কেন্দ্রের উপর উত্তর প্রদেশের আধিপত্য", "জনকৃত্যকে হিন্দীভাষীদের একচেটিয়া কর্তৃত্বের" বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগও শোনা যাচ্ছে।

শিক্ষার জগতে উভয় সংকট

শিক্ষাক্ষেত্রে উভয়সংকটজনিত এক অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এক দিকে, আঞ্চলিক ভাষাগুলোতে উচ্চ শিক্ষাদানের ইচ্ছা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য অনুপ্রাণিত করছে। অথচ এর ফলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সর্ব-ভারতীয় কৃত্যকের জন্য গৃহীত বিভিন্ন নির্বাচনী পরীক্ষায় তাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, এ সব পরীক্ষায় ইংরাজী আজও সাধারণ মাধ্যম। কোন কোন রাজ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় আঞ্চলিক ভাষাকে ও উচ্চতর শিক্ষায় ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম অবশ্য করা হয়েছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে এমন এক পরিস্থিতির যেখানে ইংরাজীতে কাঁচা ও মাতৃভাষায় রচিত বিভিন্ন বিষয়ে স্বল্প পরিচিতি নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করছে অথচ ইংরাজীতে পড়াশুনো করা কিংবা নিজেদের প্রকাশ করার যোগ্যতা তাদের নেই। অপরিহার্য-ভাবে এর ফলে তাদের প্রকাশের ক্ষমতার অবনতি ঘটছে. নিজেদের পাঠ্যবিষয়-গুলোতেও কোন দখল আসছে না। এর পরিণতিতে শিক্ষিত শ্রেণীর এক নতুন

প্রজন্মের দেখা মিলছে যারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেলেও প্রকাশ ভংগীতে দুর্বল আর যাদের অধীত বিষয়গুলোতে দখল কম। এইভাবে শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বস্তরে শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে। বিকল্প জাতীয় ভাষা হিন্দী ইংরাজীকে সরাতেও পারছে না কিংবা আঞ্চলিক ভাষাগুলোর দ্বারা পরিপুষ্টও হতে পারছে না। এইভাবে ক্রমবর্ধমান হারে অবনতিপ্রাপ্ত অবস্থায় ইংরাজী তার স্থিতিকাল বাড়িয়েই যাচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা বেশ উদ্ভট হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংকট এড়াতে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে অবশ্য কিন্তু সামগ্রিকভাবে সেগুলো সমস্যা সমাধান না করে তাকে বৃদ্ধি করেছে মাত্র।

শিক্ষার জন্য ক্রমবর্ধমান আগ্রহ

(৫) স্বাধীনতার পর থেকে প্রচণ্ড গতিতে শিক্ষার চাহিদা বাড়ছে। প্রথমতঃ চারটি কারণ এর জন্য দায়ী :

ক) দেশের আর্থ-রাজনৈতিক জীবনে বোধশক্তি নিয়ে অংশগ্রহণের জন্য সাধারণ নাগরিকের অন্ততঃ ন্যূনতম শিক্ষার দরকার। আর ঐ জীবন ক্রমশই জটীলতর হয়ে আগেকার তুলনায় তাকে বেশী করে স্পর্শ করছে। অধিকন্তু, নানা আইনকানুনের ক্রমপ্রসারণশীল জালে সে ক্রমবর্ধমানভাবে জড়িয়ে পড়ছে। তার জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে বলেই এসব আইনকানুন বোঝার জন্য তার শিক্ষা দরকার।

(খ) সরকারী উদ্যোগ ও বেসরকারী পুঁজিবাদীদের দ্বারা শিল্পায়নের স্বাধীনতা-উত্তর প্রয়াস বেশ কিছু লোকজনের বড় রকমের চাহিদা সৃষ্টি করেছে যাদের দক্ষতার সংগে কারিগরি, ব্যবস্থাপকীয় শাসনবিভাগীয়, আর্থিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে হবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উচ্চদক্ষতা সম্পন্ন কাজের চাপে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সব কাজের, যাদের বৈশিষ্ট্য হলো উচ্চ আয় ও সামাজিক মর্যাদা (যদিও তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়লেও তা সীমিত এখনো) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে বড় রকমের আবেদন রাখছে। প্রার্থীদের একটা ক্ষুদ্র অংশ এ সব কাজ পাবে সত্য ; তথাপি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা বড় অংশের কাছে তাদের রয়েছে চুম্বকের মত আকর্ষণী শক্তি আর তাই উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠায়।

(গ) স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে গ্রামের জন-

সংখ্যার উচ্চতর স্তরের বেশ কিছু মানুষ জমি থেকে অর্জিত আয়ের দ্বারা তাদের পারিবারিক ব্যয় সংকুলান করতে পারছে না কেননা জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তাছাড়া, কৃষি অঞ্চলে নিজেদের উচ্চ অবস্থান বজায় রাখতে পারলেও তাদের অভিলাষ হলো বংশধরদের শিক্ষিত করে তোলা এবং সম্মান ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতীক পদগুলোতে অধিষ্ঠিত হওয়া। গ্রামীণ সমাজের এই উচ্চতর শাখা এ সব কারণে তাদের ছেলেমেয়েদের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠাচ্ছে।

(ঘ) শুধুমাত্র পরিবারের কর্তার আয়ের ভিত্তিতে মধ্যবিত্ত পরিবার তার ঠাঁই বজায় রাখতে পারছে না। কারণ, জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়। ফলে, পরিবারের স্ত্রীলোকদেরও (স্ত্রী কিংবা মেয়ে) পরিবারের পুরুষ অভিভাবকদের আয় বাড়াতে কাজ খুঁজতে হচ্ছে। লেখাপড়ার সুযোগ নিতে তাই স্ত্রীলোকদেরও এগোতেহচ্ছে।

উল্লিখিত কারণগুলো শিক্ষার জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

অবশ্য, আগেকার তুলনায় গতিপ্রাপ্ত হয়েও শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে তাল রেখে প্রসারিত হতে পারে নি।

শিক্ষাক্ষেত্রে দুরবস্থা

সমকালীন ভারতে শিক্ষা জগতের অবস্থা দুঃখজনক। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে রয়েছে প্রচণ্ড ভীড়। ভর্তি হওয়ার সমস্যা তীব্র। তাছাড়া, বেসরকারী বিদ্যালয় ও কলেজগুলো হয়েছে কলংকপূর্ণ মুনাফালাভের আখড়া বিশেষ। ভর্তি ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে দুর্নীতি ও উৎকোচের অন্ত নেই।

অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই নেই পাঠাগারের সুবন্দোবস্ত। অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনে জাতপাত, আঞ্চলিক ও অন্যান্য চিন্তাভাবনা ত আছেই।

অধিকন্তু, শিক্ষা যেহেতু ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ একমাত্র ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর ছেলেমেয়েরাই তার সুযোগ নিতে সক্ষম। উচ্চ ও বিশেষীকৃত শিক্ষায় ব্রতী ছাত্র-ছাত্রীদের জাতপাত, বৃত্তিশিক্ষা ও আয়ের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধানে বিভিন্ন সমীক্ষা এ কথাই বলেছে যে এ সব ছাত্র-ছাত্রী এসেছে ভারতীয় সমাজের উচ্চতর স্তরগুলো থেকে। এরা উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রেই শুধু একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেনি, করেছে আর্থিক, প্রশাসনিক রাজনৈতিক, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও লাভজনক পদগুলোর ব্যাপার। তাছাড়া, নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নতর শ্রেণীগুলোর

ছেলেমেয়ে যাদের ভাগ্যে জোটে সীমিত শিক্ষা তাদের জন্য নিম্নতর পর্যায়ে সংখ্যাধিক্যের দরুন পর্যাপ্ত কাজ থাকে না। এটা সত্য যে স্বাধীনতা-উত্তর পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে। তথাপি, শিক্ষার সীমিত সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ চাহিদার তুলনায় বেশ কম। ফলে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব আর সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ।

বস্তুতঃ ব্রিটিশ যুগে লর্ড কার্জনের শাসনকালে দেখা একটা পরিস্থিতির আরও খারাপ প্রতিরূপ দেখা দিয়েছে। উচ্চ গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা, উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সংখ্যার উপর সীমা আরোপ প্রভৃতির জন্য হৈচৈ সমকালীন ভারতের উচ্চ শ্রেণীজাত রাজনীতিকদের কাছ থেকেও শোনা যাচ্ছে। তাদের কথা হলো—শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ করতে হবে।

এইভাবে প্রচলিত ধারণাবিরোধী অথচ সত্য এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের কাছে শিক্ষার আলো না পেঁছিতেই সতর্কবাণী উচ্চারিত হচ্ছে তার সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে। শিক্ষিত বেকারদের ভয়েই বলা হচ্ছে এ কথা। অভিক্ষিপ্ত প্রকল্পগুলোতে সমাজ সেবার মত শিক্ষার জন্যও পরিকল্পনার মূল অংশকে বাঁচাতে খরচ কমাতে বলা হচ্ছে। পুঁজিবাদী নীতিগুলোর কাঠামোর মধ্যে পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে এটা অবশ্যম্ভাবী।

ব্যবহারিক ও বিপরীত শিক্ষানীতি

শিক্ষায় সমস্যাদি নিয়ে অভিজ্ঞতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনিশ্চিত ও সর্পিল নানা নীতি যেমন শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠ্যসূচী, স্নাতক ও প্রাক্-স্নাতক পাঠ্যক্রমের যথাযথ ধারা প্রভৃতি বেশ কিছু খ্যাতনামা শিক্ষাবিদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। মোট কথা, শিক্ষার জগৎটা এখন আধা-সংকটে ভরা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুমোদিত কলেজ এবং সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নানা সংঘাত (জাতপাত, আঞ্চলিক প্রভৃতি বিষয়ে)। এ ধরণের দুঃখজনক পরিস্থিতির শহীদ হচ্ছে ভারতীয় ছাত্রসমাজের নতুন প্রজন্ম।

অভিজ্ঞতামূলক ও পরস্পরবিরোধী পরীক্ষানিরীক্ষা, এমন কি উপদলীয় ও দুর্নীতিমূলক নানা কাজের অসহায় শিকার হচ্ছে ছাত্ররা। শিক্ষার ক্রমবর্ধমান খরচের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজে অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে ও তার ফলে সংগ্রামও শুরু হয়েছে। শিক্ষার ব্যয় অধিকাংশ মানুষের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে অসম্ভব করে

তুলেছে—পাঠ্যসূচী প্রভৃতি বিষয়ে খেয়ালখুশি ত আছেই।

তাই স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে, জনগণের অধিকাংশের কাছে পেঁাছে দেওয়া যায় এমন একটা কম ব্যয়বহুল শিক্ষার স্বপ্ন দূরে ক্রমশই সরে যাচ্ছে।

৬ সমস্ত স্তরে কম খরচে ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে একটা শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে বারংবার এ ঘোষণা সত্ত্বেও কংগ্রেস সরকার এই উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থ হয়েছে। একটা দুর্বল পুঁজিবাদী দেশের পক্ষে এ আদর্শে পেঁাছানো সম্ভব নয়।

ঝ

সামাজিক প্রবণতা

আমরা যেমন দেখেছি, কংগ্রেস শিল্প ও কৃষির উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধির প্রয়াসে ও তার দ্বারা জনগণকে উচ্চতর জীবনের মান দিতে শিল্পায়নের পথ ধরে এগোতে চেয়েছে।
সমাজের কাঠামো ও জনগণের জীবনযাত্রার ধারাতে বড় রকমের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রকৃত শিল্পায়ন প্রক্রিয়া গতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। প্রচলিত প্রতিষ্ঠান-গুলোর ক্ষেত্রে বিরাট রূপান্তরণ এমন কি নতুনের দ্বারা তাদের সামগ্রিক অপসারণও এর ফলে ঘটে। জীবনের মূল্যবোধগুলোতেও পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়ে। শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত নিম্নলিখিত কতকগুলো সমস্যার গবেষণা দরকার।

ধনতান্ত্রিক শিল্পায়ন বনাম সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন

শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে কি ধরণের সামাজিক-আর্থিক গোষ্ঠীগুলোর উদ্ভব হয়েছে? তাদের মধ্যে কারা বেশী ত্যাগ স্বীকার করছে আর কারাই বা সুবিধা-গুলো কুড়োচ্ছে? কি ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক জীবনের ধারা জন্ম নিচ্ছে আর তারা কিভাবে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। শিল্পায়নের ফলে কি ধরণের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মকানুন গড়ে উঠছে? এ সব নির্ভরশীল শুধুমাত্র "বেশ কিছু পরিবর্তনীয় উপাদান, যেমন, কৃষক সমাজ, জনসংখ্যার গুরুত্ব, প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিল্প ও অতিরিক্ত উপাদানের গতি, রাজস্বব্যবস্থায় সমদর্শিতা, শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ, কলকারখানা ও শ্রমিকদের ঘরবাড়ীর ধরণ ও বিন্যাস, প্রাক্-শিল্প কৃষ্টির প্রকৃতি ও শক্তির"[১] উপরই নয়; সেগুলো নির্ভর করে কয়েকটি

১. দ্রষ্টব্য: U.N.O.: Processes and Problems of Industrialization in Underdeveloped Countries, p. 119.

মৌল স্বীকার্য, একটি মৌলিক দর্পণের উপর যা শিল্পায়নের পদ্ধতিকে নিরূপণ করে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ শিল্পায়নের দুটি তত্ত্বের ব্যাপারে প্রধান প্রধান পার্থক্য নিয়ে খুব বেশী লেখালেখি হয়নি। শিল্পায়নের দুটি প্রধান পদ্ধতির উপর একটা সুসংবদ্ধ আলোচনা বড় আকারে হয় নি। (১) একটি হলো সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার স্বীকার্যের উপর ভিত্তি করে শিল্পায়ন যার বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদনের উপায়ের সামাজিক মালিকানা নীতি, মুনাফা নয়; জনসমষ্টির প্রয়োজনভিত্তিক উৎপাদন, জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতা পরিহার করে বিকল্প হিসেবে সহযোগিতার নীতি। অন্যটি হলো পুঁজিবাদের স্বীকার্যের উপর ভিত্তি করে শিল্পায়ন পদ্ধতি যার বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদনের ব্যক্তিগত মালিকানার নীতি, মুনাফার জন্য উৎপাদন ও মানুষজনের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সমাজ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার নীতি।

শিল্পায়ন ও সাধারণ অর্থনৈতিক বিকাশের এ দুটি পৃথক পদ্ধতি গুণগতভাবে দুটি পৃথক সমাজ সংগঠনের দুটি পৃথক পথকে নির্দেশ করে। তারা অর্থনৈতিক বিকাশের দিক নিয়ন্ত্রণও করে থাকে আর সেই কারণেই সেই সব মৌল আগ্রহ ও উদ্দেশ্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করে যা ব্যক্তির কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে। নানা সংস্থা ও সংগঠনের ধারা, সমাজের বিভিন্ন স্তরের সুযোগ ও প্রতিবন্ধকগুলো যে সব স্তরের মধ্যে বৈষয়িক সম্পদের বণ্টন আর সেই সমাজের নৈতিক, দার্শনিক, আঞ্চলিক প্রভৃতি সামগ্রিক সংস্কৃতির চরিত্রের সীমানা নির্দেশও করে থাকে।

আমাদের আলোচনার এই স্তরে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা তুলছি এই কারণে যে শিল্পায়নের এ দুটি বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে একটা পরিষ্কার পার্থক্য টানা দরকার, কেননা কোন দেশের সামাজিক, প্রতিষ্ঠানিক, ভাবাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক ধারার গুণগত দিক থেকে পৃথক দুটি ধারারই তারা উৎপত্তি ঘটায়। শিল্পায়নের স্বীকৃত নীতিগুলোই সমাজের কাঠামোগত বিন্যাস ও তার বিভিন্ন অংশের কার্যকরী আন্তনির্ভরতার প্রকৃতিকে স্থির করে রাখে। সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের মৌল কাঠামোকেও তা স্থির করে দেয়।

কংগ্রেস সরকারের ভারতে পুঁজিপতি শিল্পায়নের পরিকল্পনা

পুঁজিবাদী মিশ্র অর্থনীতির ভিত্তিতেই এদেশের শিল্পায়নের পথ বেছে নিয়েছে

কংগ্রেস সরকার। ভারতীয় সমাজের আর্থিক কাঠামো গড়ে তুলছে এই মৌল স্বীকার্যটা আর এটাই স্থির করে দিচ্ছে ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্তরের চেতনা ও জীবনের ধারাগুলো ; সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জনগণের প্রাতিষ্ঠানিক, সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত জীবনটাও তারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্য ও প্রধান প্রধান বাধ্যবাধকতাও এই ধরণের আর্থিক কাঠামো তৈরী করে দেয় আর নির্দিষ্ট করে দেয় সেইসব সুবিধার ধারাও যা এ সমস্ত শ্রেণী ও গোষ্ঠী পেয়ে থাকে কিংবা উৎসর্গ করে।

ধনতান্ত্রিক শিল্পায়ন মানেই হলো উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিকশ্রেণীর উৎপাদন ব্যবস্থায় একমাত্র উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জনের ভিত্তিতে শিল্পায়ন, আর দ্বিতীয়তঃ, এ ব্যবস্থায় সমাজ সম্পর্কের প্রধান চরিত্রই হলো প্রতিযোগিতা। সাবেকী সামন্ততান্ত্রিক ও প্রাক্-সামন্ততান্ত্রিক নীতিগুলোর, যেমন, জন্ম ও মর্যাদা, বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানের অবসানও বোঝায় তা। এর আরও অর্থ হলো সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন অংশের সমন্বয়-সাধনের সেই নীতিরও অবলুপ্তি, অসাম্য ও পদবিন্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েও যার কাঠামো একটা অদ্ভুত ভারসাম্য রক্ষা করতো। এর মধ্যে রয়েছে সমস্ত সমাজ সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিযোগিতা ও অধিগ্রাহী বৈশিষ্ট্য আর তার দ্বারাই বোঝায় গ্রাম ও নগরভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য পারস্পরিক সাহায্য ও সাম্প্রদায়িক সহযোগিতার বিশেষ ধরণগুলোর ধ্বংসসাধন। এর আরও তাৎপর্য হলো প্রথাভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী নিয়ন্ত্রণগুলোর শিথিলীকরণ যার ফলে ব্যক্তি তার এককালের ঐতিহ্যমণ্ডিত নানা প্রাথমিক গোষ্ঠী যেমন, যৌথ পরিবার, জাতপাত ও গ্রাম্য সম্প্রদায় প্রভৃতি থেকে জীবনের সুখটা পেতে পারতো, যদিও অবশ্য এসব প্রতিষ্ঠানের ভিত্ ছিল একটা কঠোর কর্তৃত্ববাদী ও স্তরবিন্যস্ত নীতি। এর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এক নির্মম ও সর্বজনীন প্রতিযোগিতা-মূলক সংগ্রামের মাধ্যমে একটা বিশাল ক্ষেত্রে সমাজকে টেনে আনা যেখানে প্রতিটি ব্যক্তিরই লক্ষ্য হলো বাজারে সাফল্য আনার কঠিন প্রয়াস।

যান্ত্রিকীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও আর্থিকীকরণের প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে জনগণের সাবেকী সামষ্টিক জীবনের রূপান্তর সাধনই হলো ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের লক্ষ্য। তার আরও লক্ষ্য হলো জনগণের সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে প্রতিযোগিতা আনা আর সমাজের গতিশীলতা বজায় রাখতে মুনাফাকে একমাত্র উদ্দেশ্য করা।

উন্নত পশ্চিমী ইয়োরোপীয় দেশগুলোতে ধনতান্ত্রিক শিল্পায়ন "ছিল একটা ক্রমপুঞ্জিত প্রক্রিয়া যার ব্যাপ্তি ছিল বহু দশক ধরে আর যে সময়ে সমগ্র সমাজটাই ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে। এ রূপান্তরের পাশাপাশি ছিল কৃষি, বাণিজ্য, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ, কলা. বিজ্ঞান ও ধর্মের ক্ষেত্রে বিপ্লব।"[২] একে আরও সহজ করে তুলেছিল ও এতে গতি সঞ্চার করেছিল বিরাট ঔপনিবেশিক মুনাফাপ্রসূত পাহাড়প্রমাণ সম্পদের ক্রমপুঞ্জন (যা পুঁজির ভূমিকা নিয়েছিল)। এর পরিণতিতে বুর্জোয়া শ্রেণীও পেয়েছিল অসংখ্য সমাজ-সেবামূলক কাজ হাতে নিতে যার ফলে জনসমাজের বিচ্ছিন্ন, নিঃসংগ ব্যক্তিও পেয়েছিল কিছুটা ত্রাণ ও সুযোগসুবিধা। অথচ সে সব দেশেও বিদগ্ধ দার্শনিক, সমাজের চিন্তাশীল মানুষগুলো ও ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন কিভাবে জীবনের ধনতান্ত্রিক ভিত্টা মানুষের মধ্যে এনেছে মূল্যহীনতা ও জনমানুষের মধ্যে বিভক্তিকরণ যার ফলশ্রুতিতে দেখা দিয়েছে বিরাট সংখ্যক মানুষের মধ্যে নৈরাশ্য ও স্নায়বিক রেখা। এ ধরণের মানুষ বাজার দ্রব্যের সংগে তুলনীয় হয়ে নৈরাশ্যপূর্ণ বাজারের খেয়ালের উপর কাজের জন্য নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়। আর্থিক নিরাপত্তার সুনিশ্চিত ভরসা নিয়ে এরা স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদা পায় না। এ সব চিন্তাশীল ব্যক্তি বিপুল সংখ্যক জনগণের প্রধান প্রধান চাহিদা পূরণে পুঁজিবাদের আবিষ্কৃত অনুষঙ্গী ও প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভিত্কে নিতান্তই দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন। ধনতন্ত্রের অবনয়নের পর্যায়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর প্রচলিত সমাজব্যবস্থাও জনগণের বিরাট অংশের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে ও বেঁচে থাকার মর্যাদা দিতে আরও অসন্তোষজনক ও ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়ছে।

ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের সীমাবদ্ধতা

পুঁজিবাদের ভিত্তিতে অনুন্নত দেশগুলোতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া বিচিত্র কতকগুলো ত্রুটির জন্ম দেয়। প্রথমতঃ, তা অংশত পুরাতন অনুষংগী, প্রতিষ্ঠানিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোটাকে বিনষ্ট করে ও জনগণকে একটা নতুন কাঠামো দিতে অসমর্থ। যেমন একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন, "সমকালীন অর্ধোন্নত দেশগুলোতে দ্রুত শিল্পসম্প্রসারণ ঘটলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমান্তরাল পরিবর্তন ও

২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য : পৃঃ ১২০

স্বাভাবিক জীবনের অন্যান্য দিকগুলো অনেক পিছনে পড়ে থাকতে পারে ও সামাজিক ও আর্থিক বিকাশের একটা সম্পূরিত প্রক্রিয়ার বনিয়াদ দিতে পারে না।[৬] কোন অনগ্রসর দেশে পুঁজিবাদী শিল্পায়ন পুরাতন সাবেকী সামন্ততান্ত্রিক ও প্রাক্-সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক সংস্থাগুলো ও তাদের মূল্যবোধগুলোর সম্পূর্ণ অবসায়নে অসমর্থ ; তাছাড়া, পশ্চিম ইয়োরোপের স্বাভাবিকভাবে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে পরিদৃশ্যমান অনুরূপ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও মূল্যবোধ সঞ্চারে তার ব্যর্থতা দেখা যায়। সামাজিক মান, পারিবারিক ও সামাজিক সংস্থার ধারা ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোতে সামন্ততান্ত্রিকতা ও আধুনিকতার মিশ্রণ ঘটে। পুরাতনকালের পারস্পরিক সাহায্য ও প্রথাভিত্তিক সহযোগিতার অবসানে তাদের বিকল্প হিসেবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগসুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রেও আর্থিক-ভাবে দুর্বল বুর্জোয়া শ্রেণী ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের হাতে পর্যাপ্ত বৈষয়িক সম্পদ থাকে না। উদারনৈতিক উদ্দীপনার অভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীও নতুন ভাবে গড়ে ওঠা সেকুলার ও গণতান্ত্রিক মান ও রীতিনীতির প্রবর্তন প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে চলে. এড়িয়ে চলে এসব মান ও রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন ধরণের সংস্থা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেগুলো পুরাতন কালের সামাজিক-ধর্মীয় মান ও রীতিনীতি আর তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সাবেকী অনুষংগী ও প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন, জাতপাত, যৌথ পরিবার ও গ্রাম্য সম্প্রদায়ের ক্ষতিপূরণ করতে পারতো। বস্তুতঃ, একটা অদ্ভুত বৈপরীত্যভরা ঘটনা ঘটে অর্ধোন্নত দেশগুলোতে। নিজের সুবিধার্থে কর্তৃত্ববাদী পুঁজিবাদী শ্রেণী সাবেকী প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ ও সমাজনিয়ন্ত্রণ বিধিগুলোকে ব্যবহার করে। এ সব সাবেকী প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ ও সামাজিক মান ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে সম্পদকে কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করে আর যৌথ পারি-বারিক সম্পত্তির আকারে তা সংরক্ষণ করে। পাতি বুর্জোয়ার এক অংশকে সস্তাদরে কর্মনিযুক্তিতে এই শ্রেণীকে তারা সাহায্য করে আর সাধারণ পারিবারিক, জাতপাত, ধর্মীয় ও আঞ্চলিক শ্রেণীবদ্ধতার ভিত্তিতে অধিকতর আনুগত্যের প্রশ্নে নিজেকে আশ্বস্ত করে। এরূপ বিন্যাসের ভিত্তিতে তারা তার জন্য কর্মীদের বিভক্ত করে রাখে যাতে শ্রেণীগতভাবে তারা ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে। নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক কাঠামোতে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে তারা সম্পদশালী শ্রেণীকে আরও সাহায্য করে উচ্চতর জাতগুলোর উপযোগী সম্মান, পদমর্যাদাজনিত আনুগত্য,

৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১২০

ঐতিহ্যমণ্ডিত, শ্রেণীবিন্যস্ত, স্বৈরতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণমূলক রীতিনীতিগুলোকে ব্যবহার করতে শেখায়। বুর্জোয়া শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের জীবনে গ্রন্থি-চ্যুতি যতই বাড়বে, নিজেদের মধ্যে যত বেশী হবে পুরাতন মূল্যবোধের উৎপাদন, ততই জনগণের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে বুর্জোয়া শ্রেণী তার পুরাতন নীতি-মানের পুনরুক্তির অধিকতর প্রয়োজন অনুভব করবে। একটা ক্লাসিকাল পর্যায়ে এই প্রক্রিয়াটাকে ভারতের অবস্থা জীবন্তভাবে দেখিয়েছে। বুর্জোয়া শিল্পায়নের সামাজিক প্রভাব নিয়ে অসংখ্য গবেষণার ভিত্তিতে এসব সিদ্ধান্তের সমর্থন মিলেছে। আমরা সংক্ষেপে এ ধারাটার উদ্ভবের কারণগুলো বলবো।

নগর অঞ্চলের সামাজিক প্রবণতা

নগরাঞ্চলে ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের ফলে উদ্ভূত সামাজিক প্রবণতাগুলোর সমীক্ষা প্রথমেই দেবো।

সম্প্রসারণশীল শিল্প ও অপর্যাপ্ত পৌর সুযোগ সুবিধার মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য

প্রারম্ভিক সুযোগসুবিধাসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোতেই পুঁজি তার বিনিয়োগক্ষেত্র বেছে নেয়। যেহেতু এসব সুযোগ-সুবিধা প্রচলিত নগর অঞ্চলগুলোতেই মেলে, সেহেতু নতুন উদ্যোগ ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায় শহরাঞ্চলে ও বড় বড় শহরতলীতে। শহরগুলোর এই ধরণের শিল্পপ্রসার "আপনা হতেই জন-সেবামূলক কাজ, রাস্তঘাট ও পরিবহন ব্যবস্থা, শ্রমিকদের বাসস্থান, স্বাস্থ্যবিধান, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও আমোদপ্রমোদের সুবিধার্থে একটা সমান্তরাল বিনিয়োগের প্রয়োজন সৃষ্টি করে। যেহেতু বিভিন্ন সংস্থা যেমন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান স্থানীয়, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় স্তরে সমান্তরাল বিনিয়োগ করে সেহেতু পুঁজির পূর্বনির্ধারিত হিসাব পাওয়া যায় না। অধিকন্ত, এ সব সম্পদের ব্যবহার হয় পরিকল্পনাবিহীন ও অসম উপায়ে। তাছাড়াও, যেহেতু—অনগ্রসর দেশে আর্থিক সম্পদ বড় সীমিত সেহেতু জনসেবা-মূলক কাজ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শ্রমিকদের বাসস্থান, স্বাস্থ্যবিধান, স্কুল, হাসপাতাল আমোদপ্রমোদ ও সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রয়োজনের তুলনায় হয় অনেক কম। আর, তাছাড়া এ সব বিনিয়োগের

একটা বড় অংশ বুর্জোয়া শ্রেণী, উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধনবান লোকজন ও উচ্চতর স্তরের আমলাদের প্রয়োজন মেটাতেই ব্যয়িত হতে দেখা যায়।

কলকারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্প্রসারণ প্রসূত নানা প্রয়োজন মেটাতে সমাজসেবা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে এই অসামর্থ এবং নগরভিত্তিক সম্প্রদায়ের উচ্চতর শ্রেণীকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দানের বিকৃত পন্থা অসংখ্য সামাজিক সমস্যা তৈরী করেছে।

সেগুলো হলো :

(১) এর ফলে দেখা যায় নগরের সামগ্রিক পরিবেশের অবনয়ন।

(২) অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার জন্য সাধারণ মানুষের উপর অতিরিক্ত কর ভার চাপে।

(৩) শ্রমজীবীদের জন্য এটা নানা বস্তির জন্ম দেয় আর সৃষ্টি করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর জন্য বিশ্রী বাসস্থান সমস্যা।

(৪) জনগণের অধিকাংশের জীবনযাত্রার মান তা নামিয়ে দেয়।

(৫) তা তৈরী করে "শহরে সম্প্রদায়ের একটা দ্বৈত শ্রেণীর আপেক্ষিক অবস্থান"--একটা হলো উচ্চশ্রেণীর সাংস্কৃতিক গঠন, অন্যটি নিম্নশ্রেণীর সাংস্কৃতিক নক্সা।

উচ্চশ্রেণীর সাংস্কৃতিক বাহ্যিক গঠন

(৬) উচ্চ শহুরে কৃষ্টিসম্পর্কিত ঐতিহ্যের একটা মাননির্ধারক ধারা সৃষ্টি করে তা। পশ্চিমী দেশের শহরগুলোর ছাঁচে ফেলা ভাসা ভাসা সৃজনীশক্তি-চ্যুত একটা ধরণ যেন গড়ে উঠেছে এদেশের শহরগুলোতে যেখানে রয়েছে আদব-কায়দা দোরস্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত হোটেল, শীততাপনিয়ন্ত্রিত সিনেমা ও থিয়েটার হল স্টেডিয়াম ও আমোদ-প্রমোদ কেন্দ্র, আকর্ষণীয় বাজার, ব্যবসাদারি মনোভাবসম্পন্নকলা ও নজরকাড়া ভোগ্যদ্রব্য আর রয়েছে অদ্ভুত চালচলন ও রাতের জীবন। প্রতিযোগিতার আবর্তে অন্তরীণ হয়ে থেকে যায় নেই এতটুকু নিরাপত্তা, জাতপাত, আঞ্চলিক ও অন্যান্য শক্তিগুলোর দ্বারা আন্দোলিত হয়ে যাদের উপর ভরসা করেই তারা কাজ জোগাড় করেও বজায় রাখে, আর জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে—কেননা তাদের রয়েছে উচ্চ বংশ ও আয়জাত মর্যাদা, সম্পদের মালিকানা ও উচ্চতর কারিগরি, প্রশাসনিক, শিক্ষা, আইন, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতিতে বৃত্তিগত

দক্ষতা—নগর সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা তাদের নিজেদের বিশেষ পদমর্যাদার ব্যবস্থা, ভোগের ধারা আর আমোদ-প্রমোদের কৌশলগুলো তৈরী করে নেয়। আধুনিকতা-প্রসূত সুযোগ-সুবিধাগুলো ভোগ করেও এরা ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির নীতিমানগুলোতেও অনুগামিতা রাখতে অভ্যস্ত। অন্তরে এরা এখনও সামন্ততান্ত্রিক ও প্রাক্-সামন্তযুগীয় মানগুলোকে আঁকড়ে থাকে। নিজেদের জীবনে আধ্যাত্মিকতা ও প্রাচ্যদেশীয় ঐতিহ্য বজায় রাখলেও তাদের পাশ্চমী ঝক্‌মকে ভাব থাকেই। উচ্চকোটি ও উচ্চতব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই অভিজাত লোকেরা একটা বর্ণসংকর কৃষ্টি তৈরী কবে ফেলেছে যা অধঃপতনের লক্ষণযুক্ত অথচ প্রাচুর্যপূর্ণ, বাইরে আধুনিকতা অথচ অন্তরে যা রক্ষণশীল ও শ্রেণীমর্যাদা সংরক্ষণে আগ্রহী, যে শ্রেণী নাইলন, হাংগরের চামড়া, ডেকরণ ও রেয়নের চোখ ধাঁধানো পোষাকের আবরণের মাধ্যমে নিজেদের মূল্যায়নে অভ্যস্ত। এ শ্রেণীর পুরুষদের জন্য রয়েছে একটা বিশেষ মানের ব্যবসায়, রাষ্ট্রদূতসংক্রান্ত, প্রশাসনিক, কূটনৈতিক ও অন্যান্য নম্র মর্যাদাজ্ঞাপক স্টাইল আর একদিকে মহিলাদের জন্য রয়েছে ভ্যানিটি ব্যাগ, পাফ, লিপস্টিক, সুদীর্ঘ নখ ও চক্‌চকে পোশাক আর অন্যদিকে এদেরই বৈশিষ্ট্য হলো তুচ্ছ জাতপাত, ধর্মীয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবন ও সামন্ততান্ত্রিক বিশ্বদৃষ্টি। এইভাবেই গড়ে উঠেছে একটা উধর্বতর শহুরে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা প্রধানতঃ দো-আঁশলা, কৃত্রিম জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, পুনরভ্যুদয়বাদী, কপটস্বভাব আর মূলতঃ তারা উধর্বতর শ্রেণীগত নীতিমানের সাথে যথাক্রমে পুঁজিবাদী ও সামন্ত-তান্ত্রিক ভাবত উভয়েরই উচ্চতর বর্ণভিত্তিক মূল্যবোধের সেতুবন্ধন করেছে।

নিম্নশ্রেণীর সাংস্কৃতিক বিন্যাস

অনগ্রসর দেশগুলোতে ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য যেহেতু শিল্প-স্বার্থে কলকারখানা, সরকারী অফিসসমূহের দ্রুত বৃদ্ধি, সেহেতু নগর উন্নয়নে অন্যান্য সব উপাদানের উপরে স্থান পেয়ে থাকে একমাত্র শিল্পভাবনা। "ক্রমবর্ধমান শ্রমজীবী মানুষদের সুযোগ-সুবিধা ও আবাসনের প্রয়োজন মেটানোর অসামর্থ, প্রতিফলিত হয় ব্যারাক ব্যবস্থা, কারখানাসংলগ্ন ডরমিটরি, শ্রমিকদের টেনিম্যান্ট বা ভাড়াকরা বাড়ী, কারখানা ও পথেঘাটে রাত কাটানোর ব্যবস্থা আর অসংখ্য যেন-তেন-প্রকারেন নির্মিত বিভিন্ন শহর ও স্থানীয় অঞ্চলের প্রতিষ্ঠার মধ্যে।"[৪] কর্ম-

৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১২৩

কারখানা ও তদৃশ নানা প্রতিষ্ঠানের গজিয়ে ওঠার সাথে সাথে দরকার হয় লোকবল—মানবসুলভ পণ্যদ্রব্য। বুর্জোয়া শিল্প সম্পর্কিত পরিকল্পনা লাভ-জনক উৎপাদনের উপরই অগ্রাধিকার দেয় আর মানুষকে উৎপাদনব্যয়ের মানদণ্ডে পরিমাপযোগ্য পণ্য বলেই গণ্য করে। দক্ষ ও অদক্ষ মজুরি দাসদের বিরাট বাহিনীর জন্য সুযোগ-সুবিধার বিবেচনার মাপকাঠি হলো এই পণ্যদ্রব্যটির কার্য-কারিতা। মানুষ হিসেবে শ্রমিকদের প্রয়োজনের কোন বিবেচনার স্থান নেই এখানে। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাজারে মুনাফা অর্জনের তাগিদ ও সীমিত সম্পদের দরুন বুর্জোয়া শ্রেণী অথবা তাদের দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র সম্প্রসারণশীল অনিয়তাকার শ্রমিক-জনসমষ্টিকে নগরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সমাজসেবা দিতে অসমর্থ। তাই শহরাঞ্চলে নিম্নস্তরের সাংস্কৃতিক ধারার বৈশিষ্ট্য হলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দারিদ্র। বস্তীজীবন, জনাধিক্য, মন্দ আবাসনব্যবস্থা, সম্পদের অভাব ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার জন্য স্থানাভাব অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো হলো ঃ

পারিবারিক ভাংগন, নৈতিক অধঃপতন ও অপরাধ ও দেহ বিক্রয় ব্যবসায়ে প্রবণতাবৃদ্ধি।

(১) জনাধিক্যের চাপ ও খারাপ আবাসনব্যবস্থা সাবেকী সুখ সম্ভোগে বিশৃংখলা নিয়ে আসে—এদের বিকল্প ব্যবস্থার সন্ধানও মেলে না। জনগণের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যায় অসমঞ্জস মাত্রায় দেখা যায় বিরাট দেহ বিক্রয় ব্যবসা (গোপন কিংবা অবাধ) আর দেখা যায় পারিবারিক জীবনে নৈতিক অধঃপতন। জনসংখ্যার চাপ ও খারাপ আবাসনের ব্যবস্থা ঐতিহ্যমণ্ডিত পুরাতন সামাজিক রীতিনীতি-গুলোকেও বিনষ্ট করে নতুন রাজনীতি এসে তাদের জায়গা দখলও করে না। ফলে মানুষের উপর প্যারিবারিক ও সাবেকী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণবিধি দুর্বল হয়ে পড়ে আর তার পরিণতিতে সমাজ সংগঠনে ক্রমবর্ধমান ভাংগন ধরে। এর ফলে আসে অপারদর্শিতা, অপরাধবিস্তার ও কর্তব্যে অবহেলা।

(২) সমাজে আর এক গুচ্ছ সমস্যাও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এগুলো হলো কাজের পরিবেশ ও মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের পরিণতি। কাজের পদ্ধতি ও পরিবেশ ব্রিটেন ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশের শিল্প-বিপ্লবকালীন পর্যায়ের অনুরূপ। অনগ্রসর দেশে বুর্জোয়া শ্রেণী খুব উদারপন্থী হতে পারে না, যদিও শ্রমিকদের অধিকার ও সুযোগসুবিধার মানগুলো কিন্তু উন্নত দেশগুলোতে প্রচলিত নমুনাগুলোর দ্বারা

নির্ধারিত হয়ে থাকে। শ্রমিকদের দাবী দাওয়া ও তাদের পরিতৃপ্তির জন্য বৈষম্য নিয়ে আসে এই দ্বি-বিভাজন। বুর্জোয়া শ্রেণী নিজে কিংবা সেই শ্রেণীরই নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে জনগণকে যথাযথ কাজ ও জীবনধারণের মান দিতে পারে না। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে কারখানা ও সমাজ সম্পর্কিত আইনকানুন, সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষণ বিষয়ক প্রকল্প প্রভৃতির মত বিভিন্ন উপায় সমস্যাটির কিনারাও স্পর্শ করতে পারে না। শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত নানা গবেষণা ও সেই অবস্থার উন্নয়নে সরকারী বেসরকারী নানা ব্যবস্থা এর সাক্ষ্য দেয়।

সচলতা অপারদর্শিতায় নেমে আসে

আমরা যেমন আগেই বলেছি বর্তমান কালের কোন অনগ্রসর দেশে ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও নীতির আংশিক অন্তর্ধান ও নতুন প্রতিষ্ঠান ও মানের আংশিক আবির্ভাব ঘটে। ফলতঃ দেখা দেয় সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটা দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি। আরও দেখা দেয় বিভিন্ন শ্রেণীর কেন্দ্রীভবন। সমাজের এক মেরুতে থাকে অতি ধনী ও উচ্চতর মধ্যবিত্ত স্তরের কিছু মানুষ আর অন্য মেরুতে অবস্থান করে দারিদ্র্য-পীড়িত ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টি। সত্যিকারের আধুনিক সমাজকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবে (আর্থিকভাবে দুর্বল বুর্জোয়া শ্রেণী তা দিতেও পারে না) দারিদ্র্য পীড়িত জনগণ জাতপাত ও যৌথ পরিবারের মত সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের দিকে সাহায্যের জন্য ঝোঁকে ও তাদের সাথেই মরিয়া হয়ে জড়িয়ে থাকে। এ সব কিছুর ঝোঁক হলো উল্লিখিত সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে জিইয়ে রাখা, সামন্ততান্ত্রিক অনুভূতিগুলোকে পরিপুষ্ট করা আর সামন্ততান্ত্রিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগী-গুলোকে চিরস্থায়ী করা। আর নিজেদের স্বার্থসংরক্ষণে সমাজের ধনবান শ্রেণী এ সব প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করে।

সংক্ষেপে বলা যায় কোন অনগ্রসর দেশের ধনতান্ত্রিক শিল্পায়ন, যদি তার পরিপূরক হিসেবে না থাকে সমাজসেবা ও শিক্ষার সুযোগসুবিধা, এমন এক সচলতার জন্ম দেয় যার ঝোঁকই হলো অপারদর্শিতায় নেমে আসা।

আমরা আগেই যেমন বলেছি, আমাদের দেশে রয়েছে সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান-গুলোর নেটওয়ার্কের একটা উল্লেখযোগ্য অভাব। ঐ ধরণের প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হলেও দারিদ্র্যপীড়িত জনগণের জন্য আর্থিক শিক্ষাগত ও সামাজিক সাহায্য

দেওয়ার মত তাদের পর্যাপ্ত আর্থিক সম্বল থাকে না। অধিকন্তু, সাধারণভাবে প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক পরিপার্শ্বে তাদের কাজও বিকৃতিতে ভরা। তাদের ক্ষতি করে জাতপাত ব্যবস্থা, সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতাবাদ।

অনগ্রসর সমাজে শিল্পায়নের পর্যায়ে, যা পুরাতন সংস্থাগুলোর অবশ্যম্ভাবী ভাংগনের পথই প্রশস্ত করে, সরকারের সামনেও আসে সেই সব মানুষের সাহায্যে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সমস্যা। এ ধরণের মানুষদের উপর শিল্পায়নের পরিবৃত্তিকালে চাপ পড়ে বেশি। কিন্তু অপর্যাপ্ত সম্পদ ও বুর্জোয়া শ্রেণীর শিল্পায়নসংক্রান্ত স্বীকৃত নীতিগুলোর জন্য সরকার জনগণের ঐসব গোষ্ঠীকে সামাজিক ও আর্থিক সাহায্য দিতে পারে না। এরই ফলে শহরাঞ্চলে দেখা দেয় আমাদের উল্লিখিত সামাজিক প্রবণতাগুলো। ভারতে এই ধরণের সামাজিক প্রবণতাগুলো চূড়ান্ত নিয়মে আবির্ভূত হচ্ছে, আর একটি বিশেষ ধরণের আন্দোলনের জন্ম দিচ্ছে।

গ্রামাঞ্চলে সামাজিক প্রবণতা

গ্রামাঞ্চলে ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের প্রভাব হয়েছে সমভাবে ধ্বংসাত্মক। সমগ্র কৃষি অর্থনীতির অস্তিত্ব রক্ষার পর্যায় থেকে বাজারি অর্থনীতিতে ও কৃষি পুঁজিবাদী ও ধনী কৃষকদের মুনাফা আইনে দ্রুত রূপান্তর গ্রামেগঞ্জে সমাজ জীবনের মূল ভিতটাকেই নাড়িয়ে দিচ্ছে। অলাভজনক জমির মালিকদের জন্য তা অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করছে। আমরা অবশ্য কৃষি সমাজে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছি।

আমরা এখন কংগ্রেসের আর্থিক নীতিগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত প্রধান প্রধান সামাজিক প্রবণতাগুলোর একটা ধারণা দেবো।

কৃষিক্ষেত্র প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলোর রণক্ষেত্র

(১) নাগরিকদের সাম্যনীতির রাজনৈতিক নীতিহিসেবে প্রবর্তন ও আর্থিক নীতি হিসেবে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও মুনাফাভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে বজায় রাখার প্রচেষ্টা কৃষি সমাজে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেছে। কোনো রকমে জীবিকার জন্য যারা চাষ করতো তারা এখন বিপণনযোগ্য সামগ্রী উৎপাদনে

ও মুনাফা অর্জনে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এর ফলে স্বল্প সম্পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রত বড় বড় গোষ্ঠীগুলোর সামনে বিরাট অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে নবীন ধনতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধিশালী চাষীদের সাথে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র চাষীদের (বিরাটসংখ্যক কৃষি শ্রমিক ও ধ্বংসপ্রাপ্ত ছোট কারিগরদেরও) আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। কংগ্রেস সরকারের কৃষি নীতির ফলে নিম্নস্তরগুলোর কৃষকদের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সংগ্রাম আরও প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ কংগ্রেসের কৃষিনীতিগুলোর উদ্দেশ্যই হলো ধনবান ও অর্থব্যয়ে সক্ষম লোকদেরই নানা সুবিধা, যেমন বীজ, সার, জলসেচ, ঋণ, বিপণনব্যবস্থা প্রভৃতি দেওয়া। ফলে দেখা দিয়েছে কৃষিতে নিযুক্ত লোকজনদের মধ্যে বিরাট অসন্তোষ। কংগ্রেস সরকারের নানা কৃষি প্রকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠীগুলো, যারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিবৃদ্ধি করতে পেরেছে, ও সেইসব গোষ্ঠীর মধ্যে, যারা ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে, ক্রমবর্ধমান সংঘাত দেখা দিয়েছে। এইভাবে একটা প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতির নানা সম্পর্কের জটাজালে জড়িয়ে পড়ে এ সব মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীগুলো দরিদ্রতর হয়ে পড়ছে আর বিপজ্জনকভাবে উৎখাত হচ্ছে।

নয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কাঠামোয় জাতপাতের সংঘাতবৃদ্ধি

(২) খ্যাতিমান পন্ডিত ব্যক্তিরা ও অসংখ্য সরকারী কমিশনের রিপোর্ট দেখিয়েছে যে জাতপাত ও অর্থনৈতিক পদমর্যাদার মধ্যে একটা অদ্ভুত পারম্পর্য রয়েছে। কৃষি অঞ্চলগুলোতে অর্থনৈতিক জীবনের মইটার উচ্চতর ধাপগুলো অধিকৃত হয়ে রয়েছে কিছু উচ্চবর্ণের ও মধ্যবর্তী জাতগুলোর কিছু উচ্চতর স্তরের লোকজনদের দ্বারা আর অন্যদিকে নিম্নতর বর্গ, অনুসূচিত জাত ও উপজাতিগুলোর লোকেরা উক্ত মইটার নিম্নতর ধাপগুলোতে অবস্থান করছে।

কৃষিক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার নীতির ব্যাপক বিস্তার গ্রামাঞ্চলের স্থিতিশীল, পদমর্যাদা বিন্যস্ত সম্প্রদায়ভিত্তিক জীবনের ঐক্যতানটিকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে। ভারতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই নীতি জাতপাতগুলোর মধ্যেও প্রতিবিম্বিত হয়েছে। পুরাতন পদমর্যাদা-ভিত্তিক জাতপাত প্রতিটি জাতের এই নীতিটার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল যে তা একটা ঐশ্বরিক ব্যবস্থার অংগ হিসেবেই আপন ভাগ্যকে মেনে নেবে। সে ব্যবস্থাতে প্রতিটি জাতই একটা

সামগ্রিক সমাজব্যবস্থার অন্যান্য জাতগুলোর অনুপূরক হিসেবে বিবেচিত হত। সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন জাতের এই অ-প্রতিদ্বন্দ্বী ও অনুপূরক সম্পর্ক সেই ব্যবস্থাকে তার স্তরবিন্যাস ও অ-সাম্যাদর্শবাদী ভিত্তি সত্ত্বেও দিয়েছে একটা সংসক্তি। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজের ভিত হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি নাগরিকের সমতার নীতি সমাজ সংগঠনের এক নয়া নীতিরূপে বিবেচিত হয়েছে আর ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে তার কোন সন্ধান মেলেনি। কিন্তু পশ্চিমী জগতের তুলনায় তা একটা নতুন ও বিচিত্র ধরণের আলোড়নের জন্ম দিয়েছে ও বিভিন্ন জাতের মধ্যে সাম্যের জন্য সংগ্রাম সুরু হয়েছে। জাত কাঠামোর ভিতরে পরিবর্তনের পরিণতিতে একটা নতুন ধরণের উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। যে জাত ছিল সামগ্রিক সমাজ কাঠামোর একটা অনুপূরক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অংশ ছিল তা পরিবর্তনীয় পরিস্থিতিতে এখন একটা প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিট হিসেবে কাজ করছে। কৃষিক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা সমাজ জীবনের প্রতিটি দিককেই প্রভাবিত করে ফেলেছে। নিজেদের সংস্কারসাধনে অসংখ্য জাত আজ নানা আন্দোলনে নেমেছে উচ্চবর্ণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভিন্ন অনুশীলনকে গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণদের নানা প্রথা-সিদ্ধ আচারবিধি যেমন উপনয়ন, বিবাহ, উচ্চতর খাদ্যাভ্যাস ও বেশভূষা প্রভৃতিকে নিম্নতর জাতগুলোর লোকেরা উচ্চতর জাতগুলোর মর্যাদা সমানভাবে পেতে অনুসরণ করছে। অধিকন্তু অসংখ্য উপজাতীয় লোকজন সংঘবদ্ধ হয়ে অন্যান্য জাতগুলোর চোখে মর্যাদাবৃদ্ধিতে তাদের সংগে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এদের নানা সংগঠন, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি, ছাত্রবৃত্তি, পত্রপত্রিকা ও অতীত ইতিহাসের পুন-র্ব্যাখ্যার মাধ্যমে অতীতে উচ্চ মর্যাদার দাবী প্রতিষ্ঠা ও তার দ্বারা অন্যান্য উচ্চতর জাতগুলোর সংগে সাম্যাধিকারের সংগ্রামে জয়লাভের প্রয়াস কৃষিজ ভারতের সামাজিক চিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই শ্লেষাত্মক হলেও একথা সত্য যে নাগরিকদের সাম্যের নীতি—(জাতপাত ও অন্যান্য বিবেচনা নির্বিশেষে) যা একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ধনতান্ত্রিক অর্থ-নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সংবিধানে রয়েছে আর যে অর্থনীতি ভারতের বিচিত্র গ্রামীণ সমাজের বর্তমান অর্থনৈতিক নীতিগুলোর আলোকে আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠছে—সাম্যের অধিকারের সংগ্রামে সামন্ততান্ত্রিক জাতপাত সৃষ্টি করছে।

তাছাড়া যেমন আগেই বলা হয়েছে জাতপাত, সম্পদ, অর্থনৈতিক মর্যাদা, শ্রেণীগত অবস্থান, রাজনৈতিক ক্ষমতা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জগতে প্রবেশাধিকার

প্রভৃতির মধ্যে একটা অদ্ভুত পারম্পর্য থাকে। অধিগ্রাহী প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সংগ্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত ধনতান্ত্রিক সমাজের পরিবেশে, যাকে কংগ্রেস সরকার তার শিল্পনীতির মাধ্যমে সর্বজনীন করে তুলছে, নতুন ধরণের ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের উৎপত্তি হয়েছে। মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ-মারাঠা-মাহার সংগ্রাম, দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণবিরোধী, আদি-দ্রাবিড়, দ্রাবিড় কাজাগাম আন্দোলন ও ব্রাহ্মণ-নায়ার সংগ্রাম, বিহারের কায়স্থ, ভূমিহার, রাজপুত ও অনগ্রসর জাতগুলোর মধ্যে তীব্র সংগ্রাম, উত্তর প্রদেশে ঠাকুর, পাসিস্, চামার ও অন্যান্যদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অসংখ্য এই ধরণের সংগ্রাম আকারে জাতপাতের সমস্যা হলেও মৌলিক অর্থে সেগুলো আর্থ-সামাজিক।

নিম্নতর শ্রেণীগুলো কোন্ দিকে যাচ্ছে

কংগ্রেস সরকারের কৃষি নীতি, রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কাঠামো ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাদি কৃষিক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত প্রবাহ সৃষ্টি করেছে।

(১) বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তীব্র অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা যা সুনির্দিষ্ট জাত-পাতেরই যথাযথ প্রকাশ ইদানীং তীব্রতর হয়েছে। শুধুমাত্র জীবিকা অর্জনের পরিবর্তে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের প্রবণতা আজকের বৈশিষ্ট্য আর তার ফলে পুঁজি-বাদী জমিদাররা ও ধনী চাষীরা আরওধনবান আর মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র চাষীরা আরও দরিদ্র হয়ে পড়েছে। এর পরিণতিতে এই স্তরের চাষীরা বিপুল সংখ্যায় হয় নিঃস্ব কিংবা ক্ষেতমজুর হতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে বাড়ছে শ্রেণীগত মেরুভবন। বর্ধিত ক্ষমতার জোরে কৃষিসমাজের উপর নিজেদেরপ্রভাবপ্রতিপত্তি বাড়াচ্ছে ধনবান শ্রেণী-গুলো, পুঁজিবাদী জমিদাররা আর ধনী কৃষকরা যারা সকলেই উচ্চ জাতের অন্তর্ভুক্ত। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ফলাফল উল্লেখযোগ্য।

(ক) গ্রামীণ জনসংখ্যার নিম্নতর স্তরে কিছু লোকজন উৎখাত হয়ে নানা অপরাধমূলক কাজে জড়িত হয়ে পড়ছে। বলা বাহুল্য এ সব কাজ বাড়ছে।

(খ) যেহেতু দরিদ্র কৃষিজীবী শ্রেণীগুলো সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নজাতের পর্যায়ভুক্ত সেহেতু তারা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবীদাওয়া পূরণে সংগ্রাম বজায় রাখতে তাদের জাতসংগঠনগুলোকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করতে চাইছে।

(গ) তাছাড়া, শোষক শ্রেণী ও সরকারের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের প্রয়াসে জাতপাত বরাবর শ্রেণীসংগঠন গড়ে তোলার আন্দোলনও জোরদার হচ্ছে।

শ্রেণীগত দিক থেকে নিম্নতর স্তরে দুর্বল সংগঠন

হয় রাজনৈতিক কিংবা মতাদর্শগত স্বচ্ছতার অভাব কিংবা বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দলের ত্রুটিপূর্ণ সুযোগবাদী ও প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণের দরুন শ্রেণীগত দিক থেকে শোষিত মানুষদের সংগঠন, যা সক্রিয়ভাবে উল্লিখিত প্রবণতাদুটির মোকাবিলা করতে পারে, যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। শুধু তাই নয়। বামপন্থী দলগুলোর কয়েকটির কৃষকসমাজের উচ্চতর স্তরগুলোতে প্রধানতঃ সামাজিক শিকড় রয়েছে বলে তারা প্রায়শ সচেতন অথবা অচেতনভাবে সেই স্তরগুলোর মানুষদেরই স্বার্থ রক্ষা করে। ফলে দরিদ্র চাষী ও ক্ষেতমজুরের, যারা বিপুলসংখ্যায় হিন্দু সমাজের নিম্নতম জাতের অন্তর্ভুক্ত, স্বার্থ ও আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা কৃষিক্ষেত্রে বহুশ্রেণীভিত্তিক আন্দোলন পরিচালনা করে কিন্তু আন্দোলনকে প্রসারিত কিংবা তাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে চায় না যখন নিম্নস্তরের লোকদের চাপে আন্দোলনগুলো বিরাট চরমপন্থী শ্রেণী আন্দোলনে রূপায়িত হবার প্রবণতা দেখায়।

গ্রামাঞ্চলের নয়া 'এলিট' বা সেরা অংশ

কংগ্রেস সরকারের কৃষি নীতির কার্যকারিতার ফলে কৃষিসমাজের উচ্চকোটি মানুষেরা এক নয়া গ্রামীণ 'এলিটে'র জন্ম দিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এরাই ক্ষমতার কেন্দ্রগুলো দখল করছে। নানা ক্ষেত্রে এই স্তরের লোকেরাই নতুন আঞ্চলিক, জেলান্তরে ও প্রাদেশিক নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। শুধু তাই নয়। এরা গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসকে জোরদার সমর্থন জুগিয়ে থাকে। স্থানীয় প্রশাসন, জেলা বোর্ড ও অন্যান্য গ্রামীণ সংস্থাগুলোতে এরাই কর্মচারী পাঠিয়ে থাকে। প্রশাসনিক যন্ত্রের নিম্নতর স্তরগুলোতে এরাই কর্মীর জোগান দেয়। নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করতে এরা গ্রামাঞ্চল হতে রাজ্য আইনসভাগুলোতে, এমনকি সংসদেও, অনেক সদস্য পাঠায়। এসব স্তরের লোকদেরই প্রাধান্য দেখা যায় স্থানীয় প্রশাসনিক নানা কাজে, স্কুল বোর্ডে, পঞ্চায়েতে, নানা ধর্মীয়, জাতপাতভিত্তিক ও উপ-

জাতীয়সংস্থাগুলোতে। গ্রামাঞ্চলে গড়ে ওঠা বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক সংস্থাতে এদেরই লোকজন থাকে। বস্তুত, গ্রামঞ্চলে এরাই এখন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-ভাবে ক্ষমতাশালী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে।

Myron Weiner-এর অর্থপূর্ণ অভিমত

Myron Weiner-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষা "Political Leadership in West Bengal"-এ 'মধ্যবর্তী নেতৃত্বের' সংস্থিতির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। এ 'নেতৃত্ব' 'সমাজব্যবস্থা ও সরকারী কাঠামোর' মধ্যে একটা সংযোগসাধন করেছে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এর একটা নির্দিষ্ট এলাকা থাকে যাকে শুধুমাত্র নির্বাচনী এলাকা বলা চলে না; বরং একে বলা চলে গোষ্ঠী সম্বন্ধীকরণ —যেমন, একটা শ্রমিক সংঘ, কৃষক, শরণার্থী, জাতপাত কিংবা উপজাতীয় কোন সংগঠন; কোন ব্যবসায়ী সংস্থা কিংবা কোন পৌর সংঘ। আমাদের উল্লিখিত প্রবণতাগুলোর উপর এরা যথেষ্ট আলোকসম্পাত করে। লেখক বলেছেন:

"কম্যুনিস্ট ও মার্কসবাদী বামপন্থী ও কংগ্রেসীদের মধ্যে একটা বড় রকমের পার্থক্য রয়েছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা নানা পেশাভিত্তিক সংস্থা যেমন শ্রমিক সংঘ ও কিষাণ সমিতিগুলোতে নিজেদেরকে গভীরভাবে বিজড়িত করেছে আর পরবর্তী ব্যক্তিরা বেশিমাত্রায় নিজেদের জড়িত করেছে স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় পৌর কার্য-কলাপ আর নানা জাতপাত, ধর্মীয় ও উপজাতীয় সংস্থাগুলোতে। স্কুল বোর্ড, গ্রাম পঞ্চায়েত, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, উপজাতীয় ও তপশীলী জাতির সমাজ, মুসলিম সংগঠন, মন্দির সমিতি ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের অন্যান্য অনেক সংস্থায় এরা বেশি সক্রিয়। গ্রামীণ ভারতে সরকারী ও বেসরকারী এসব সংস্থা ক্ষমতা ও প্রভাবের কাঠামো তৈরী করেছে আর পশ্চিম বাংলায় এগুলোতেই রয়েছে কংগ্রেসের নির্বাচনী ক্ষমতা। বিধানসভার খুব কম সদস্যই শ্রমিক সংঘ ও কিষাণ সংগঠনে নিজেদের কর্মজীবনের ধারা তৈরী করেছে আর এর প্রকাশ ঘটেছে এই বাস্তব ঘটনাতে যে খুব কম অ-কংগ্রেসী লোকই কলকাতার বাইরে থেকে নির্বাচিত হয়ে থাকে। এগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব স্থানীয় পৌর সংস্থা-গুলোর ঐক্য টলিয়ে দেবার মত যথেষ্ট নয়। গ্রামেগঞ্জে অর্থনৈতিক সংঘাতের যদি স্পষ্ট প্রকটন হতো তাহলে কিষাণ সংগঠনগুলো, কৃষিশ্রমিকদের সমিতিগুলো,

ও এই ধরণের নানা সংগঠন ক্ষমতার উৎস হতে পারতো আর রাজনীতিকদেরও প্রভাব প্রতিপত্তির কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হতো। পশ্চিমবঙ্গে তা ঘটেনি আর কংগ্রেস দল বিভিন্নমুখী স্বার্থের গ্রন্থিবন্ধনের দায়বদ্ধতার দরুন গ্রামাঞ্চলে লাভবান হচ্ছে। ...অবশ্য সাম্প্রতিককালে বামপন্থী দলগুলো স্থানীয় সংস্থা, ঋণদান সমিতি, সমবায়সংস্থা ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোতে অনুপ্রবেশ করে কংগ্রেসীদের অনুসরণ করতে সুরু করেছে।" লেখক আরও বলেছেন, "সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেই গ্রামীণ নেতৃত্ব গড়ে উঠে যা শ্রেণীগত নয়, সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংঘবদ্ধ করে থাকে। ...স্থানীয় নেতৃত্বের উৎস হলো মধ্যবর্তী জমিদার, বড় চাষী ও অ-কৃষি মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলো। দরিদ্রতর চাষী ও ভাগচাষীরা এ নেতৃত্বের বিরোধিতা করতে পারে তবে এ ধরণের ঝোঁক এখনও দেখা যায় নি।"[৫]

এগুলোই হলো গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন কাজের প্রবণতা। উত্তেজনা ক্রমবর্ধমান আর সমগ্র গ্রামীণ জগৎ নিম্নতর স্তরগুলোর লোকজনদের গভীর অসন্তোষে ফেনিয়ে উঠছে। অবশ্য শ্রেণী সংগঠনের অভাবে এ অসন্তোষ সংগঠিত শ্রেণী আন্দোলনে রূপ নিতে পারছে না। বরং তার প্রকাশ ঘটছে আংশিকভাবে সংগঠিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত নৈরাজ্যবাদী কাজ ও কখনও কখনও প্রায়শ ঘটা নানা অপরাধমূলক বিস্ফোরণে।

শোষিত শ্রেণীগুলো ও উৎপাটিত উপজাতীয় লোকদের শ্রেণীগতভাবে সংগঠন ও সংঘবদ্ধ সংগ্রামের অভাব সমাজের উচ্চজাত ও সম্পদশালী লোকদেরই সাহায্য করছে যারা নিজেদের সুবিধার্থে সরকারের বর্তমান আর্থিক নীতিগুলোকে পুরো-পুরি ব্যবহার করছে আর বেশ চতুরতার সংগে শোষিত শ্রেণীগুলোর সাবেকী সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও বিভাজনকে কাজে লাগাচ্ছে যাতে কৃষিজীবীদের মধ্যে একতা ও সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে না উঠতে পারে। শুধু তাই নয়। এ সব উচ্চকোটির লোকেরা আরও কয়েক কদম এগিয়ে নিজেদের গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব ও সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজনা জিইয়ে রাখতে নিম্নকোটি মানুষদের অসন্তোষকে কাজে লাগাচ্ছে। এদের উদ্দেশ্য চরিতার্থতায় উল্লিখিত অসন্তোষকে এরা অসংখ্য আন্দোলনে প্রবাহিত করছে।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে গ্রামগঞ্জে ও শহরাঞ্চলে যে সব সামাজিক প্রবণতা

৫. Economic Weekly, Special Number, July 1959, pp. 929-931

দেখা যাচ্ছে আমরা তাদের সম্বন্ধে পর্যালোচনা সম্পূর্ণ করলাম।

গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রেই সরকার অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতিগুলো ও তার সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাদি (যেগুলোকে ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই বাস্তবায়িত করা যায়) প্রাথমিকভাবে নিম্নবর্ণের লোকদের তুলনায় উচ্চতর শ্রেণীর লোকদেরই উপকারে লাগছে। জনগণের ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর দারিদ্র্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে আর তার পরিণতিতে দেখা যাচ্ছে উত্তেজনা ও সংঘাতের তীব্রতা। যখন তখন বিস্ফোরক পরিস্থিতি আর সংগঠিত কিংবা স্বতঃস্ফূর্ত ও নৈরাজ্যবাদী তীব্র সংগ্রামের স্ফুলিংগ দেখা যায়।

নতুন গভীরতর এক সামাজিক সংকট

পুঁজিবাদী কংগ্রেস শাসনে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজে গভীরতর এক সংকটের দিকে যাচ্ছে। খাদ্য সমস্যা তীব্র হয়ে উঠছে। জিনিষপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। জনজীবনের মান নেমে যাচ্ছে। বেকারত্ব বাড়ছে।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে এককালে জনগণের জাগ্রত আশা ও স্বপ্ন দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হলো জনগণ (স্বল্পসংখ্যক পুঁজিবাদী, বৃত্তিভোগী উচ্চ-স্তরের ধনবান ব্যক্তি, উচ্চস্তরের আমলা ও এ ধরণের গোষ্ঠীভুক্ত লোকদের অবশ্য বাদ দিয়ে) দেখছে যে তাদের জীবনের মান বাড়ছে ত নয়ই বরং বছরের পর বছর কমছে। রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের অনুসৃত নীতিগুলোই এর কারণ বলে তারা মনে করে। যেমন আমরা আগেও দেখেছি, কংগ্রেসের নীতিগুলো জনগণের কল্যাণ আনতে পারে না কেননা সেগুলোর ভিত্তি হলো 'ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্বীকার্যগুলো আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামোর' মধ্যেও তারা কাজ করতে চায়। বলা বাহুল্য, প্রচলিত ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এ উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া সম্ভব নয়।

কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা ও দলের মধ্যে নানা ভাংগনের মধ্যেই এ পরাজয়ের প্রতিফলন ঘটছে।

এ

মতাদর্শগত প্রবণতা

আমরা এখন যুদ্ধোত্তর বছরগুলোতে আমাদের দেশে প্রবহমান প্রধান প্রধান মতাদর্শগত স্রোতোধারার উল্লেখ করবো।

সব সমাজের ইতিহাস এ কথাই বলে যে সমাজের আধিপত্যশীল সংস্কৃতি কর্তৃত্বপূর্ণ শ্রেণীর সংস্কৃতিরই নামান্তর; বিশেষ করে যে শ্রেণী সেই সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে।

ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণীই আধিপত্যশীল শ্রেণী কেননা এ দেশের সমাজ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেই কারণে আমাদের দেশের আধিপত্যশীল সংস্কৃতি উক্ত পুঁজিবাদী শ্রেণীর সংস্কৃতিরই অন্য নাম।

সাধারণতঃ, উত্থানের পর্যায়ে পুঁজিবাদী শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য হলো একটা বৈজ্ঞানিক, যুক্তিবাদী বস্তুগত কৃষ্টি। সেই কারণে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশগুলোতে বাড়ন্ত পুঁজিবাদী শ্রেণী একসময় সামন্ততান্ত্রিক আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির উপর যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তাদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের Bacon, Locke, Hume, আর ফ্রান্সের Decartes, Holbach, Helvetius, Diderot প্রমুখেরা সামন্তসমাজের ধর্মীয়-অতীন্দ্রিয়বাদী দার্শনিক প্রতীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল আর যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্ স্থাপন করেছিল।

আমরা যেমন পূর্বেই বলেছি যে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী তার বিশেষত্বপূর্ণ উৎপত্তি, বিলম্বিত আবির্ভাব ও দুর্বল ঐতিহাসিক অবস্থানের দরুন ব্রিটিশ যুগেই হোক অথবা তার পরেই হোক একটা সর্বব্যাপী সেকুলার, যুক্তিসিদ্ধ অথবা

বস্তুবাদী দর্শন বিশদভাবে গড়ে তুলতে পারে নি। আরও স্পষ্ট করে এর কারণ আমরা দিতে পারি।

আধ্যাত্মিক সমর্থনপুষ্ট ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় ধনতন্ত্রবাদের বিকাশ ঘটেনি। ভারতীয় ধনতন্ত্রবাদ ছিল সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের উপজাত। ফলে তার নিজের বিকাশে ভারতীয় পুঁজিবাদ প্রচলিত সামন্তযুগীয় কিংবা প্রাক্-সামন্তযুগীয় দর্শনের ধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে নি।

বিশ্বের পুঁজিবাদের অবনয়ন পর্যায়ে জন্ম ভারতীয় পুঁজিবাদের। তখন উন্নত দেশগুলোতেও ধনতন্ত্রবাদের সাধারণ সংকটের দরুন, ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া শ্রেণী সংকটের কারণ সম্বন্ধে অবহিত না হয়ে যুক্তিসিদ্ধ ও বস্তুবাদী দর্শন ক্রমবর্ধমান-ভাবে বর্জন করতে থাকে আর আধ্যাত্মিক-অতীন্দ্রিয় বিশ্বদৃষ্টির দিকে ঝুঁকতে থাকে। ভারতের পুঁজিবাদী শ্রেণীর আদর্শবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তযুগীয় দর্শনের দিকে হেলে পড়ার আরও কারণ ঘটেছে; কেননা জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে অক্ষমতার জন্য জনঅসন্তোষ ও দুর্বল পুঁজিবাদী অর্থনীতির ব্যর্থতা রয়েছে তার সামনে।

ভাববাদী ও ধর্মীয়-পুনরভ্যুদয়বাদী প্রবণতা

এটা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয় যে পণ্ডিত নেহরু ছাড়া কংগ্রেসের অতীত ও বর্তমানের প্রথম সারির নেতারা, যেমন, মহাত্মা গান্ধী, রাজাগোপালাচারী, সি. আর দাস, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্যাটেল ভ্রাতারা ও অন্যান্যরা ভাববাদী ও ধর্মভিত্তিক দর্শনের প্রবল অনুষংগী ছিলেন। ভারতের বুদ্ধিজীবীরাও বুর্জোয়া কেননা তারা ভারতীয় সমাজের পুঁজিবাদী ভিত্তিকেই মেনে নিয়েছে—ভারতীয় ধনতন্ত্রবাদের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দরুন যুক্তিসিদ্ধ ও বস্তুবাদী আগ্রহ দেখাতেও তারা অক্ষম। শুধু তাই নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকটকালীন সমস্যাগুলো যতই জটিল হয়ে উঠছে ও সমাধানের বাইরে চলে যাচ্ছে তাদের মধ্যে ধর্মীয় ও অতীন্দ্রিয় বিশ্বদৃষ্টির দিকে ঝুঁকে পড়ার ব্যস্ততা আরও দেখা যাচ্ছে।

যুদ্ধ-উত্তর কালে প্রধান মতাদর্শগত প্রবণতার মধ্যে এর প্রকাশ কেমন করে ঘটছে আমরা তা সংক্ষেপে দেখাতে পারি।

মৌলিক অর্থে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী একটা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল ঠিকই। এটাও ঠিক যে এ রাষ্ট্র আধুনিক বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও উদারপন্থী গণতান্ত্রিক শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছে। তথাপি উক্ত শ্রেণী ও তার অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধিজীবীরা সংস্কৃতির জগতে পুনরুজ্জীবনবাদী হয়ে পড়েছে আর জনগণের মধ্যে সাবেকী আধ্যাত্মিক ও ভাববাদী দার্শনিক ধারণাগুলোকে জনপ্রিয়, সমর্থন ও প্রচার করছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ

(১) স্বরাজলাভের পর স্বাধীন ভারতবর্ষকে সাবেকী হিন্দু ঐতিহ্যের আলোকে ভারত নামে অভিহিত করা হয়েছে।

(২) সর্বভারতীয় ভাষারূপে সংস্কৃতের সুগন্ধি মেশানো হিন্দীকে গ্রহণ করার মধ্যেই তাদের পুনরুজ্জীবনবাদ প্রমাণিত হয়েছে। মুসলিম সংস্কৃতির যে কোন আকর্ষণীয় দিককেই বর্জন করা হয়েছে। হিন্দুস্থানী শব্দটি বাদ দিয়ে হিন্দী গ্রহণ করার মধ্যেও এ পক্ষপাতিত্ব রয়েছে।

(৩) জাতীয় প্রতীকগুলোর নির্বাচনে (ধর্মচক্র প্রভৃতি) প্রাক্-মুসলিম যুগের কয়েকটি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াসেও এ লক্ষণ স্পষ্ট।

(৪) এ প্রবণতা খুব স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সাংস্কৃতিক পুনরভ্যুদয়ের মধ্যে যা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে পুরাতন হিন্দু ও প্রাক্-মুসলিম ঐতিহ্যগুলোর উপর। ধর্মীয় ও কুসংস্কার-যুক্ত নানা উৎসব (রামলীলা প্রভৃতি), বিভিন্ন মেলা (যেমন কুম্ভমেলা) ও এই ধরণের কর্মসূচীকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা যার সংগে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকেন একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বিখ্যাত নেতৃবৃন্দ ও ক্ষমতাসীন দলের খ্যাতিমান লোকেরা, তাদের সচেতন কিংবা অবচেতন মনে পুনরুজ্জীবনবাদী হিন্দু ধর্মের অন্তঃপ্রবাহকে নির্দেশ করছে।

(৫) সাধু সমাজকে সংগঠিত করে ও তাকে ভারত সেবক সমাজের সাথে সংযুক্ত করা আর তার দ্বারা হিন্দু সমাজের সবচেয়ে সচেতন রক্ষণশীল ও গোঁড়া অংশকে নৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের এজেন্ট হিসেবে কাজ করানোর প্রয়াস—আর তাও কংগ্রেসের উচ্চপদস্থ নেতাদের সক্রিয় সহযোগিতায়—এটাই প্রমাণ করেছে যে কেমন-ভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর দল ও রাষ্ট্র জনগণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তিশালী করে রাখতে চাইছে।

(৬) কংগ্রেস দলের খ্যাতিমান ও দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে

ধর্মশিক্ষা প্রবর্তনের, বিশেষ করে, বিদ্যালয়ের শিশুদের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কার প্রচারের সাম্প্রতিক উপদেশ একই প্রবণতার দৃষ্টান্ত।

(৭) মন্ত্রী, প্রাক্তন মন্ত্রী, রাজ্যপাল, প্রাক্তন রাজ্যপাল, কংগ্রেসের বর্তমান ও প্রাক্তন নেতৃবৃন্দ ও গান্ধীবাদী সর্বোদয় আন্দোলনের সাথে জড়িত বিভিন্ন নেতার সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় পুনরভ্যুদয়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক, কলা ও নান্দনিক কেন্দ্র স্থাপন ও নানা প্রকাশনার প্রয়াস একই উপাখ্যান বলে দিচ্ছে।

(৮) আকাশবাণীর মাধ্যমে প্রভাতী অনুষ্ঠানের সুরুতেই ভজন ও নানা ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশনে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল অসহায় মানসিকতার প্রতিফলন ঘটে।

(৯) এ ধরণেব প্রবণতার আর একটি প্রমাণ হলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের সাম্প্রদায়িক, জাতপাত হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনে সক্রিয় ও উৎস হব্যঙ্কে যোগদান ও অসংখ্য ঐতিহ্যকে ধর্মীয় ছাঁচে নতুন করে গড়ে তোলা।

(১০) ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নবজীবন বা রেনেসাঁসের মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক সারমর্মের রূপদানে ভাববাদী ও ধর্মীয়-পুনরভ্যুদয়বাদী নানা প্রবণতার প্রমাণ মেলে আচার্য বিনোভা ভাবে, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও অন্যান্য নেতাদের সাম্প্রতিক "বৈদিক ও গীতার যুগে" ফিরে যাওয়ার দৃষ্টিকোণটিতে। রাজেন্দ্র-প্রসাদ, রাধাকৃষ্ণণ, রাজাগোপালাচারী ও অন্যান্য নেতাদের সুগভীর ভাববাদী ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ, পণ্ডিত নেহরুর মত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসীদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তির নানা উপদেশ ও পরামর্শের মধ্যে অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরাও সর্ব পুঁজিবাদী দেশে বিকাশশীল এই ধরণের প্রবণতার সংগে কিছুটা অপরিণতভাবেও সংগতি রেখে চলেছে। সদর্থক অর্থে অসম্মানিত হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী, হেতুবাদ, প্রগতিশীলতা, আশাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা। সুযোগসন্ধানী প্রয়োগবাদ যাকে সমর্থন করে চলে দার্শনিক ভাববাদী অথবা ধর্মীয় ব্রহ্মবিদ্যাগত বিশ্বদৃষ্টি বাস্তবতাকে আচ্ছন্ন করে দিতে চাচ্ছে তার প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব ছড়িয়ে। উদ্দেশ্য— বিশ্বসমাজের সংকটের প্রজন্মগত কারণ হিসাবে একটা সেকেলে পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থাকে গোপন করা।

বর্তমানে ভারতের জনগণের আসল সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া

শ্রেণীর মতাদর্শগত ও ধর্মীয়-অতীন্দ্রিয় দার্শনিক প্রতীতির দ্বারা যা আরও দৃঢ় হয়েছে জনগণের মধ্যে বাধাহীনভাবে প্রচলিত একটা অপরিণত পৌরাণিক কৃষ্টির মাধ্যমে সমাজজীবনে এ ধরণের সংস্কৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কেননা ভৌত ও সামাজিক জগতের বিষয়ে তা খুবই ক্ষুদ্র চিত্র উপস্থাপিত করে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের প্রধান কারণগুলোর অপব্যাখ্যা করে আর নানা সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানের পথ থেকে ভিন্নমুখী করবার জন্য জনগণের চেতনাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

অবশ্য এ ধরণের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দেশে কিছু যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী আদর্শগত প্রবাহও দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে উল্লিখিত হতে পারে মার্কসীয় বস্তুবাদ ও এম এন. রায়ের প্রচারিত আমূল সংস্কারবাদী মানবতাবাদ। তবে জনগণের মধ্যে তাদের প্রভাব সীমিত হলেও ক্রমবর্ধমান এটাই লক্ষ্যণীয়।

ট

রাজনৈতিক সংগঠন

ভারতের বুর্জোয়া দল কংগ্রেসের পাশাপাশি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের উল্লেখ এখন আমরা করবো।

১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল, ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পৃথক হয়ে যায়। ভাংগনের পর এই সমাজতান্ত্রিক দল সামাজিক গণতন্ত্রের আদর্শে আস্থাশীল ছিল। এ দল চেয়েছিল নির্বাচনী জয়ের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করতে, চেয়েছিল সংসদীয় সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করে সমাজতান্ত্রিক সরকার গড়তে। পরে আচার্য কৃপালনির নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী গোষ্ঠীর সংগে সংঘবন্ধ হয়, আর জন্ম হয় নতুন প্রজা সোস্যা-লিস্ট দলের। জনসাধারণ ও মধ্যবিত্তকে শ্রমিক সংঘ, কিষাণ সমিতি ও কর্মচারীদের নানা সংগঠনগুলোতে সংঘবন্ধ করার কর্মসূচী নেয় এ দল। প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া ও চূড়ান্ত সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্যর ভিত্তিতেই এ কর্মসূচী গৃহীত হয়। চরম লক্ষ্য হিসেবে নির্বাচনী বিজয়, সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন, সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠন ও ধনতন্ত্রবাদকে সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে অপসারণের জন্য এ দল উল্লিখিত শ্রেণীগুলোর সংগ্রামে ব্রতী হয়।

প্রসংগতঃ অবশ্য একটা অদ্ভুত ঘটনা উল্লেখ্য। পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশ-গুলোতে ধনতন্ত্রবাদের সাফল্যপূর্ণ বিকাশের পর্যায়েই সামাজিক গণতান্ত্রিক দল-গুলো (ব্রিটেনের শ্রমিক দল প্রভৃতি) উন্নতি করেছিল। এদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল নানা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কেননা পুঁজিবাদী শ্রেণীর হাত থেকে এরা জীবনের উল্লেখযোগ্য মান ও অন্যান্য সংস্কার আদায় করতে পেরেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল পুঁজিবাদী শ্রেণীর ঔপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে পাহাড়প্রমাণ মুনাফা

অর্জন করে সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর অসন্তোষকে এড়াতে পারার ক্ষমতার দরুন। পক্ষান্তরে, এ সব শ্রেণীকে সুবিধাদানের ব্যাপারে ভারতীয় পুঁজিবাদ অর্থনৈতিকভাবে ভীষণ দুর্বল। ফলে ভারতে শ্রেণীসংগ্রাম প্রগ্রতিশীল-ভাবে বেড়ে উঠছে। প্রজা সোস্যালিস্ট দল তার সামাজিক গণতন্ত্রের আদর্শগত ও মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসের দরুন সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোকে পরিপূর্ণ নেতৃত্ব দিতে অক্ষম। অধিকন্তু, তীব্রতর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের প্রভাবে Dr R M. Lohia-র নেতৃত্বে প্রজা সোস্যালিস্ট দলের একটা বড় অংশ পরবর্তীকালে বেরিয়ে আসে ও একটা স্বতন্ত্র সোস্যালিস্ট দল গড়ে তোলে।

পুঁজিবাদী শ্রেণীর নিম্নতর স্তরগুলোতেই প্রজা সোস্যালিস্ট দল সামাজিক-ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই শ্রেণী শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক একচেটিয়া কারবার, মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর উচ্চতর ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত স্তর ও শ্রমিক শ্রেণীর কিছু অংশের দ্বারা সম্প্রস্ত ছিল। দলের মধ্যে দেখা দেয় নানা সংহতিনাশক ঝোঁক। দেশে শ্রেণীসংঘাত তীব্র হতে থাকলে মতাদর্শগত বিভ্রান্তি ও সাংগঠনিক সংকটও ছড়িয়ে পড়ে।

Dr. Lohia-র নেতৃত্বে সোস্যালিস্ট দলের ভিতটা ছিল শহর ও গ্রামাঞ্চলের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর কৃষিজীবীদের মধ্য স্তরগুলো। সেই কারণে প্রজা সোস্যা-লিস্টদলের তুলনায় এর বৈশিষ্ট্য ছিল অধিকতর চরমপন্থী ও সংগ্রামী মানসিকতা। এর মত্যাদর্শগত বিভ্রান্তি অবশ্য ছিলই আর প্রজা সোস্যালিস্ট দলের মতই জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্লাসিকাল মতাদর্শকে যার অপর নাম গান্ধীবাদ এই দল শ্রমিক দলের মতাদর্শের সংগে সংশ্লেষণে প্রয়াসী ছিল।

এ দুটি দলই মার্কসবাদকে বর্জন করে।

সংসদের প্রধান বিরোধী দল ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির অবশ্য বিস্তৃত গণভিত্তি রয়েছে। পৃথিবীর সব কম্যুনিস্ট দলের মত এই দল বৃদ্ধি অবশ্য দেশের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আসেনি, বরং এসেছে কোন নির্দিষ্ট সময়ে সোভিয়েত সরকারের পররাষ্ট্র নীতির জরুরী প্রয়োজন থেকে। ফলে এ দলের নীতিতে জাতীয় পরিস্থিতিতে বাস্তব পরিবর্তনের তাগিদে না হলেও ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটেছে। দলের নেতৃত্বে থাকাকালে রণদিভে ভারতীয় বিপ্লবকে সমাজ-তান্ত্রিক আখ্যা দিলেও পরে এ বিপ্লব সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বলে অভিহিত হয়। পূর্বে সমগ্র ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে প্রতিক্রিয়াশীল বললেও

এরা সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর অংশ নয়, এমন জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল আখ্যা দেয়। এক সময় তেলেংগানায় দুঃসাহসিক বিদ্রোহের মাধ্যমে দল তার শ্রেণীসংগ্রামের নীতিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। আর এখন এরা শ্রেণী সমঝোতার নীতি নিয়ে চলেছে ; ধনতান্ত্রিক "পাঁচশালা পরিকল্পনা"গুলোকে সমালোচনামূলক সমর্থন দিচ্ছে আর অমৃতসর কংগ্রেস থিসিস্ অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ বুর্জোয়া সংসদীয় গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের সামাজিক গণতান্ত্রিক তত্ত্বের আলোকে ধনতন্ত্রবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পছন্দ করছে।

কম্যুনিস্ট দলে প্রচণ্ড রাজনৈতিক ক্ষতি করেছে এই ধরণের নীতিগত নানা বাঁক। কেরালায় এক সময়) প্রায় সমস্ত মানুষের বৈরিতা অর্জন করে দলের জীবনে চরম পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াটারলুর স্মৃতি জাগ্রত হয়েছিল।

আরও কিছু দল অবশ্য ভারতবর্ষে রয়েছে. যেমন, বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল, ফরওয়ার্ড ব্লক, বেশ কিছু শ্রমিক ও কিষাণদের দল, জনসংঘ, স্বতন্ত্র দল (রাজা-গোপালচারী নেতৃত্বে গঠিত) প্রভৃতি। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রাদেশিক স্তরে নতুন কিছু দলও গড়ে উঠছে। দেশে তীব্র সংকটের দরুনই এ ঘটনা ঘটছে। নবজাগ্রত জাতপাত ও সামাজিক আর্থিক গোষ্ঠীগুলো নিজেদের স্বার্থেই দল গড়ে তুলছে। বিভিন্ন মাত্রায় কংগ্রেসের মত সুপ্রতিষ্ঠিত পুরাতন দলগুলো তাদের জীবনে সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক সংকটের অভিজ্ঞতা লাভ করছে।

তীব্র অর্থনৈতিক সংকট ও শ্রেণী সংগ্রামের পরিণতিতে উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ভারসাম্যহীনতার ফলেই দেখা যাচ্ছে এ সব আলোড়ন ও ভাংগনের প্রক্রিয়া।

৬

মূল ধারণা

যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ-উত্তর পর্যায়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা আমরা শেষ করলাম।

এ পর্যালোচনা হয়েছে খুবই সংক্ষিপ্ত। উপসংহারের সংযোজনার সীমিত অংশের সংগে সংগতি রেখেই তা হয়েছে। উল্লিখিত সময়ে ভারতবাসীর অভিজ্ঞতায় যে সব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতিগত ঘটনা এসে পড়েছে আমরা সেগুলোরই আলোচনা করেছি। অবশ্য আমরা নানা ঘটনার প্রধান প্রধান প্রবণতাগুলোরই উল্লেখ করেছি।

উল্লিখিত বছরগুলোতে ভারতীয় সমাজের বিকাশ-প্রক্রিয়ার মূল্যায়নের বিষয়ে প্রধান এই ধারণাই হয় যে দুর্বল পুঁজিবাদী ভারতীয় সমাজ, বিশ্বপুঁজিবাদের সাধারণ সংকটকালে (যে পুঁজিবাদের অংশ ভারতীয় সমাজও বটে) সমাজব্যবস্থা হিসেবে উক্ত সংকটাবস্থা হতে উদ্ভূত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক শিক্ষা-বিষয়ক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলোর সমাধানে অক্ষম।

এর অর্থ হলো ধনতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কের গর্ভে ও পুঁজিবাদী সম্পত্তি সম্পর্কের ভিত্তিতে, একটা সমৃদ্ধিশালী শিল্প ও বিকাশমান কৃষিব্যবস্থা, একটা বৈজ্ঞানিক ও শিল্পবোধসম্পন্ন সংস্কৃতি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

ভারতীয় সমাজের বর্তমান সংকট তার সেই সব আখ্যানমূলক সর্পিল পথে, আরও তীব্র হয়ে উঠবে, আর তার পরিণতিতে আসবে আরও অর্থনৈতিক ভারসাম্য-হীনতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, আর সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধঃপতন।

এ ধরণের পূর্বাভাস দিতে আমাদের খুবই অনীহা রয়েছে ; তথাপি বছরের পর বছর ভারতীয় সমাজের বিকাশের (কিংবা অবনতির) আসল প্রক্রিয়া এই

পূরণের অনুজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে আমাদের সামনে নিয়ে আসছে।

ধনতন্ত্রবাদে জনদারিদ্র্য, জনবেকারত্ব, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূর করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয়। প্রতিক্রিয়াশীল জাতপাত ও বংশধারায় প্রাপ্ত সামন্ততান্ত্রিক নানা প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিহ্ন করা। সংকটভরা ধনতন্ত্রবাদ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়ার হাতই শক্ত করে।

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিবিধ লক্ষ্য যেমন একটা সমৃদ্ধিশালী অর্থনীতি গড়ে তোলা, গণতান্ত্রিক ছাঁচে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্বিন্যাস, পৌর স্বাধীনতাগুলোর পূর্ণ প্রস্ফুটন, আর জ্ঞান ও সংস্কার প্রসারে বাধাদানকারী সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদী ও অপরিণত পৌরাণিক সংস্কৃতিকে একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধ সংস্কৃতির দ্বারা প্রতিস্থাপনের কাজ ভারতের মত অনগ্রসর দেশে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাধারণ সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিকভাবে দুর্বল ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা বাস্তবায়িত হতে পারে না।

ভারতীয় সমাজের বর্তমান সংকটের সমাধান একমাত্র সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই সম্ভব। সমাজতন্ত্রই পারে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে, পারে উচ্চতর বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পথে ভারতীয় জনগণকে এগিয়ে দিতে।

শ্রমজীবী মানুষের হাতে অর্পিত ক্ষমতা যা বাস্তবায়িত হবে ব্যক্তির উন্নততর সমাজতান্ত্রিক স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আর সংবিধানে 'উৎপাদনের উপায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের' পরিবর্তে 'কাজের অধিকারকে' মৌলিক অধিকার হিসেবে সূত্রবদ্ধ করাই হলো ভারতীয় সমাজের ঐতিহাসিকভাবে উন্নততর রূপান্তরের একমাত্র অপরিহার্য পূর্বসর্ত।

আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থ "Social Background to Indian Nationalism" ও বর্তমান রচনার এটাই মৌল ধারণা।

গ্রন্থপঞ্জী

Agarwal, S. N. : Gandhian Plan of Economic Development, 1944
All India Congress Committee : Report on the Agrarian Reform
Anshen, Ruth : Our Emergent Civilization, 1947
Appleby, P. H. : Public Administration in India, Report of a Survey, 1953
Azad, Abul Kalam : India Wins Freedom, Bombay, 1959
Azad, Abul Kalam : Speeches of Maulana Azad, 1947-1955, Calcutta, 1956
Baily, F. G. : Caste and the Economic Frontier
Ball, W. M. : Nationalism and Communism in East Asia, 1952
Baran, Paul : The Political Economy of Growth, 1958
Bernal, J. G. : Science in History, 1957 ;
" " : World Without War, 1958
Bhave, Acharya Vinoba : Bhoodan to Gramdan.
Bhave, Acharya Vinoba : The Principles and Philosophy of Bhoodan Yagna
Bhattacharya, Dhiresh : India's Five Year Plans—An Economic Analysis, 1957
Blackett, P. M. S. : Atomic Weapon and East West Relations, 1956
Booner, A. : Economic Planning and the Co-operative Movement, 1950
Brookings, Institution : Major Problems of United States Foreign Policy, 1950 51
Buchanan, Norman S. & Ellis, Howard S. : Approaches to Economic Development, 1955.
Burns, W. : Technological Possibilities of Agricultural Development in India, 1944
Carstairs, G. Morris : The Twice Born
Census of India : 1951

Chowdhuri, Manmohan : The Gramdan Movement.
Clark, C. G. : The conditions of Economic Progress, 1957. Conference on Cultural Freedom in Asia—Freedom and Economic Planning, 1955 (Proceedings)
Congress of Cultural Freedom : The Future of Freedom, 1956
Constituent Assembly Debates : Vol. 5
Dange, S A. : India from Primitive Communism to Slavery
David Kingsley : The Population of India and Pakistan, 1951
De Castro J. : Geography of Hunger, 1952
Desai, A. R. : Social Background of Indian Nationalism, 1956
Desai, A. R. : Rural Sociology in India, 1959
Desai M. B. : Report on an Enquiry into the working of the Bombay Tenancy and Agricultural Lands Act of 1948 in Gujarat.
Desai, Neera A. : Woman in Modern India, 1957.
Deshmukh, C. D. : Economic Development in India, 1957
Development Department (West Bengal) : India's villages (A collection of Articles originally published in 'Economic Weekly', Bombay)
Dhillon, Harvant : Leadership and Congress in a South Indian Village.
Dobb Maurice : Some Aspects of Economic Development, 1951
Dobb, Maurice: Soviet Economic Development since 1917, 1949.
Dobb, Maurice : On Economic Theory and Socialism, 1955.
Dube, S. C. : Indian Village 1955.
Dube, S. C. : India's Changing Village, 1958.
Dutt, R. P : India To-day and To-morrow, 1955
Dutt, R. P. : The Crisis of Britain and the British Empire, 1953
Dutt, R. P : India To-day, 1949
Emerson, Rupert : Representative Government in South East Asia, 1955
F.A.O. : State of Food and Agriculture 1953 to 1957
F.A.O. : Year Book of Food and Agriculture Statistics

Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries : Second Five Year Plan, 1955
Fourth International : The Death Agony of Capitalism.
Fryer Peter : Hungarian Tragedy, 1957
Gadgil, D. R. : Economic Policy and Development, 1955
Gadgil & Sovani : War and Indian Economic Policy, 1943
Ghosh, Alak : New Horizon in Planning, 1956
Ghosh, Bimal C. : Planning For India, 1944
Ghurye, G. S : Caste and Class in India, 1957
,, ,, : The Problem of the So-called Aborigines
Gorwala, A. D. : Report on Public Administration, 1951

Government of India

1. Rural Manpower and Occupational Structure (Ministry of Labour)
2. Report of the Agricultural Labour Enquiry (Office of Economic Advisers)
3. Recent Economic andSocial Trends in India, 1946 (Planning Commission)
4. The Frist Five Year Plan, 1952
5. The Constituent Assembly Proceedings
6 The Constitution of India
7. States Reorganisation Commission Report
8 Indian Labour Year Book (various years)
9. Report of the village Small Scale Industries Committee (Karve Committee)
10. Indian Tax Reform—Report of a Survey by Nicholas Kaldor, 1956
11. Report of the Taxation Enquiry Commission
12. The Second Five Year Plan
13. Review of First Five Year Plan, 1957
14. Agricultural Legislation in India
15. Indian Year Books (various volumes)

Gupta, H. C. : Problems and Process of Economic Planning in Underdeveloped Economics with Special Reference to India, 1958.

Gutkind, E. A. : Creative Demobilization (2 vols.) containing Principles of National Planning and Case studies in National Planning, 1948

Hanson, A. H. (Ed.) : Public Enterprise, 1955

,, ,, ,, : Public Enterprise and Economic Development, 1959

Harris Seymore E. : Economic Planning, 1949

Hayek, F. A. : Collective Economic Planning, 1935

Hough, Eleanor M. : The Co-operative Movement in India, 1959

Indian Society of Agriculture Economics : Seminar on Rational of Regional Variations in Agrarian Structure of India (Proceedings)

Jennings : Some Characteristic of Indian Constitution

Kahin G. M. : Nationalism and Revolution in Indonesia

Kapadia, K. M : Marriage and Family in India, 1955

Khare, G. P. : Planning in India, 1958

Kohn Hans : Idea of Nationalism, 1956

Kosambi, D. D. : The Introduction to the study of Indian History, 1956

,, ,, : Exasperating Essays.

Kozlov, V. : Bourgeois Nations and Socialist Nations

Kummarappa, J. C. : Planning by the People for the People, 1954

Lange, O. &. Taylor, F. M. : On the Economic Theory of Socialism, 1938

Laski, H. J. : The State in Theory and Practice, 1935

Lavis Oscar : Group Dynamics in a North Indian Village : Study of Faction.

Lavis Oscar : Village Life in Northern India
Lenin : Collected Works, Vols. I and II
Lenin, Arthur : The Theory of Economic Growth, 1955
Lumby E. W R. : The Transfer of Power in India, 1954
Madan, B. (Ed.) : Economic Problems of Underdeveloped Countries in Asia, 1953
Majumdar, D. N & Others (Ed.) : Rural Profiles
Malavia, H. D. : Land Reforms in India, 1955
„ „ : Village Panchayat in India, 1956
Mannheim, Karl : Freedom, Power and Democratic Planning, 1951
Mao Tse Tung : Selected Works, Vols. I to IV
Marriot McKim (Ed.) : Village India, 1955
Matthai, John : Village Government in British India, 1915
Hazlewood, A. : The Economics of "Under developed Areas"
Mehta, Asoka & Patwardhan, A. : The Communal Triangle in India, Allahabad.
Mehta, Asoka : Report on Foodgrains Enquiry Committee, Delhi, 1957
Mehta, M. M. : Structure of Indian Industries, 1955
„ „ : Combination Movement in India, 1952
Menen, V. P. : Transfer of Power in India, 1957
„ „ : Story of Integration of the Indian States, Bombay, 1956
Mills, C. W. : The Power Elite, 1956
Ministry of Food & Agriculture : Bibliography of Indian Agricultural Economics
Mitra, K (Ed) : Economic Freedom and Economic Planning
Mukherjee, Ramkrishna : The Dynamics of a Rural Society, 1957
Murphy, G. & L. B. : In the Minds of Men, 1953
Myers, C. A. : Industrial Relations in India, 1958
Narayan, J. P. : Socialism to Sarvodaya, Madras, 1956

Narmadeshwar Prasad : The Myth of the Caste System, 1957
Nehru Jawaharlal : Before and After Independence (1922-1950), Delhi.
,, ,, : Bunch of Letters, Bombay, 1958
,, ,, : Discovery of India, Calcutta, 1946
,, ,, Nehru's Speeches (1942-43), Delhi, 1954
,, ,, ,, ,, (Vol., 3), Delhi, 1958
,, ,, : Planning & Development Speeches, Delhi, 1956
,, ,, : Youth's Burden, Bombay, 1944
,, ,, : Autobiography
,, ,, : Unity of India
,, ,, : On Co-operation
Nurkse, R. : Problems of Capital Information in Underdeveloped Countries, 1953
Nurullah, Sayeed & Naik, J P. : History of Education in India, 1943
Panandikar, S G. : Eco. Reconstruction in Yugoslavia, 1946
Panikkar, K. M. : Hindu Society at Cross Roads, 1955
,, ,, : Asia & Western Dominance, 1954
Park, L. & Tinkar, I. : Leadership and Political Institution in India, 1959
Patel, Baburao : Burning Words, 1957
Pattabhi Sitarammayya : History of Indian National Congress, Vol. I, 1935 ; Vol. II, 1947
Planning Commission : P.E.O Publications — Evaluation Reports on Working of Community Projects
Publications Division : Facts about India.
Radhakrishnan, S. : Report of the University Education Commission, 1949
Rajendra Prasad : India Divided, 1946
Randive, B. J. : India's Five Year Plan, 1953
Report of the Finance Commission (Final Report), 1945

Research Programme Committee : Planning Commission. Reports on the Research.

Reserve Bank of India : Report on the Survey of India's Foreign Liabilities and Assets

Reserve Bank of India : Land Mortage Banks.

Reserve Bank of India : All India Rural Credit Survey, Vol II, General Report

Reserve Bank of India : Reports on Currency and Finance

Royal Institute of International Affairs : A Food Plan for India

Saxena : Second Five Year Plan, 1957

Sen, Amar : On Monopoly 1957

Shah, C. G : Sampatti Daan and Bhoodan Movement

Shukla, Chandravadan : Socialistic Pattern, 19`5

Sorokin, P. A. : Social Philosophies of an Age of Crisis, 1952

Sovani : Planning of Post War Economic Development in India, 1951

Spate O H. K. : India and Pakistan, 1954

Subba Rao, B. : The Personality of India, 1958

Talbot, Phillips : South Asia in the World To-day, 1950

Taylor, C. : A Critical Analysis of India's Community Development Programme

Tendulkar, D. G. : Mahatma, Vols. 1-8

Thaper, R. : India in Transition, 1956

Thayer, P. W. (Ed.) Nationalism and Progress in Free India, 1956

Thirumalai, S. : Post-war Agricultural Problems and Policies in India, 1954

Thorner, D. : Agrarian Prospects in India, 1956

Transactions of the Third World Congress of Sociology

U.N.O. : Demographic Year Book, 1957

U.N.O. : Eco Applications of Atomic Energy, 1957

U.N.O. : Eco. Developments in Africa, 1957

U.N O. : Eco. Developments in Middle East.

U.N.O. : Eco. Survey of Asia and the Far East Problems and Techniques, 1955 Year Books

U.N.O. : Measures of Economic Development of Undeveloped Countries

U.N.O. : World of Eco. Survey Yearly Reports. Processes and Problems of Industrialization in Underdeveloped Countries, 1955 ·

U.N.O. : Land Reforms Defects in Agrarian Structure

U.N O. : Taxes and Fiscal Policy in Underdeveloped Countries, 1954

U.N O· : Public Finance—Surveys, India (Department of Eco. Affairs), 1951

United States Sub-Committee on Technical Assistance programme : Eco. Development in India and Communist China, 1956 •

Vakil, C. N. : Eco. Consequences of Divided India, 1950.

Vakil, C. N. & Brahmanand, P. R. : Planning for on expanded Economy, 1956

Veblen : The Theory of Leisure Class, 1949

Venkat, Subbiah : Indian Economy Since Independence, 1958

Wadia, P. A. & Marchant, K. T. : Our Economic Problem, 1954

Wadia, P. A. & Merchant, K. T. : Bombay Plan—A criticism.

Wadia, P. A. & Merchant, K. T. : The Five year Plan – A Criticism, 1951

Wootton Barbara : Freedon under Planning, 1945

Zinkin Maurice : Development for Free India, 1956.

Zinkin Maurice : Problems of Eco. Development in India, 1954

Periodicals

A.I.C.C Economic Review

American Journal of Sociology

American Sociological Review
Annals
American Anthropologists
Call
Capital
Commerce
Current Sociology
Eastern Anthropologists
Economic Weekly
Foreign Affairs
Fourth International
Indian Journal of Agricultural Economics
Janata
Kurukshetra
Mankind
Man in India
Modern Review
Monthly Review
New Age
Pacific Affairs
Rural India
Rural Sociology
Sociological Bulletin.

নির্দেশিকা